TEN DAYS THAT DISMEMBERED PAKISTAN

অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দশ দিন

আহমদ সালিম

অনুবাদ : শিকদার এ. কে. শামসুদ্দীন

সম্পাদনা : আবদুল হাই শিকদার

টেন ডেজ দ্যাট ডিস্‌মেমবারড্ পাকিস্তান

Ten days that dismembered Pakistan

অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দশ দিন

১৫ থেকে ২৫ মার্চ, ১৯৭১

ইয়াহিয়া-মুজিব-ভুট্টোর আলোচনার প্রকৃত কাহিনী

মূল : আহমদ সালিম

অনুবাদ : শিকদার এ. কে. শামসুদ্দীন

সম্পাদনা : আবদুল হাই শিকদার

কাকলী প্রকাশনী

প্রকাশক
এ কে নাছির আহমেদ সেলিম
কাকলী প্রকাশনী
৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা ১১০০

দ্বিতীয় মুদ্রণ
কাকলি জানুয়ারি ২০১২
প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৬

প্রচ্ছদ
মশিউর রহমান

অক্ষরবিন্যাস
কাকলী কম্পিউটার ল্যান্ড
৩৩ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০

মুদ্রণ
এঞ্জেল প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স
৫ শ্রীশ দাস লেন ঢাকা-১১০০

দাম ৩০০ টাকা

ISBN 984-70133-0567-7

উৎসর্গ

বাংলাদেশের জনগণকে

অনুবাদকের কথা

'ইতিহাসের নির্মম শিক্ষা হচ্ছে যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করে না।'—এই সাধারণ প্রবাদটি যেন পাকিস্তানের রাজনীতি ও ইতিহাসের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং এটাকে সবাই একবাক্যে স্বীকারও করে। দু-একজন অসৎ ব্যক্তির বাজে সিদ্ধান্তের ফলে একটি দেশ কিভাবে টকুরো টুকরো হয়ে যেতে পারে তার নজির ১৯৭১ সালে অখণ্ড পাকিস্তানের খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনাটি। উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবির মুখে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তান নামক মুসলমান রাষ্ট্রটি পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৭০ সালেই প্রথমবারের মতো সমগ্র পাকিস্তানে জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানভিত্তিক আওয়ামী লীগ এককভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। নিয়ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বকে দেশশাসন করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার কথা থাকলেও তৎকালীন সামরিক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরে তালবাহানা শুরু করে। এতে মদদ জোগায় পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক দল পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টো। ১৯৭১ সালে মার্চে ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া জটিল রূপ ধারণ করে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও তার বিপরীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ব্যাপক আলোচনা চলতে থাকে বস্তুতপক্ষে কোনোরূপ ফলাফল ছাড়াই। অতঃপর মার্চের মাঝামাঝি থেকে সমগ্র দেশে এক শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, যার সমাপ্তি হয় ২৫ মার্চ দিবাগত রাতে সেনা অভিযানের মাধ্যমে।

জনাব আহমদ সালিম তাঁর বইটিতে ১৯৭১ সালের ১৫ থেকে ২৫ মার্চ—এই ১০ দিনে আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দের সাথে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও তাঁর উপদেষ্টাদের ব্যাপক আলোচনা ও মতবিনিময়ের বিষয় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করেছেন। বইটিতে পিপলস পার্টির প্রধান জুলফিকার আলী ভুট্টোর অংশগ্রহণ ও তাঁর মতামত সম্পূর্ণরূপে সন্নিবেশিত হয়েছে। আরও আছে সে সময়কার পাকিস্তানের উভয় অংশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকাগুলির উক্তিসমূহ। এক কথায় এই প্রজন্মের যারা আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনার উৎস খুঁজতে চায় তাদের জন্য বইটি অনেক মূল্যবান তথ্য যোগাবে। নিঃসন্দেহে বইটি ব্যাপকভিত্তিক কোনো ঐতিহাসিক দলিল নয়—তথাপি আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাংলাদেশের ইতিহাসে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর আগের ১০ দিনের ঘটনাপ্রবাহ অতীব গুরুত্ব বহন করে, সে অর্থে বইটি নিঃসন্দেহে মূল্যবান দলিল।

শিকদার এ. কে. শামসুদ্দীন
গ্রীন রোড, ঢাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ 'Operation Search Light' কোড নামে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহ দমনে সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিলে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব ধ্বংসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর এভাবেই অখণ্ড পাকিস্তানের সমাপ্তি এবং পূর্ব অংশে একটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

এই পরিবর্তনের পিছনে আছে ৪টি ঘটনা। ডিসেম্বর ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের ও পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস্ পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ। ইয়াহিয়া খান, শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে রাজনৈতিক দরকষাকষি শুরু হয়। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানের পুরো প্রশাসন শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হতে থাকে। যেখানে কেন্দ্রের কোনো ভূমিকা ছিল না। অবশেষে পূর্ব পাকিস্তানের এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। হাজার হাজার বাঙালির হত্যাযজ্ঞ ঘটে এবং পরিশেষে ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করে। লেখকের দৃষ্টিতে মার্চের সেই চরম উত্তেজনাপূর্ণ শেষ ১০ দিন— যার ফলশ্রুতিতে পাকিস্তানের ভাঙন চূড়ান্ত হয় এবং একটি নতুন রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে।

ইয়াহিয়া-মুজিব সংলাপ শুরু হয় ১৬ মার্চ ১৯৭১। ঐ সংলাপ সম্পর্কে 'Pakistan Observer' এর মন্তব্য ছিল নিম্নরূপ: "জাতি আশা করে, যে-কোনো পরিবর্তন যেন শান্তি-শৃঙ্খলার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। সহিংস ঘটনা সৃষ্টিকারী লোকের কোনো অভাব হয় না। শেখ মুজিব ও তার সহযোগী আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ শান্তি বজায় রাখতে বলেছেন এবং জনগণ সেভাবে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। অহিংস ও শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনে পুরো প্রশাসন শেখ মুজিবের নির্দেশে পরিচালিত হচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের উপর কোনো ব্যবস্থা জোরপূর্বক চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করলে পরিস্থিতি শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে। বর্তমানের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক অবস্থার অবসান না হওয়া পর্যন্ত এখানকার সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।"

অসহযোগ আন্দোলন চলাকালীন মুজিব-ইয়াহিয়া বৈঠক ১৬ থেকে ২২ মার্চ

পর্যন্ত ৬ বার অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ৩টি বৈঠক হয় শুধু মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে। পরবর্তী সময়ে তাদের পরামর্শকদের মধ্যে। একদিকে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমদ, কামরুজ্জামান, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহমদ ও ডক্টর কামাল হোসেন; অন্যদিকে জেনারেল পীরজাদা কর্নেল হাসান ও বিচারপতি এ আর কর্নেলিয়াস। ভুট্টোকে ১৯ মার্চ বৈঠকে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান করা হয়। প্রথমে তিনি প্রত্যাখ্যান করলেও পরে রাজি হন এবং ২১ মার্চ ঢাকায় আসেন। ওয়ালী খান, কাইয়ুম খান প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতা ঢাকায় ২৩ মার্চের মধ্যে উপস্থিত হন। আওয়ামী লীগ ও ইয়াহিয়া খান উভয় পক্ষের পরামর্শদাতারা ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে একটা খসড়া অধ্যাদেশ চূড়ান্ত করেন। এ বিষয়ে ভুট্টোর সম্মতি ছিল না এবং তিনি বিষয়টি জাতীয় পরিষদে আলোচনা অথবা মুজিবের সাথে সরাসরি আলোচনার প্রস্তাব করেন। কোনোরূপ সমঝোতা না হওয়ায় জাতীয় পরিষদের ২৩ মার্চের অধিবেশন আবার স্থগিত করা হয়।

২১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের পক্ষে কর্নেল হাসান রাষ্ট্রপতির একটি অধ্যাদেশের খসড়া আওয়ামী লীগের নিকট প্রদান করেন। উক্ত অধ্যাশেটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক ২২ মার্চ দু পক্ষের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে আওয়ামী লীগকে জানানো হয় যে, ৬ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কিছু কিছু সংশোধনের প্রয়োজন হবে এবং ৬ দফা বাস্তবায়নে কিছু আর্থিক ও অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ও কার্যক্রম উদ্ভব হতে পারে। সে বিষয়ে জনাব এম এম আহমদকে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা করতে বলা হয়। এই প্রস্তাবে আওয়ামী লীগের অসম্মতি ছিল এবং তাদের ধারণা, হয়তো ইয়াহিয়া খানের সামরিক অভিযান শুরুর আগে কালক্ষেপণ একটা প্রয়াস মাত্র। যা হোক, ২৩ মার্চ আলোচনা অনুষ্ঠিত হলো। পরদিন সন্ধ্যার মধ্যে আওয়ামী লীগ খসড়া অধ্যাদেশটির উপর বক্তব্য পেশ করে এবং প্রস্তাব করে তাদের পক্ষ হতে প্রখ্যাত আইনজীবী ডক্টর কামাল হোসেন, অন্য পক্ষ হতে প্রখ্যাত জুরিস্ট বিচারপতি কর্নেলিয়াস খসড়া অধ্যাদেশটি পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সমাধা করবেন। যাতে সেটি শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানের কাছে পরদিন পেশ করা যায়। বিচারপতি কর্নেলিয়াস সম্মত ছিলেন। কিন্তু ইয়াহিয়ার সহযোগী লে. জে. পীরজাদা বাদ সাধলেন এবং নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পরদিন আওয়ামী লীগের সঙ্গে বৈঠকের প্রস্তাব রাখেন। বৈঠকের স্থান এবং সময় টেলিফোনে আওয়ামী লীগকে জানানো হবে তা উল্লেখ করা হয়। সারাদিন অপেক্ষা করা সত্ত্বেও ঐ টেলিফোন কল আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের কাছে আর কখনো আসেনি।

দিনগুলো অনিশ্চয়তার মধ্যে অতিবাহিত হয়। পরিস্থিতি উত্তপ্ত ও সংঘর্ষের রূপ নেয়। আলোচনার পরিবর্তে ২৫ মার্চ রাতে সামরিক অভিযান শুরু করার মাধ্যমে

সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটে। ধারণা করা হয় সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা আগেই নির্ধারিত ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের অনেকেরই ধারণা যে পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে আর্মি অপারেশন ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। বিশ্ব জনমতের অভিমত, ইয়াহিয়া-মুজিব বৈঠক একটা নাটক এবং আসল উদ্দেশ্য ছিল সামরিক বাহিনী দিয়ে আন্দোলন দমন করা।

আগের দিন অর্থাৎ ২৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ নেতা ঢাকা ত্যাগ করেন। সামরিক অভিযান সম্পর্ক ভুট্টোর মন্তব্য নিম্নরূপ :

'ডিনার শেষে রুমে ফিরে যাই এবং সেখানে থেকেই আর্মির অভিযান চোখে পড়ে। প্রায় ৩ ঘণ্টা যাবৎ দেখি। ঢাকায় অনেক স্থানই আগুনে পুড়তে দেখা যায়। চারদিকে গোলাগুলির আওয়াজ। দিগন্তে আগুনের লেলিহান শিখার পটভূমিতে অততি ও ভবিষ্যতের দিকে তাকালাম। নিজের চোখে নিজ জনগণের মৃত্যু ও ধ্বংসলীলা দেখলাম। ব্যাপারটা চিন্তা করা দুরূহ। অনেক চিন্তা ভিড় করছে। আমাদের কি আর কোনো বিকল্প ছিল না? সময়ের স্রোতে পাকিস্তানের এই ক্ষত নিরাময় হওয়ার পর কি কোনো নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে? এর উত্তর কীভাবে দেয়া যায়।'

তার ভাবাবেগে যাই থাক না কেন, ভুট্টোর ধারণা সামরিক অভিযান ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না। ভুট্টোর এমন বিশ্বাস ছিল যে, ২৫ মার্চ আর্মি অপারেশন না হলে আওয়ামী লীগ তার পরদিন ২৬ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের পর স্বাধীনতা ঘোষণা করত।

২৬ মার্চের ঘোষণায় ইয়াহিয়া খান সেনাবাহিনীকে দেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষা ও প্রতিষ্ঠাকল্পে দায়িত্ব প্রদান করেন। এই ইয়াহিয়া খানও ২ বছর পূর্বে দেশে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যই নাকি সামরিক আইন জারি করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে ইয়াহিয়া খানের আদেশ ছিল জেনারেল টিক্কা খানের ওপর খুঁজে বের কর এবং খুঁজে বের করার ব্যাপারটা আর্মির কাছে সম্যকভাবে বোধগম্য ছিল। পাকিস্তান আর্মির বিপর্যয়ের পর জনৈক সাংবাদিকের প্রশ্ন ছিল জেনারেল টিক্কা খানের নিকট- 'ঢাকায় কেন হত্যাযজ্ঞ শুরু করা হয়েছিল।' উত্তরে তিনি বলেন, আর্মিকে আক্রমণ করার জন্য জগন্নাথ হলে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। আমি সেখানে কিছুসংখ্যক আর্মি পাঠাই এবং এটা সত্য যে, সে ঘটনায় কিছুসংখ্যক হিন্দু নিহত হয়। দুই গ্রুপের ভিতর সংঘর্ষকে কখনো হত্যাযজ্ঞ বলে চিহ্নিত করা যায় না। টিক্কা খানের উত্তর।

আহমদ সালিম

প্রথম অধ্যায়

সরকারি ও ব্যক্তিগত বিবরণ

আওয়ামী লীগ

তাজউদ্দীন আহ্‌মদ

জেনারেল ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের ওপর প্রথম আলোচনা মধ্য জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনায় জেনারেল ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের প্রতিশ্রুতির বিষয়ে তাদের কর্মসূচির ব্যাখ্যা প্রদান করেন এবং বলেন যে, তারা এর ফলাফল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। কিন্তু প্রত্যাশার বিপরীতে ইয়াহিয়া সংবিধান সম্বন্ধে তার নিজের ধারণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করেননি। জেনারেল ইয়াহিয়া ছয় দফায় মারাত্মক আপত্তিকর কিছু দেখেননি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের পিপিপি এর সাথে একটা সমঝোতায় আসার জন্য প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

পরবর্তী আলোচনা ঢাকায় ২৭ জানুয়ারি, ১৯৭১ পিপিপি ও আওয়ামী লীগের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময়ে মি. ভুট্টো তার দলবল নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে সংবিধান সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য বেশ কয়েকটি অধিবেশনে বসেন। ইয়াহিয়ার মতো মি. ভুট্টোও সংবিধানের প্রকৃতি সম্বন্ধে তার নিজের স্পষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আসেননি। তিনি ও তার উপদেষ্টাগণ মূলত ছয় দফার ভাবার্থ নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী ছিলেন। তাদের উত্তর ছিল 'না সূচক' এবং তারা তাদের নিজেদের বক্তব্য তৈরি করেন নি। যেহেতু ২টি দলের মধ্যে শূন্যতা পূরণের প্রচেষ্টা চালানো হবে, সেহেতু মারাত্মক দরকষাকষিতে অগ্রসর হওয়ার জন্য আলোচনা সম্ভব ছিল না। এটা স্পষ্ট ছিল যে তখনো মি. ভুট্টোর নিজের স্বাভাবিক অবস্থান ছিল না যেখানে থেকে আলোচনা করতে পারেন।

এটা অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে যে, যখন পিপিপি ঢাকা ত্যাগ করে তখন তাদের পক্ষ থেকে এমন কোনো বক্তব্য ছিল না যাতে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। বরং তারা নিশ্চয়তা দেন যে, সমস্ত

দরজা খোলা রয়েছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে পরবর্তী আলোচনার পর পিপিপি আওয়ামী লীগের সাথে দ্বিতীয় এবং অধিকতর সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনা হতে হবে অথবা জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসবে যার কমিটি সংবিধানের ওপর বিস্তারিত আলোচনার জন্য সুযোগ প্রদান করবে। জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের বাইরে মি. ভুট্টোর ঘোষণা বিস্ময় সৃষ্টি করে। বয়কটের সিদ্ধান্তও বিস্ময়কর ছিল। কেননা ইতিমধ্যে প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর জন্য ব্যবস্থা করছেন যখন তিনি ১৫ ফেব্রুয়ারি পরিষদের আগাম অধিবেশনের জন্য শেখ মুজিবের ওজর প্রত্যাখ্যান করেন এবং ৩ মার্চ মি. ভুট্টোর কথামতো অধিবেশন ধার্য করেন।

এসেম্বলি বয়কটের সিদ্ধান্তের পরে মি. ভুট্টো অধিবেশনে যোগদান থেকে বিরত রাখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানে সব দলের বিরুদ্ধে একটা প্রচারণা চালান। এ কাজে সাক্ষ্য প্রমাণ আছে যে লে. জেনারেল ওমর, ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী মিঃ ভুট্টোর হাতকে শক্তিশালী করার জন্য ব্যক্তিগতভাবে অধিবেশনে যোগ না দেয়ার জন্য পশ্চিম অংশের বিভিন্ন নেতাদের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।

মি. ভুট্টো ও লে. জেনারেল ওমর কর্তৃক চাপের কলাকৌশল প্রদর্শন সত্ত্বেও পিপিপি ও কাইউম মুসলিম লীগসহ ন্যাশনাল এসেম্বলির সমস্ত সব ৩ মার্চের অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানে যাওয়ার জন্য বিমানে তাদের আসন সংরক্ষণ করেন।

মার্চের ৬ তারিখে, তাকে তখনো সংঘর্ষে উস্কানি দেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ দেখাচ্ছিল যখন তিনি আওয়ামী লীগের উপর সংকটের জন্য সম্পূর্ণ দোষ চাপানোর জন্য উত্তেজনাকর বক্তৃতা দেন। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি ৭ মার্চ তারিখে স্বাধীনতার ঘোষণা আশা করেছিলেন। ঢাকায় সেনাবাহিনীকে আন্দোলন বানচাল করার জন্য সতর্ক রাখা হয় এবং লে. জেনারেল টিক্কা খান সেনাদের মধ্যে মনোভাব দৃঢ় করার জন্য লেঃ জেনারেল ইয়াকুবের স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন।

শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার জন্য ব্যাপক জনমত সত্ত্বেও রাজনৈতিক মীমাংসার পথ উদ্ভাবনের জন্য পুনরায় মত পোষণ করেন। ন্যাশনাল এসেম্বলিতে যোগদানের জন্য তার ৪ দফা প্রস্তাব উপস্থাপনে তিনি শুধু জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরেননি বরং তিনি একটি শান্তিপূর্ণ মীমাংসার এই সর্বশেষ সম্ভাবনার লক্ষ্যে ইয়াহিয়ার জন্য একটি খোলা পথ রাখেন। এটা এখন স্পষ্ট যে, ইয়াহিয়া এবং তার জেনারেলদের কখনো শান্তিপূর্ণভাবে

পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট সমাধানের সামান্যতম ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তারা বাংলাদেশে তাদের সামরিক উপকরণের মজুতের জন্য কালক্ষেপণে আগ্রহী ছিলেন।

ঢাকায় ইয়াহিয়ার আগমন গণহত্যার পরিকল্পনা মাত্র। এইরূপ পরিকল্পনার জন্য আকস্মিক সংকট সৃষ্টির পরিকল্পনা বহু আগেই করা হয়েছিল।

১ মার্চের অল্প সময় আগে সীমান্ত পাহারা দেয়ার জন্য রংপুরে প্রেরিত ট্যাঙ্ক ঢাকায় ফেরত নিয়ে আসা হয়। ১ মার্চ সেনাবাহিনীর লোকদের পরিবারদের পশ্চিম পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের সাথে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পশ্চিম পাকিস্তানে প্রেরণ করা হতে থাকে।

১ মার্চের পরে সামরিক বাহিনীকে জোরদার করা হয় এবং ২ মার্চ পর্যন্ত আলোচনা অব্যাহত থাকে। বেসামরিক পোশাক পরিহিত সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ সিলোন (শ্রীলঙ্কা) হয়ে পিআইএর বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ঢাকায় আসতে থাকে। গ্যারিসনের জন্য অস্ত্র ও যুদ্ধের সরঞ্জাম বহনকারী সি-১৩০ ঢাকায় অবতরণ করে। অনুমান করা হয়, সম্পূরক সহায়তাসহ এক ডিভিশন সৈন্য ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চের মধ্যে বাংলাদেশে আসে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিমানবন্দরকে বিমান বাহিনীর কড়া নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় এবং আর্টিলারি ও মেশিনগান দ্বারা কঠোরভাবে পাহারা দেয়া হয়। যাত্রীদের আসা-যাওয়া কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

আত্মঘাতী কার্যকলাপ ও গুপ্তহত্যার সম্ভাব্য কভার অপারেশনের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসএসজি কমান্ডো গ্রুপ বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়োগ করা হয়, স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে সংঘর্ষ বৃদ্ধি করার জন্য ২৫ মার্চের ২ দিন পূর্বে ঢাকা ও সৈয়দপুরে বাঙালিদের উপর আক্রমণের জন্য তারা দায়ী ছিল।

চাতুরিপূর্ণ কৌশলের অংশ হিসাবে ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে তার আলোচনায় বন্ধুত্বপূর্ণ অবস্থান গ্রহণ করেন। ১৬ মার্চ থেকে শুরু হওয়া আলোচনায় ইতিমধ্যে যা ঘটেছে তার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং রাজনৈতিক মীমাংসার আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। শেখ মুজিবের সাথে চূড়ান্ত সভায় তাকে সেনাবাহিনীর অবস্থান ইতিবাচকভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য বলা হয়। তিনি নির্দেশ দেন যে, কোনো মারাত্মক আপত্তি নেই এবং চার দফা নিয়ে নিজ নিজ উপদেষ্টা অন্তর্বর্তীকালীন গঠনতন্ত্রের ওপর কাজ করবে। দুপক্ষের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির প্রধান প্রধান দিকগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. [illegible] দ্বারা একটি বেসামরিক

সরকারের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর।

২. প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

৩. ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন এবং তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন।

৪. সংবিধান চূড়ান্ত করার জন্য সংসদের যৌথ অধিবেশনের প্রস্তুতিমূলক পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান হতে জাতীয় সংসদের সদস্যদের পৃথক অধিবেশন হবে।

মি. ভুট্টোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সংসদের পৃথক অধিবেশনের প্রস্তাব ইয়াহিয়া কর্তৃক উত্থাপন করা হয়। তখন ৬ দফায় বাংলাদেশ ও কেন্দ্রের মধ্যে আবর্তন নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি নীলনকশার সুবিধা তিনি উল্লেখ করেন। এর প্রয়োগে পশ্চিম পাকিস্তানে মারাত্মক বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে। এ কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের এমএনএগণ ৬ দফা ও এক ইউনিট প্রথা বাতিলের ভিত্তিতে সম্পর্কের একটি নতুন ধারা প্রবর্তনের জন্য একত্রে কাজ করার অনুমতি দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন মীমাংসায় কাজ করার জন্য রাষ্ট্রপতির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মি. এম. এম. আহ্মেদ কাজ শুরু করেন। আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের সাথে তাঁর আলোচনায় তিনি স্পষ্ট করে দেন যে, একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসা হয়েছে। এমনকি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ৬ দফার কিছু কিছু ব্যাখ্যার উপর কাজ করার জন্য কোনো অনতিক্রম্য সমস্যা ছিল না।

আওয়ামী লীগের খসড়া তিনটি সংশোধনীর চূড়ান্ত তালিকা যা তিনি প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপন করেন এবং নির্দেশ করে যে সরকার এবং আওয়ামী লীগের অবস্থানের মধ্যে দূরত্ব অন্যতম নীতি ছিল না; কিন্তু প্রস্তাব হিসাবে উপস্থাপিত হয়। ২৪ মার্চের অধিবেশনে আওয়ামী লীগ ভাষার নির্দিষ্ট কিছু পরিবর্তনসহ সংশোধনী মেনে নেয় এবং যখন অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান চূড়ান্ত করা হবে তখন ইয়াহিয়া ও মুজিবের উপদেষ্টাগণের মধ্যে চূড়ান্ত ড্রাফটিং অধিবেশন অনুষ্ঠান থেকে বিরত রাখার কোনো কিছুই ছিল না। এটা অবশ্যই পরিষ্কার করতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই আলোচনা ভঙ্গ হয়নি বা জেনারেল ইয়াহিয়া বা তার দলের নির্দেশ ছিল না যে, তাদের একটি চূড়ান্ত অবস্থান ছিল যা ত্যাগ করা যেত না।

ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বৈধ আবরণের প্রশ্নটি ইয়াহিয়া কর্তৃক গণহত্যা ঢাকা দেয়ার নিছক বানোয়াট কৌশল ছিল। তিনি এবং তার দল সম্মত হন যে, ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭-এর ন্যায় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা ক্ষমতা

হস্তান্তর করা হবে। লক্ষণীয় যে শেখ মুজিব এবং ইয়াহিয়ার মধ্যে কখনোই কোনো আন্তরিকতা ছিল না।

সন্দেহ নেই যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশনের প্রয়োজন ছিল। আওয়ামী লীগ তুচ্ছ কারণে আলোচনা ভাঙত না। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে আওয়ামী লীগের অনুরূপ সভা অনুষ্ঠানে ভীতির কিছুই ছিল না বরং পৃথক অধিবেশনের জন্য মি. ভুট্টোকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে বলা হয়।

প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে নীতিগতভাবে চুক্তিপত্র সম্পাদিত হওয়ার সাক্ষ্য প্রমাণ ২৫ মার্চ মি. ভুট্টোর নিজের সংবাদ সম্মেলনে প্রদান করা হয়। এটা নিশ্চিত নয় জেনারেল ইয়াহিয়া ও মি. ভুট্টোর মধ্যে পৃথক অধিবেশনে কী কী আলোচিত হয়। কিন্তু সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে যে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার গতিপথ সম্বন্ধে পিপিপিকে বোঝানো হয়। পিপিপিকে বলা হয়, শেখ মুজিব শো-ডাউন করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং প্রতিদিনই তার দাবি জোরদার হচ্ছে। বলার প্রয়োজন নেই যে, আওয়ামী লীগ এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের মধ্যকার বৈঠকে এসব বিষয়ের ন্যূনতম ইঙ্গিত উত্থাপন করা হয়নি। যখন মীমাংসার আশা উত্থাপিত হয় সে সময় চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙরকৃত এমভি সোয়াতের সামরিক সরঞ্জাম খালাস করার ত্বরিত সিদ্ধান্তের পক্ষে সৈন্যবাহিনীর ইচ্ছা প্রকাশ পায়। এই সিদ্ধান্তের প্রস্তুতি হিসাবে ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, চট্টগ্রামের গ্যারিসনের বাঙালি অফিসার, বাঙালি কমান্ডিং অফিসারকে তার কমান্ড থেকে হঠাৎ বদলি করা হয় এবং একজন পশ্চিম পাকিস্তানিকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করা হয়। ২৪ মার্চের রাতে তিনি সশস্ত্র অবস্থায় ঢাকা যাত্রা করেন এবং সম্ভবত তাকে হত্যা করা হয়। বন্দর কর্মচারীদের অসহযোগের মুখে ১৭ দিন ধরে জাহাজের গোলাবারুদ খালাসে সৈন্যবাহিনী বিরত থাকা সত্ত্বেও নতুন কমান্ডের অধীনে জাহাজ খালাস করার সিদ্ধান্তের নোটিশ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়। খালাস করার সিদ্ধান্তটি ছিল পরিকল্পিত প্ররোচনা যা তাৎক্ষণিকভাবে ১ লাখ লোককে চট্টগ্রামের রাস্তায় নামতে বাধ্য করে এবং তাদের আন্দোলন বানচাল করার জন্য সৈন্যবাহিনী গুলিবর্ষণ করে। এই ইস্যুটি জেনারেল পীরজাদাসহ আওয়ামী লীগ গ্রহণ করে যখন আলোচনা চলছিল। তিনি কোনো উত্তর দিতে পারেননি।

২৪ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ও আওয়ামী লীগের উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠকের পরে চূড়ান্ত অধিবেশনের জন্য জেনারেল পীরজাদার কাছে থেকে একটা আহ্বানের অপেক্ষা ছিল। ঐ বৈঠকে খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। অনুরূপ

কোনো আহ্বান বাস্তবায়িত হয়নি। তার পরিবর্তে শোনা যায় যে মি. এম. এম. আহ্মেদ, যিনি নেগোসিয়েশনের জন্য কেন্দ্রে অবস্থান করছিলেন তিনি আওয়ামী লীগকে কোনো ইঙ্গিত না দিয়েই ২৫ মার্চ সকালে করাচির উদ্দেশে হঠাৎ করে যাত্রা করেন।

২৫ মার্চের সকাল ১১.০০টার আগে সব প্রস্তুতি ঠিকঠাক এবং শহরে সৈন্যবাহিনী তাদের অবস্থান গ্রহণ করতে শুরু করে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের জঘন্যতম পরিকল্পিত গণহত্যা ২৫ মার্চের মধ্যরাতে ঢাকার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের ওপর পরিচালিত হয়।

(মুজিবনগর থেকে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ প্রকাশিত 'People of the World' এর প্রেস স্টেটমেন্ট থেকে সংগৃহীত।)

ড. কামাল হোসেন

১৯৬৫ সালের যুদ্ধে জানমাল ও ভূখণ্ডের ক্ষতির কারণে পাঞ্জাবি সৈন্যদের মাঝে প্রেসিডেন্ট আইউবের জনপ্রিয়তা কমে যায়। কারণ, হারানো ও ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ সবই ছিল পাঞ্জাবিদের। তাসখন্দ ঘোষণা, যে ঘোষণার মাধ্যমে আইয়ুব নিজের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের পরিবর্তে পূর্বাবস্থা ও ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা চালান—এতে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। কারণ, পাঞ্জাবিদের কাছে তাসখন্দ ঘোষণা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপে ভারতের কাছে বশ্যতা স্বীকার করা। মি. ভুট্টোই অনাকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধে আইয়ুবকে ঠেলে দেয়ার জন্য দায়ী ছিলেন। তিনি শুধু এ রকম অবস্থার জন্য জনসাধারণের তিরস্কার থেকে মুক্তি পাওয়ার ব্যবস্থাই করেননি। তিনি তাসখন্দবিরোধী জনমত গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন এবং এ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

পূর্ব অংশে বাঙালিরা সম্পূর্ণভাবে যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া দেখান। তাদের সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অভিজ্ঞতা ছিল এবং তারা বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত। এটা ছিল ভুট্টোর সামান্যতম সান্ত্বনা যে, পূর্ব অংশের নিরাপত্তার দায়িত্ব বন্ধু চীনের ওপর দেয়া হয়। অতএব, তাসখন্দ ঘোষণাকে পূর্ব পাকিস্তানের সকল স্তরের জনসাধারণ ব্যাপকভাবে স্বাগত জানাল।

পাঞ্জাবি রাজনীতিবিদগণ রাজনৈতিক ছাড়ের দাবিতে বিরোধী শক্তির আন্দোলন ও জাতীয় সরকার গঠনের ডাক দিয়ে ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে বেশ তৎপর হন। তারা বুঝতে পারেন যে, আইয়ুবের ওপর চাপ খুবই কার্যকর হবে যদি বাঙালিদের এই দাবি থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়। শেখ মুজিবকে জড়ানোতে তাদের আগ্রহ বহুল প্রচারিত বাংলায় প্রকাশিত 'দৈনিক ইত্তেফাকে'র প্রভাবশালী সম্পাদক মানিক মিয়া (তফাজ্জল হোসেন) কর্তৃক পুনর্বিবেচনা করা হয়। তিনি ১৯৬৬ সালের প্রথম দিকে লাহোরে পাঞ্জাবিবিরোধী নেতাদের একটি সভায় উপস্থিত হন। সমবেত পাঞ্জাবি নেতাগণ আইয়ুবের বিরুদ্ধে সবার গ্রহণযোগ্য একটি বিরোধী ফ্রন্ট তৈরির দাবি জানান এবং নিশ্চয়তা দেন যে, তাদের বিশ্বাস সৈন্যবাহিনী তাদের সাথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। তারা এই ফ্রন্টে যোগাযোগ

করার জন্য শেখ মুজিবকে রাজি করাতে মানিক মিয়াকে অনুরোধ করেন। কিন্তু মানিক মিয়া জানতেন, যে প্রশ্নটি ঢাকায় তার কাছে উত্থাপন করা হবে সেটি ছিল আইয়ুব থেকে পাঞ্জাবি নেতাদের অন্য একটি গ্রুপ নিয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবর্তন বাঙালিদের দুঃখদুর্দশার লাঘব করবে না। তিনি উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ রাজধানী স্থানান্তরের প্রস্তাব বা পূর্ব বাংলায় যেকোনো একটি সার্ভিস হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরের প্রস্তাব বা জনসংখ্যার ভিত্তিতে পার্টিতে প্রতিনিধিত্ব পরিবর্তনের প্রস্তাবে সম্মত হবেন না। এই প্রশ্নের উত্তর ছিল, 'আইয়ুবের কাছে থেকে ক্ষমতা পেতে দিন এবং তারপর কীভাবে অগ্রসর হব আমরা তা দেখবো।'

বাঙালিরা ভোলেনি যে এসব রাজনীতিবিদ তাদের সময় পাকিস্তানের স্বাধীনতার প্রথম দশকে পরিকল্পিতভাবে বাঙালিদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে। One Unit Ges Parity ছিল তাদের মস্তিষ্ক প্রসূত পরিকল্পনা। প্রস্তাবিত ধরনের গ্রহণযোগ্য ফ্রন্ট গঠনে পূর্ব বাংলার সুবিধা সম্পর্কে কিছুটা সন্দিগ্ধচিত্ততা ছিল। প্রদেশ কেন্দ্র সম্পর্কের প্রশ্নে বা অন্য কথায় বাঙালিদের দাবি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে যদি কিছু নির্দিষ্ট অগ্রিম প্রতিশ্রুতি বাঙালিদের কাছে দেয়া হতো, তবে বাঙালিদের কাছে এই ফ্রন্টের কিছুটা আবেদন থাকত।

মানিক মিয়া ফিরে আসার কিছু সময় পরেই আইয়ুব জানুয়ারির শেষে ঢাকায় আসেন। তিনি বাঙালিবিরোধী নেতাদের তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আহ্বান করেন। তৎকালীন আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ছাড়াও আমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে 'বৃদ্ধ প্রহরী' নেতা নূরুল আমিন, ইউসুফ আলী চৌধুরী, হামিদুল হক চৌধুরী ও অন্যান্য নেতা ছিলেন। আইয়ুবের সাথে সাক্ষাতের আগে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় শেখ মুজিব আইয়ুবের কাছে পেশ করার জন্য একটি একক দাবিনামায় সম্মত হওয়ার জন্য অন্য বাঙালি নেতাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আরো চাপ দেন যে, এই অধ্যায়ে স্বায়ত্তশাসনের পরিধির সংজ্ঞা প্রদান করে নির্দিষ্টসংখ্যক দফা অন্তর্ভুক্ত করা হবে, যা বাঙালিরা তাদের স্বার্থ অর্জনে প্রয়োজনীয়তা বিবেচনা করবে। তাজউদ্দীন আহমদ, যিনি দলের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক ছিলেন, কাগজে দফা লিখে নেন। শেখ মুজিব, নূরুল আমিন সেই দফাগুলোর প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। নূরুল আমিন এবং অন্যান্য বয়োবৃদ্ধ নেতা অগ্রসর হওয়া থেকে বিরত থাকেন। তারা স্বায়ত্তশাসনকে বিরাট দাবি হিসাবে উল্লেখ করেন, যা আইয়ুবের 'লাল জীর্ণ বস্ত্র' মনে হবে। তাদের মতে এটা সার্বজনীন বয়স্ক প্রতিনিধির ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন, সংসদীয় গণতন্ত্র এবং একটি জাতীয় সরকারে বিরোধী দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর মডারেট দাবি স্বীকারে

আইয়ুবের সম্ভাবনাকে হ্রাস করবে। শেখ মুজিব অবিচল ছিলেন এবং উল্লেখ করেন যে, তারা যদি ৬ দফার আগের দাবিগুলো বাস্তবায়নে না যান, তবে তিনি নিজেই এগুলো পেশ করবেন। আইয়ুবের সাথে সভা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যেহেতু হামিদুল হক চৌধুরী, যিনি বাঙালি নেতার পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে পরিচালনা করার দাবি জানান, খুব দ্রুত শেখ মুজিব কর্তৃক অপসারিত হন। আইয়ুব কোনো জরুরি আলোচনা ছাড়াই সভা ত্যাগ করেন।

পাঞ্জাবিবিরোধী নেতৃবৃন্দ ৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের জাতীয় সম্মেলন আহ্বান করেন। বাঙালি নেতাদের মধ্যে শেখ মুজিব ছিলেন, যাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মানিক মিয়া যোগদানের জন্য শেখ মুজিবকে চাপ দেন। কারণ, এটা বোঝা গিয়েছিল যে, তার অনুপস্থিতির অর্থ পূর্ব পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা কার্যকর বিরোধী শক্তির সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব না থাকা। মানিক মিয়অ সংযম প্রদর্শনের আবেদন জানান এবং স্বায়ত্তশাসনের ওপর নির্দিষ্ট দফার ওপর প্রচারণা না করার জন্য শেখ মুজিবকে রাজি করানোর প্রচেষ্টা চালান। যা হোক, শেখ মুজিব এসব দফায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ রয়ে গেলেন।

লাহোর সম্মেলনে যখন শেখ মুজিব তার ছয় দফা কর্মসূচি উপস্থাপনের প্রচেষ্টা চালান, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, যিনি সম্মেলনে সভাপতি ছিলেন, এটাকে বাতিল করে দেন। এমনকি তিনি এটা আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির অনুমতিও দিলেন না। জোরেশোরেই কানাঘুষা চলে যে, ছয় দফা কর্মসূচিতে এমন কিছু ছিল যা বিরোধী নেতৃবৃন্দকে ভাগ করার এবং বিরোধী ঐক্যকে প্রতিহত করার সরকারের উৎসাহ- উদ্দীপনার সাথে ব্যাস্তবায়িত হচ্ছে। শেখ মুজিব সম্মেলনে তার প্রস্তাব উপস্থাপনের সুযোগদানে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সম্মেলন থেকে বেরিয়ে যান এবং প্রেসের কাছে তার স্টেটমেন্ট প্রদান করেন। সমবেত বিরোধী নেতৃবৃন্দ ক্রুদ্ধ ছিলেন কিন্তু উপলব্ধি করেন যে, শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাঙালিরা স্বায়ত্তশাসনের পরিধির ওপর পূর্ব প্রতিশ্রুতি ছাড়া তাদের সাথে যাবে না। পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রতিনিধিত্বকারী শেখ মুজিবের মধ্যে একটা বিভক্তিতে লাহোর সভা ভেঙে যায়।

সরকার দ্রুত পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন। সরকার তুলে ধরেন যে, শেখ মুজিব কর্তৃক পরিচালিত জঙ্গি জাতীয়তাবাদী ধারা এবং তার ছয় দফা বাঙালিদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। শেখ মুজিবের সহযোগিতায় পাঞ্জাবি স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য একটি সংঘবদ্ধ পূর্ব-পশ্চিম বিরোধী ফ্রন্ট ভেঙে দিতে তাদের ব্যর্থতার জন্য পাঞ্জাবিবিরোধী নেতৃবৃন্দকে সরকার অবিশ্বাস করেন। এভাবে সরাসরি পুনরায় পশ্চিম পাকিস্তানি (পাঞ্জাব) শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে একতা স্থাপন করতে সচেষ্ট হন,

যা বিভক্ত হয়ে যায় এবং যার একটা অংশ একটা বিরোধী ভূমিকার মাধ্যমে তাদের স্বার্থ অর্জন করতে চাচ্ছিল।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে, সরকার তার সুবিধা অনুযায়ী এই অবস্থার মোকাবিলা করেন এবং ভুট্টো ও এস. এম. জাফর আইয়ুবের আইনমন্ত্রী কর্তৃক আনতি অভিযোগের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন যেন শেখ মুজিবকে এই কর্মসূচি পেশ করতে সরকার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গকে প্রভাবিত করেন। যাতে বিরোধী একতাকে বিনাশ করা যায়। এই অভিযোগ স্পষ্টত মিথ্যা। কেননা ছয় দফা আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব সরকার কর্তৃক নিষ্ঠুর অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ পরিচালিত হয়।

ছয় দফা ফর্মুলা লিখিত বিবৃতি আকারে প্রকাশ করা হয়, যা লাহোর সম্মেলনে পেশ করা হয়। ১৯৬৬ সালের ২৩ মার্চ এই স্টেটমেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের দ্বারা 'ছয় দফা ফর্মুলা, আমার বাঁচার অধিকার' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এটা দেশের পুরো অংশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার উপযুক্ত সমাধানের মৌলিক নীতি স্টেটমেন্ট হিসাবে পেশ করা হয়। গুরুত্ব দেয়া হয় যে, এই দাবিগুলো নতুন করে প্রণীত দফা ছিল না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের দীর্ঘদিনের দাবি এবং কয়েক দশক ধরে তাদের নেতৃবৃন্দের প্রতিশ্রুতি বা ওয়াদা।

প্রণীত ছয় দফা নিম্নরূপ ছিল :

দফা ১ : ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন রূপে গড়ে তুলতে হবে। তাতে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার থাকবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকবে।

দফা ২ : ফেডারেল সরকারের ওপর কেবল ২টি বিষয় যেমন—প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র ন্যস্ত থাকবে এবং অন্য সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের উপর থাকবে।

দফা ৩ : পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে দু'টি পৃথক মুদ্রা চালু থাকবে :

ক) দুটি অংশের দুটি পৃথক কিন্তু সহজেই বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে।

খ) সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রা চালু থাকবে। এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন প্রেরণ বন্ধ করতে কার্যকর আইনের বিধান প্রণয়ন করবে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। দুই অংশে দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে।

দফা ৪ : করারোপ ক্ষমতা ও রাজস্ব সংগ্রহ প্রাদেশিক সরকারের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং ফেডারেল সরকারের কোনো ক্ষমতা থাকবে না। প্রয়োজনীয় ব্যয়

মিটানোর জন্য প্রাদেশিক সরকারের করে ফেডারেল সরকারের অংশ থাকবে। ফেডারেল তহবিল প্রাদেশিক সরকারের করের একটি নির্দিষ্ট লেভির হার থেকে আসবে।

দফা ৫ : (ক) দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের ২টি পৃথক হিসাব থাকবে।

খ) পূর্ব পাকিস্তানের আয় পূর্ব পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

গ) ফেডারেল সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমানভাবে বা একটা নির্দিষ্ট অনুপাতে ২টি অংশ কর্তৃক মেটানো হবে।

ঘ) স্বদেশী পণ্য ২টি অংশের মধ্যে ডিউটি ছাড়াই চলাচল করতে পারবে।

ঙ) বিদেশে বাণিজ্য মিশন স্থাপনের জন্য বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার এবং চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার জন্য প্রাদেশিক সরকারকে সংবিধানে ক্ষমতা প্রদান করা হবে।

দফা ৬ : পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিশিয়া ফোর্স গড়ে তোলা হবে।

দফা-১ তে সংসদীয় সরকার পদ্ধতির জন্য মৌলিক দাবির ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, যার প্রতি প্রায় সবাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। বাস্তবতার আলোকে এটা বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে যে, ১৯৬৬ সালে আইয়ুব একটি সংবিধান অনুসারে পরিচালিত হচ্ছিলেন যে সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার পদ্ধতিতে সর্বময় ক্ষমতা প্রদান করা হয়। লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে ফেডারেশনের দাবিতে গুরুত্বপূর্ণ দফা প্রকাশ করা হয়, যে প্রস্তাবে উল্লেখ থাকে যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ সার্বভৌম স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ হিসাবে গঠিত হবে। এসব প্রস্তাবে শান্ত পরিবেশের ক্ষেত্র তৈরি করে যে উক্ত প্রস্তাব অনুসারে গৃহীত পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় ইউনিট সার্বভৌম হবে। এ থেকে এটা স্পষ্ট যে তাদের মধ্যকার যে-কোনো সংঘ কেবলমাত্র অবাধে ও স্বেচ্ছায় আবদ্ধ চুক্তির ভিত্তিতে হবে। যে-কোনো ফেডারেশন, যা তাঁরা গঠন করার জন্য সম্মত হন, অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের হবে, যেভাবে তাঁরা এটাকে দিতে সম্মত হন। কোনো পূর্ব কল্পিত মডেল থাকবে না, যা তাদের প্রতি প্রচণ্ড ধাক্কা হিসাবে বিবেচিত হবে। যে-কোনো ফেডারেল সরকারের অনুরূপ ক্ষমতা থাকবে যা সার্বভৌম constituent ইউনিট দ্বারা তাদের ওপর প্রদান করা হয়। সার্বভৌম ইউনিটগুলো উন্মুক্ত থাকবে। একটি ফেডারেশন গঠনে এই অবস্থা প্রয়োজনীয় ইউনিটগুলোর অঙ্গের ওপর নির্দিষ্ট শক্তির

পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা ফেডারেল সরকারে পরিণত হওয়া একক প্রক্রিয়া হবে না, যেভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অনুসারে সম্পন্ন হয়েছিল।

অবস্থা সম্ভবত ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ২৪ বছরে সুপরিকল্পিতভাবে অস্পষ্ট ছিল যখন তাঁরা, যারা পাকিস্তানের সংবিধান আরোপ করার জন্য এটাকে তাদের নিজের উপর নিয়েছিল, প্রদেশের ক্ষমতার অনুদানের আকারে ভেবে তাদের মাথার ওপর খাড়া করেছিল। সন্দেহ নেই শাসক সংখ্যাগরিষ্ঠ গোষ্ঠী যারা যেভাবে ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুমোদন করা হয় সেইভাবে যারা প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণের কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নিয়ন্ত্রণ অর্জন করেছিল। তারা এই অবস্থা রক্ষার জন্য নিজের স্বার্থে এটা দেখতে পান। প্রকৃতপক্ষে তাদের সঙ্গতিপূর্ণ প্রচেষ্টা ছিল জাতীয় সংহতির নামে কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থান শক্তিশালী করা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় স্বাধীনতা আইনে উল্লেখ রয়েছে যে, সংসদ কর্তৃক পাকিস্তানের (ভারতসহ) সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত ভারত শাসন আইন মোতাবেক অন্তর্বর্তী সংবিধান কার্যকর করা হবে এবং প্রদেশ ও কেন্দ্রের সম্পর্কের জন্য একটা কাঠামো তৈরি করা হবে।

২ নং দফায় দুটি বিষয় কেন্দ্র বা যদি মুদ্রা অন্তর্ভুক্ত করা হয়, তবে তিন বিষয় কেন্দ্রের উল্লেখ করা হয়েছে। ১৯৪৬ সালের ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় এই দাবিগুলো বর্ণিত হয়, যাতে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ নিয়ে তিন বিষয় কেন্দ্রের প্রস্তাব করা হয়। The Grand National Assembly of Democratic Forces. সরকার বিরোধী রাজনৈতিক দলের সম্মেলন, সরকার বিরোধী, যা ১৯৫০ সালের দিকে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় United States of Paksitan নামে ফেডারেশনের প্রস্তাব দেয়, তাতে কেবল প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ইউনাইটেড ফ্রন্টের, যা ১৯৫৪ সালে পূর্ব বাংলায় প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বিরোধী দল কর্তৃক গঠিত হয়, ২১ দফা ইশতেহারের অন্যতম একটা দফা সে সংবিধানে ফেডারেশনের কথা উল্লেখ থাকবে, যাতে কেন্দ্রের কাছে শুধু তিনটি বিষয় থাকবে; যথা প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা। এভাবে ৬ দফা ফর্মুলায় দ্বিতীয় দফাটি ছিল একটা দফার পুনরাবৃত্তি, সংবিধান যথা ফেডারেল সংবিধানের অধীনে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার ভাগাভাগি এর বিষয়ে মৌলিক দফা হিসাবে গৃহীত হয়।

৩, ৪ ও ৫ নং দফায় বাঙালিদের নিজের সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত। ধারণা ছিল যে, পূর্ব বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও উপযুক্ত আচরণ পাচ্ছে না। প্রাথমিকভাবে ফেডারেল তহবিলের বরাদ্দে, বৈদেশিক মুদ্রা ও কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরকারি কমিশনে নিয়োগের

বিষয়টির বিরুদ্ধে একটি বিরূপ ধারণা ছিল। দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে পূর্ব বাংলা তার যথাযোগ্য মর্যাদা পাচ্ছে না। পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ষাট দশক পর্যন্ত বাঙালি অর্থনীতিবিদদের লেখায় অর্থনৈতিক বৈষম্যের পরিসংখ্যানগত চিত্র এই ধারণা থেকেই সৃষ্টি হয়। এসব লেখায় বৈষম্যমূলক নীতি পরিলক্ষিত হয়, যা পাকিস্তানের ২টা অংশে অর্থনৈতিক উন্নয়নে বৈষম্য দৃষ্টিগোচরীভূত হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের অনুকূলে একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণটাকে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে মনে করা হয় যার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচার করা হয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাকে আঞ্চলিকীকরণ করাই ছিল ৬ দফা কর্মসূচির প্রধান ভরসা।

৬ দফা প্রস্তাব প্রসঙ্গে ঢাকায় প্রকাশিত 'Challange of Disparity' শিরোনামে এক প্রচারপত্র ১৯৬২ সালের প্রথম দিকে তুলে ধরা হয়। জোর করে বলা হয় যে, বৈষম্য কমানোর জন্য একমাত্র বাস্তবভিত্তিক ব্যবস্থা হবে কিছু নির্দিষ্ট মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তন, যা এভাবে বর্ণিত হয়, কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কমিশন ভেঙে এটাকে দুটি শক্তিশালী আঞ্চলিক পরিকল্পনা সংস্থায় রূপান্তর এবং অর্থ ও অর্থ বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে বিভক্তিকরণ। এটাও পরামর্শ দেয়া হয় যে অঞ্চল ভিত্তিতে পৃথকভাবে অনুদানের প্রয়োজনীয়তা নিরূপণ করা হবে এবং আঞ্চলিক সংস্থাগুলো বৈদেশিক অনুদান নীতি প্রণয়নে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা অঞ্চলিকীকরণের ধারণার বীজ অর্থাৎ কর আরোপ করার ক্ষমতা অঞ্চলের কাছে হস্তান্তর করা, রাজস্ব ও মুদ্রানীতি তৈরির ক্ষমতা, সম্পদ পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশী অর্থনৈতিক সম্পর্ক অঞ্চলকে হস্তান্তর।

অর্থনীতিবিদদের বিশ্লেষণে দেখানো হয় যে, প্রধান হাতিয়ার, যার মাধ্যমে পূর্ব অংশ থেকে পশ্চিম অংশে সম্পদ পাচার করা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্য, বৈদেশিক মুদ্রা এবং বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ। পূর্ব পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট ও পাটজাত দ্রব্য থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা মূলত পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক উন্নয়নের (শিল্পায়নসহ) জন্য বরাদ্দ দেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে বাস্তবায়িত প্রকল্পের মতো পূর্ব পাকিতানের প্রকল্পগুলো দাতা সংস্থা কর্তৃক দ্রুত সম্পন্ন হতো না। পশ্চিম পাকিস্তানের সেচ, কৃষি ও শিল্পে প্রচুর বিনিয়োগ ২টা অংশের মধ্যে বৈষম্যকে আরো বৃদ্ধি করেছে।

যখন চূড়ান্তভাবে ৬ দফা ফর্মুলার প্রস্তাব করা হয়, বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য সংশ্লিষ্ট দফায় জোর বিরোধিতা আসে। পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী এই

হাতিয়ার, যার মাধ্যমে তারা অর্থনীতির ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম, বাদ দিতে প্রস্তুত ছিল না।

৬ দফা কর্মসূচিতে আইয়ুবের প্রতিক্রিয়া ছিল জোরপূর্বক এটাকে দমন করা। তিনি ৬ দফা কর্মসূচিকে বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসাবে দেখেন এবং ঘোষণা দেন যে, 'অস্ত্রের ভাষায়' এর জবাব দেয়া হবে।

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ বাঙালিদের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। তিনি ৬ দফা কর্মসূচিকে জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবেন এবং এর সমর্থনে গণআন্দোলন চলতে থাকবে। ১৮ এপ্রিল শেখ মুজিব গ্রেফতার হলেন এবং ৯ মে পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনের অধীনে তাকে ডিটেনশনে নেয়া হয়। ৭ জুন, ১৯৬৬ ৬ দফা আন্দোলনের সমর্থনে বিশেষ প্রতিবাদ দিবস পালিত হয়। আইয়ুব সরকার বল প্রয়োগে এটা দমন করার চেষ্টা চালায়। কিছু সংখ্যক লোককে হতাহত করে প্রতিবাদ মিছিলের ওপর গুলিবর্ষণ করা হয়। বহুসংখ্যক লোককে গ্রেফতার করা হয় এবং খবরের কাগজ, যা ছিল জনসাধারণের প্রধান মুখপত্র, ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়া হয়; এর সম্পাদককে গ্রেফতার করা হয় এবং এর প্রেস বাজেয়াপ্ত করা হয়।

এরূপ অত্যাচারের মুখে আন্দোলন কিছুটা পিছিয়ে পড়ে। প্রথমে সাড়া ছিল হাইকোর্টে রিট পিটিশনের মাধ্যমে কোর্টে বিষয়গুলো উত্থাপন করা।

১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে পরিস্থিতি হঠাৎ করে উত্তেজনাকর হয়ে ওঠে এবং সর্বত্রই গুজব ছড়িয়ে পড়ে। আইয়ুব খান তখন পূর্ব পাকিস্তান ভ্রমণ করছিলেন। পার্বত্য চট্টগ্রামে চন্দ্রঘোনায় অবস্থিত দাউদ কমপ্লেক্সে তার যাওয়ার কথা, হঠাৎ করে সফর বাতিল করে দেন। সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে যে, গণহত্যার কারণেই তার সফর বাতিল করা হয়। এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট যে, চট্টগ্রাম ও চন্দ্রঘোনায় রাস্তায় প্রেসিডেন্টের মোটর শোভাযাত্রা থাকবে কিন্তু সেই পথে কোনো শোভাযাত্রা দেখা যায় নি।

ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহের কোনো এক সময়ে আমার ব্যারিস্টার সহকর্মী আমিরুল ইসলাম আমাকে জানালেন যে, তিনি জেলখানায় একজন মক্কেলের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন এবং তার ওপর অত্যাচারের চিহ্ন পাওয়া গেছে। তিনি বলেন, অত্যাচার চালানোর সময় 'ষড়যন্ত্র মামলায়' জড়ানোর জন্য তার উপর চাপ দেয়া হয়। আমিরুল ইসলাম খুবই বিমর্ষ ছিলেন এবং তিনি কি করবেন সে ব্যাপারে পরামর্শ চান। তাকে বলা হয় যে, এটাকে হাইকোর্টের গোচরীভূত করার জন্য, অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং উক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর জন্য চাপ দেয়া হবে। ঐদিন সন্ধ্যায়

অত্যাচারের অভিযোগ করে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য মেডিক্যাল বোর্ড বসানোর দাবি করে একটা পিটিশন আদালতে পেশ করা হয়। উক্ত ব্যক্তিটি ছিলেন কামাল উদ্দিন আহমেদ, যিনি পরবর্তী সময়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ১ নং রাজসাক্ষী হন।

কিছুদিন পরে ঢালাওভাবে গ্রেফতার শুরু হয়। আহমেদ ফজলুর রহমান, রুহুল কুদ্দুস, শামসুর রহমান, পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের সব ঊর্ধ্বতন বাঙালি সদস্য এবং সশস্ত্র বাহিনীর কিছু বাঙালি অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়। আহমেদ ফজলুর রহমান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত প্রথম ব্যক্তি যিনি একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে চান এবং তার আইনজীবী হিসাবে আমার নাম বলেন। ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে অথবা ১৯৬৮ সালের জানুয়ারির প্রথম দিকে আমি তার সাথে দেখা করি।

তিনি জানালেন, গ্রেফতারের পরপরই ঢাকায় বনানীর নতুন আবাসিক এলাকায় নিয়ে গিয়ে কয়েক দিন ধরে অব্যাহতভাবে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। প্রশ্নকর্তাগণ ষড়যন্ত্র মামলায় কিছু ব্যক্তিকে জড়ানোর জন্য তাকে বলেন। তখন গ্রেফতার চলতেই থাকে, পরিস্থিতি আরো উত্তেজনাকর হতে থাকে। এমনকি গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের পক্ষের আইনজীবীগণ অসহায়বোধ করেন। আহমেদ ফজলুর রহমানকে অবৈধভাবে আটক রাখার আদেশ চ্যালেঞ্জ করে একটি আবেদন দায়ের করা হয়। একই দিনে ব্যারিস্টার কে. জেড. আলম লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেমের পক্ষে কোর্টে আরজি দায়ের করার জন্য আমাকে বললেন। তাকে পরামর্শ দেয়া হয় যে, এসব ব্যক্তির মধ্যে ধারণা দেয়ার জন্য একটা গ্রহণযোগ্য লিগ্যাল ফ্রন্ট হিসাবে গ্রেফতারকৃত প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ভিন্ন ভিন্ন আইনজীবী কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। যাতে ইশতিয়াক আহমেদ লেফটেন্যান্ট কমান্ডার মোয়াজ্জেমের মামলা গ্রহণ করেন। কামাল উদ্দিন, রুহুল কুদ্দুসের ভগ্নিপতি; রুহুল কুদ্দুসের আবেদন গ্রহণ করেন। হাইকোর্টে আরজি পেশ করা হলে সরকারি আইনজীবীগণ মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বলেন যে, সব ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। জানুয়ারির প্রথম দিকে ইস্যুকৃত সরকারি প্রথম প্রেস রিপোর্টে অভিযুক্ত হিসাবে শেখ মুজিবের নাম ছিল না। এটা ছিল জানুয়ারির ২০ তারিখে সরকারি প্রেস রিলিজ যাতে প্রথমবারের মতো প্রধান আসামি হিসাবে শেখ মুজিবের নাম উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তী ৫ মাস ধরে পুরো মামলাটি গোপনীয়তার কম্বলে আবৃত ছিল। অভিযুক্তদের অবস্থানের ব্যাপারে কোনো তথ্যই দেয়া হয়নি, যাদেরকে ইতিমধ্যে জেলখানা থেকে [illegible] হয়েছে এবং [illegible]

বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোর্টে বিচারকার্য সম্পাদন করার জন্য একটা অধ্যাদেশ জারি করা হয়। এস. এ. রহমান, সুপ্রিমকোর্টের জজ এবং ২ জন বাঙালি, হাইকোর্টের জজ, এস. আর. খান ও মাকসুমুল হাকিমকে নিয়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত হয়। প্রথম থেকে অনুমান করা হয়, ট্রাইব্যুনালটি রাজনৈতিক। Town Williams, QC, এমপি, একজন ব্রিটিশ ব্যারিস্টারকে নিয়োগ করা হয়। ডিফেন্স কাউন্সিলের দলে যোগ দিতে ঢাকায় আসেন। কেননা সালাম খানের নেতৃত্বে ইতিমধ্যে একটা বিচারের জন্য আইনজীবীর একটা পূর্ণ দল গঠিত হয়। ব্যবস্থা করা হয় যে Town Williams, এক বা দুইদিন ধরে জেরা করবেন এবং তারপর তিনি একটা রিট পিটিশন হাইকোর্টে পেশ করবেন। রিট পিটিশন প্রস্তুতিতে Williams-এর সাথে আমাকেও সংশ্লিষ্ট করা হয় এবং পিটিশনের খসড়া তৈরি করি। Williams পিটিশনটি উত্থাপন করেন এবং হাইকোর্ট রুল জারি করে। তবে হাইকোর্ট অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ জারি করতে অস্বীকৃতি জানান। ইতিমধ্যেই Williams আইয়ুবের পুলিশ বাহিনী ও গোয়েন্দা বাহিনী দ্বারা অব্যাহতভাবে নিগৃহীত হওয়ার অভিযোগ করেন। তার গাড়ি অনুসরণ করা হয় এবং যখন তার ঘর ভেঙে ফেলা হয় এবং মালপত্র ও ডকুমেন্টস তছনছ করে দেয়া হয় তখন আরো বিপর্যয় ঘটে। তাকে আয়কর প্রদানের নোটিশ দেয়া হয়। এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয় এবং অনেক হয়রানির পর ঠিক হয় যে Town Williams ইংল্যান্ড ফিরে যাবেন। তার সফর এবং মামলায় তার অংশগ্রহণ মামলার আন্তর্জাতিক দৃষ্টি আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য সফল হয়। Peter Hazelhurst, Time (লন্ডন) এর নতুন সংবাদদাতা এই মামলায় রিপোর্ট প্রদান করেন এবং বিশেষ করে Town Williams কে হয়রানিতে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

মামলার অগ্রবর্তী এবং বিচারের আক্ষরিক কার্যপ্রণালীর দৈনন্দিন প্রকাশনাতে মামলাটি জনগণের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। যদিও আইয়ুব সরকার মনে করে যে, এই মামলা শেখ মুজিবের ভাবমূর্তিকে ক্ষুণ্ন করবে, কিন্তু এর ফলে উল্লেখযোগ্য প্রভাব সৃষ্টি হয়। এতে মানুষের মধ্যে সহানুভূতি জাগ্রত হয়, কেননা শেখ মুজিব বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালান। বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা ব্যাপক প্রচার লাভ করে এবং ন্যায় বিচারের জন্য জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে।

১৯৬৮ সালের প্রথম দিকে আইয়ুব অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাতে প্রশাসনে তার হাত দুর্বল হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য উত্তরসূরি অনুসন্ধান আরম্ভ হয়ে যায়। আর্মি কমান্ডার ইন-চীফ এবং উভয় অংশের উচ্চাকাঙ্ক্ষী লোক যেমন ভুট্টো একটা সুযোগ খুঁজে পান।

১৯৬৮ সালের দিকে উভয় অংশে ক্ষোভ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে পেশোয়ারে ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে এবং কিছু ছাত্র আহত হয়। ভুট্টো তখন রাওয়ালপিন্ডিতে উপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাকে পুঁজি করে বিক্ষোভ আরো বাড়তে থাকে।

১৯৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে একটা জনসভা শেষে মওলানা ভাসানী পরবর্তী দিন হরতালের ডাক দেন। সর্বত্রই ব্যাপকভাবে হরতাল পালিত হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয় শক্তিকে উত্তেজিত করতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ পরবর্তী সময়ে তারা কী পদক্ষেপ অবলম্বন করবেন সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য মিলিত হন এবং ডিসেম্বরের ১৩ তারিখে প্রত্যেকটি প্রদেশে হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেন। ডিসেম্বরের ৮ তারিখে মওলানার আহ্বানে হরতাল সফল হয়নি। এমন সময় জরুরি অবস্থা দেশে কার্যকর ছিল, সরকার হরতাল বানচাল করার জন্য নিয়োগ করে। জনসাধারণ স্বভাবতই আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত ছিল। ছাত্র, যারা সর্বদাই সংগ্রামরত কর্মী, এই পরিস্থিতিতে খুব দ্রুত সাড়া দিল এবং আন্দোলন পরিচালনা করতে একত্রিত হলো। পূর্ব পাকিস্তানে অগ্রণী ছাত্র সংগঠনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটা Student Action Committee গঠন করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদকে এই কমিটির আহ্বায়ক করা হয়।

Student Action Committee ১১ দফা দাবি পেশ করে। সত্যি সত্যিই ১১ দফা কর্মসূচিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ১ নং দফায় পৃথক শিক্ষা বিষয়ে ১৫টি দাবি, যেমন ছাত্র বেতন ৫০% হ্রাস করা, পলিটেকনিক ছাত্রদের সীমিত কোর্সের সুবিধা প্রদান, মাতৃভাষাকে সর্বক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম করা, শিক্ষা বাধ্যতামূলক এবং অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক হতে হবে ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর ব্যাপক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবি উপস্থাপন করা হয়। আওয়ামী লীগের ৬ দফার সারবস্তু কিছু উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনসহ পরিপূর্ণভাবে বাস্তবে রূপ দান করা হয়। প্রাক্তন প্রদেশগুলোত সম্পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সাব ফেডারেশন গঠনের আহ্বান জানানো হয়। এক ইউনিট বাতিল দাবি করা হয়। নির্যাতনমূলক আইন বাতিল এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দাবি করা হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের দাবিও জানানো হয়। পররাষ্ট্র বিষয়ে CENTO, SEATO এবং পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মিলিটারি চুক্তি বাতিল এবং নিরপেক্ষ ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের দাবিও ছিল। অর্থনীতি বিষয়ে ব্যাংক, বীমা এবং পাটসহ

বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের দাবি উত্থাপন করা হয়। কৃষকদের জন্য কর ও ভূমি-রাজস্ব হ্রাসের দাবি জানানো হয়। কৃষকদের বকেয়া ঋণ মওকুফ করার দাবিও জানানো হয়। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য প্রতি মণ ৪০ টাকা দাবি করা হয়। শিল্প-শ্রমিকদের জন্য গ্রহণযোগ্য মজুরি ও শ্রমিকবিরোধী কালো আইন বাতিলসহ কল্যাণমূলক সুবিধার দাবি জানানো হয়। বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও দাবি করা হয়। ছাত্রদের ১১ দফা দাবি এভাবে চার্টার অব ডিমান্ডে রূপলাভ করে এবং এগুলোকে সামনে রেখে ছাত্ররা তাদের আন্দোলন চালিয়ে যায়।

এই চার্টার অব ডিমান্ড একাধিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ে। ৬ দফা কর্মসূচির সারবস্তুর অন্তর্ভুক্তির অর্থ যে এগুলো শুধু একটা রাজনৈতিক দলের দাবি নয় বরং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের অনুসারী সব বড় বড় ছাত্র সংগঠনের সমর্থন লাভ করেছে এবং এভাবেই পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক রাজনৈতিক দাবিতে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থনৈতিক দাবিগুলো বিশদভাবে ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে ছাত্ররা নিশ্চিত করে যে সকল রাজনৈতিক সংগ্রাম অবশ্যই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেবে, যা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে নিহিত রয়েছে। পররাষ্ট্র বিষয়ে একটি স্বাধীন ও জোটনিরপেক্ষ পথের উল্লেখ রয়েছে।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যেই কর্মপন্থা উদ্ভাবনের জন্য মিটিং-মিছিল করে যাচ্ছে এবং ছাত্রদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা জেলে থাকায় অন্যান্য বিরোধী নেতাদের নিয়ে সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। ৬ জানুয়ারির সফল হরতালের পরে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কেএসপি, আওয়ামী লীগ (পিডিএস), কাউন্সিল মুসলিম লীগ, জামাতে-ইসলামি, নিজাম-ই-ইসলাম, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ফ্রন্টসহ প্রতিনিধিত্বকারী উভয় অংশের বিরোধী নেতৃবৃন্দ ঢাকায় ১০ জানুয়ারিতে মিলিত হন।

আমি করাচিতে সেন্ট্রাল বার কাউন্সিলের সভা থেকে ফিরে এসে দেখতে পেলাম নেতারা তখনো একটা সর্বজন গৃহীত দাবিনামার উপর সম্মত হতে পারছেন না। সমঝোতার প্রধান বাধা ৬ দফা, স্বায়ত্তশাসন ফর্মুলা গ্রহণে পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দের গররাজি থেকে সৃষ্টি হয়। আগলতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারে গড়িমসি পরিলক্ষিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ Democratic Action Committee তে যা প্রতিষ্ঠা করা হবে, তাদের অংশগ্রহণের শর্ত হিসাবে একটা সর্বজন গৃহীত দাবির উপর জোর প্রদান করে। এসব দফা অন্তর্ভুক্তিতে দৃঢ়তা সহকারে বলে যে, দুটো অংশের বিরোধী নেতৃবৃন্দের মধ্যে উদ্দেশ্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। একটি ফেডারেল সংসদীয় সরকারের জন্য একটা দাবি

অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে এটা আরো জোরালো হয়। যার ভিত্তিতে ছাত্ররা তাদের জনপ্রিয় আন্দোলন পরিচালনা করে তাদের ১১ দফা কর্মসূচির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে ৬ দফা কর্মসূচি অন্তর্ভুক্তি করা হয়।

আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। Democratic Action Committee ১৭ জানুয়ারি জাতীয় প্রতিবাদ দিবস আহ্বান করে। যদি প্রয়োজন হয় দণ্ডবিধির ধারা ১৪৪ অনুসারে মিছিল নিষিদ্ধ করার যে-কোনো আদেশ অমান্য করা হবে বলে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে বায়তুল মোকাররমের সম্মুখে Democratic Action Committee-র নেতৃবৃন্দ সমবেত হন। এ কারণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, এই প্রথম রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ গঠনতান্ত্রিক রাজনীতিতে শ্রদ্ধাশীল থেকে আইন অমান্য করে। ছাত্রসমাজ, যারা জনপ্রিয় আন্দোলনের জঙ্গি গোষ্ঠীকে প্রতিনিধিত্ব করে, প্রতীকী বিরুদ্ধাচরণে রাজি নয়। ছাত্রদের একটা বিরাট মিছিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাত্রা আরম্ভ করে এবং পুলিশের সাথে মিছিলের সংঘর্ষ বাধে। উক্ত মিছিলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। আসাদ নামে একজন ছাত্র নিহত হয়। একটা আন্দোলনের জন্য শহীদের রক্ত হচ্ছে সর্বাধিক শক্তিশালী ইন্ধন। আসাদ শহীদ হওয়ার পর আন্দোলনের নেতৃত্ব কার্যত ডিএসি এর পরিবর্তে Student Action Committee এর বিক্ষোভ সর্বত্রই ছড়িয়ে পড়ে। জরুরি অবস্থা কার্যকর থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল প্রতিদিনের চিত্রে পরিণত হয়। গুলিবর্ষণে আরো লোকের প্রাণহানি ঘটে এবং পুলিশকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করা হয়। বস্তুত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রত্যেকটি আদেশ অমান্য করা হয়। শহরে আরোপিত সান্ধ্য আইন যখনতখন ভঙ্গ করা হয় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আর্মির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য আর্মি নিয়োগ করলে আর্মির গুলিতে এক বালক, একজন গৃহবধূ, একটি শিশু এবং ক্যাম্পাসের ভিতরে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নিহত হন। সরকার উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে। গ্রাম অঞ্চলে স্থানীয় কার্যকরী কমিটি কার্যত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কাজ করে। শহর এলাকার ছাত্র নেতৃবৃন্দকে ব্যবস্থাপনা ও উচ্চতর মঞ্জুরি ও উন্নত্বর কর্মপরিবেশের দাবিরত শ্রমিকদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদ মিটানোর জন্য আহ্বান করা হয়।

পশ্চিম পাকিস্তানেও বিক্ষোভ তুঙ্গে ওঠে। এটা স্পষ্ট যে, আইয়ুব সরকার, যারা কেবল কয়েক মাস পূর্বে আর্মির ছাত্রছায়ায় উন্নয়নের দশক পালন করে, জনগণের দাবি মেটানোর জন্য চারদিক থেকে চাপের সম্মুখীন হচ্ছিল।

ঠিক এই সময়ে মঞ্জুর কাদের যিনি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় চিফ

প্রসিকিউটর হিসাবে ঢাকায় অবস্থান করছিলেন, এক মামলায় আদালতে তার সংস্পর্শে জড়িয়ে পড়ি। তিনি বিক্ষোভে বিব্রতবোধ করেন। আমি তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে, আইয়ুব সরকারের উচিত দেয়ালের লিখনগুলো পড়া এবং জনগণের নিকট দোষী সাব্যস্ত হওয়ার চেয়ে জনগণের দাবি মেনে নেয়ার জন্য আইয়ুবকে অনুরোধ করবেন, কিন্তু তিনি ১৯৬২-এর সংবিধানের দিকে ঝুঁকে পড়েন। ঐ সংবিধানের তিনি স্থপতি ছিলেন। তিনি এই দাবি করতে থাকেন যে, ১৯৬২-র সংবিধান শর্ত সৃষ্টি করেছে, যা বর্তমান বিক্ষোভ সৃষ্টিতে সাহায্য করেছে এবং এভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি হয়।

১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারির ১ তারিখে বেতার ভাষণে আইয়ুব খান দেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রতি আহ্বান জানান। এই প্রস্তাবিত আলোচনা খুব শিগগিরই রাউন্ড টেবিল কাউন্সিলে অনুষ্ঠিত হবে। আইয়ুব খান Democratic Action Committee-র প্রতিনিধি হিসাবে নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খানকে সম্বোধন করে ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে আলোচনার জন্য বিরোধী নেতৃবৃন্দকে আহ্বান করতে একটা চিঠি দেন।

এই পদক্ষেপটিকে আন্দোলনের শক্তি এবং আইয়ুবের ক্রমবর্ধমান দুর্বলতার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন হিসাবে দেখা হয়। ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি দরকষাকষি করে টেবিলে বসানোর জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও সব রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির আহ্বান জানায়। এই প্রসঙ্গে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও শেখ মুজিবের মুক্তি বিশেষ গুরুত্ব পায়। পূর্বাঞ্চলে Democratic Action Committee-র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ আওয়ামী লীগ স্পষ্ট করে দেয় যে, মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তি হবে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য ন্যূনতম শর্ত। Democratic Action Committee-র নেতৃবৃন্দ এবং কিছু-কিছু বাঙালি নেতৃবৃন্দ আগরতলা মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনায় আইনগত বাধার কথা উল্লেখ করে এবং গুরুত্বারোপ করে যে, শেখ মুজিবের মুক্তি ও আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার আলোচনার সময় নিশ্চিত করা হবে। এটা স্পষ্ট ছিল যে, তাদের এ ধারণা থেকেই তাদের বিরোধ সৃষ্টি হয়। আলোচনায় শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের অর্থ হচ্ছে যে ৬ দফা কর্মসূচি কোনো রাজনৈতিক মীমাংসার কেন্দ্রবিন্দু হবে। বিশেষ করে অন্য বাঙালি নেতৃবৃন্দ অনুধাবন করেন যে, শেখ মুজিবের ৬ দফা দাবিকে পাশ কাটিয়ে একটা মীমাংসায় পৌঁছানোর যেকোনো প্রচেষ্টা বাঙালি জনগণ দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হবে এবং সম্পূর্ণভাবে মীমাংসার ভার

তাদের ওপর ছেড়ে দেয়া হবে। আওয়ামী লীগ আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে অটল থাকে। এরূপ চাপের মুখে Democratic Action Committee আইয়ুবের নিকট বিষয়টি উত্থাপন করে। আইয়ুব এ বলে বাতিল করে দেন যে, যেহেতু শেখ মুজিব বিচারাধীন রয়েছেন, সেক্ষেত্রে তাকে মুক্তি দেয়ার ক্ষেত্রে কিছু আইনগত অসুবিধা রয়েছে।

আমি বিরোধী নেতৃবৃন্দ এবং বিশেষ করে মানিক মিয়ার দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকের সাথে ঘনিষ্ঠ ছিলাম। ১৯৬৬ সালের জুন মাস থেকে যখন মানিক মিয়া আটক ছিলেন এবং ইত্তেফাক বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল তখন আমি হাইকোর্টে বিষয় উত্থাপনের জন্য নিয়োজিত ছিলাম। মানিক মিয়ার বাড়ি বিরোধী নেতাদের এবং বিশেষ করে রাজনৈতিক ও ছাত্র-নেতাদের আলোচনার স্থান ছিল। মানিক মিয়া শেখ মুজিবের মুক্তি ও রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে তার অংশগ্রহণে খুবই গুরুত্ব আরোপ করে। তার সাথে আলোচনায় আমি ইঙ্গিত দিই যে, বিচারকার্য বানচাল করার জন্য আইনগত কৌশল প্রয়োগ করা হবে এবং তারপর শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য আরো চাপ সৃষ্টি করা হবে।

যখন সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল, আমি একটা বার্তা পেলাম শেখ মুজিব কোর্টরুমে আমাকে তার কাছে যেতে বলেছেন। সেখানে বিচারকার্য পরিচালিত হচ্ছিল। আমি পরের দিন কোর্টরুমে তার ছুটে যাই। শেখ মুজিব তার প্রধান ডিফেন্স কাউন্সিল আব্দুস সালাম কর্তৃক গৃহীত অবস্থানে বিব্রতবোধ করেন। সালাম খান মামলা প্রত্যাহার বা রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে আওয়ামী লীগের অংশগ্রহণের জন্য পূর্বশর্ত হিসাবে তার মুক্তির জন্য পীড়াপীড়ি না করতে শেখ মুজিবের উপর চাপ প্রয়োগ করতে আরম্ভ করেন। প্রতীয়মান হয় যে, তিনি একটা গোপন হুমকিও দেন যে, তিনি আর তার ডিফেন্স কাউন্সিল হিসাবে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন না, শেখ মুজিব যদি অবস্থানে অনড় থাকেন। এতে শেখ মুজিব রাগান্বিত হন এবং বলেন যে, তিনি শুধু ডিফেন্স কাউন্সিল হিসাবে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করবেন এবং বিচার বানচাল করার জন্য বৈধ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। তিনিও একমত হন যে এস. এফ. ব্রোহালি কাছে থেকে সহায়তা গ্রহণ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইত্তেফাকের মামলা তিনি পরিচালনা করেছিলেন। আমি ঐ সব নির্দেশনা মোতাবেক কাজ করি।

আন্দোলন জোরদার হওয়ার সাথে পুলিশ এবং গভর্নর মোনায়েম খান ও বেসামরিক প্রশাসন পিছনের পটভূমিতে সরে আসতে শুরু করে। জেনারেল অফিসার কমান্ডিং জেনালের মুজাফ্‌ফর উদ্দিন ইসলামাবাদ কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধি হিসাবে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে আগমন করতে আরম্ভ করেন। এটাও মনে করা হয় যে,

ইয়াহিয়া কমান্ডার ইন-চিফ, তার জেনারেল অফিসার কমান্ডিং-এর মাধ্যমে পূর্ব অংশে, পরিস্থিতির একটা সরাসরি মূল্যায়ন জানতে চেষ্টা করেন। আমি জানুয়ারিতে একটা সভায় মানিক মিয়ার সাথে মুজাফ্ফর উদ্দিনকে বোঝানোর চেষ্টা করে দেখতে পাই যে, ইয়াহিয়া তার কাছ থেকে পরিস্থিতির একটা মূল্যায়ন চেয়েছেন এবং তিনিও বিশ্বাস করেন যে, রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানো হবে। ইয়াহিয়ার কাছে বিষয়সমূহ অবগতির চেষ্টা চালান। এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় যে, ইয়াহিয়া স্বাধীনভাবেই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহারের গুরুত্ব দেয়া হয় যাতে করে শেখ মুজিব মুক্তিলাভ করবেন এবং কেবল তখনই রাজনৈতিক মীমাংসার জন্য দরকষাকষি শুরু হবে। প্রায় ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জেনারেল মোজাফ্ফর উদ্দিনকে রিপোর্ট করা হয় যে, তিনি তার কাছে উত্থাপিত পয়েন্টসমূহ ইয়াহিয়াকে জানিয়েছেন এবং ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দিয়েছেন যে যদি শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য একটা আইনগত পন্থা উদ্ভাবন করা যায়, তবে তা বিবেচনা করা হবে।

বিচারকার্য বানচাল করার জন্য আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণে মানিক মিয়া আমাকে জোর সুপারিশ করেন। এজন্য আমি ব্রোহীর সাথে আইনগত পরামর্শের জন্য করাচি রওনা দিই এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি করাচিতে উপস্থিত হই। সেদিন দেশব্যাপী হরতাল পালিত হচ্ছিল এবং আমি দেখতে পাই যে করাচিতে জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়েছে। আমাকে আমার হোটেল থেকে ব্রোহীর বাসা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতে হয়। ব্রোহী তৎক্ষণাৎ বিচারকার্যে একটা আইনগত দিকনির্দেশনা প্রণয়নে সাহায্য করতে রাজি হয়ে যান কিন্তু বলেন যে, মামলার জন্য এযাবৎ রেকর্ডকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণসহ যাবতীয় কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য তিনি ঢাকায় অবশ্যই আসবেন। আমি ঐ দিন সন্ধ্যায় ঢাকা রওনা হই এবং ব্রোহী পরদিন সকালে ঢাকায় উপস্থিত হন। কাগজপত্রসমূহ ভালোভাবে পড়ে দেখা যায় যে বিচার কার্যের আইনগত বৈধতা চ্যালেঞ্জ করার জন্য একটা শক্তিশালী পয়েন্ট রয়েছে। কিন্তু এখন এটা পরিষ্কার যে জরুরি অবস্থা ঘোষণা বাতিল করা হচ্ছে। উক্ত ঘোষণা বাতিল করে ১৯৬২ সংবিধানের মৌলিক অধিকারের বিধানসমূহ পুনরায় কার্যকর করা হবে। এর সাথে যুক্তি দেখানো হয় যে, বিশেষ ট্রাইব্যুনাল দ্বারা এর বিশেষ প্রক্রিয়াসহ, আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান ও সমান মর্যাদা পাওয়ার মৌলিক অধিকার ভঙ্গ করা হয়েছে। মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তি আহ্বান জানিয়ে একটি নোটিশ সরকারের ওপর জারি করা হবে। ব্রোহীসহ আমি নিজে নোটিশটি মঞ্জুর কাদেরের কাছে হস্তান্তর করি। মঞ্জুর কাদের মনে করেন যে, উত্থাপিত বিষয়ে কিছু সারবস্তু

রয়েছে এবং তিনি টেলিফোনে আইয়ুবের সাথে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

যখন মঞ্জুর কাদেরের সাথে এ বিষয়টি আলোচিত হয়, তিনি একটা টেলিফোন কল পান এবং তাকে বিক্ষুব্ধ দেখায় টেলিফোনে প্রাপ্ত বার্তার প্রেক্ষিতে। তিনি জানালেন যে, তাকে সবেমাত্র বলা হয়েছে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার একজন অভিযুক্ত ব্যক্তি, সার্জেন্ট জহুরুল হককে মিলিটারি গার্ড কর্তৃক গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে এবং আরো অভিযুক্ত ২ ব্যক্তি আহত হয়েছেন। তার বিক্ষুব্ধতা থেকে বোঝা যায় তিনি পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে পেরেছেন। এটা স্পষ্ট যে, এ খবর প্রকাশ পেলে একটা জনরোষের সৃষ্টি হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুবই উদ্বিগ, কারণ সার্জেন্ট জহুরুল হক আমার বন্ধু ও সহকর্মী এ্যাডভোকেট আমিনুল হকের ভাই। তিনি তার ভাইয়ের পক্ষে বর্তমান যুক্তিতর্ক খাড়া করার জন্য কয়েক দিন পূর্বে আমার নিকট থেকে প্রতিশ্রুতি অর্জন করেন। জারিকৃত নোটিশের সাথে সম্পত্তির জন্য চাহিদার গুরুত্ব মঞ্জুর কাদেরকে বোঝানো হয়।

জহুরুল হকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া বিকেলে নির্ধারণ করা হয়। পল্টনে জানাজার পরেই আমি আমার কিছু বন্ধুসহ আজীমপুর কবরস্থানের উদ্দেশে রওয়ানা হই। কমপক্ষে দুই ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও তার মরদেহ পৌঁছায়নি। এতে কিছু কারণ সৃষ্টি হতে থাকে। জানা যায়, মিছিলকারীদের উপর এক মন্ত্রীর বাড়ির বাগান থেকে ফুল সংগ্রহের চেষ্টাকালে গুলিবর্ষণ করা হয়। কিছু মিছিলকারী বিক্ষুব্ধ হয়ে মন্ত্রীর বাড়ি আক্রমণ করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার জজের বাড়িসহ অন্যান্য সরকারি কর্মকর্তাদের বাড়ি একটার পর একটা আক্রমণ করতে থাকে এবং জ্বালিয়ে দেয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরেই আমি হোটেলের দিকে রওয়ানা হই, ব্রোহীও ওই হোটেলেই অবস্থান করছিলেন এবং অনেক বাড়িঘর আগুনে পুড়ে যেতে দেখি। আমি ব্রোহীর সাথে মঞ্জুর কাদেরকে দেখতে পাই। তিনি বলেন, তিনি ইতিমধ্যে রাওয়ালপিন্ডির সাথে কথা বলেছেন কিন্তু তিনি কোনো উত্তর পাননি। মঞ্জুর কাদের জোর দেন যে সম্ভবত জহুরুল হকের মৃত্যুতে জনগণের আবেগের ফলে বিচারকার্য চালানো হবে না। যার ফলে ইতিমধ্যে প্রিজাইডিং জজের বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়। মঞ্জুর কাদের অভিযোগ করেন আশা করা আর ঠিক হবে না যে বিচার অব্যাহত থাকবে। এমনকি তিনি দার্শনিক মন্তব্য প্রদান করেন, বিচারের বিষয় জনসাধারণকে বুঝতে হবে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ দোষী এবং বিচার দাবি তাদের শাস্তি প্রদান করা হোক। এই একটি ক্ষেত্রে যেখানে জনসাধারণ মনে করে

ফেলেছে যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কেবল নির্দোষ তাদের কাছে স্পষ্ট যে তারা নায়কও বটে। বিচারকার্য অব্যাহত রাখার অল্প স্বল্প পয়েন্ট রয়েছে। সিদ্ধান্ত হয় যে মঞ্জুর কাদের ও ব্রোহী দু'জনেই পরবর্তী দিন সকালে রাওয়ালপিন্ডি রওয়ানা হবেন এবং কর্মসূচি প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির জন্য সরকারের নিকট জারিকৃত লিগ্যাল নোটিশের বিষয়টি আলোচনা করবেন। ইতিমধ্যেই ২ দিন অতিবাহিত হয়ে গেছে। কোনো উত্তর পাওয়া যায়নি। ব্রোহী করাচির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং আমাকে টেলিফোনে জানান যে, নোটিশটি এখনো আইন মন্ত্রণালয় যাচাই-বাছাই করে দেখছে।

রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স ১৭ ফেব্রুয়ারিতে আরম্ভ হয়নি এবং উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের মুক্তি নিশ্চিত করার জন্য আরো প্রচেষ্টা চালানোর জন্য রাওয়ালপিন্ডি আমাকে যেতে বলা হয়। তাজউদ্দীন আহমেদ, যিনি সবেমাত্র জেল থেকে মুক্তি লাভ করেছেন, আমিরুল ইসলাম এবং আমি নিজে ১৭ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিন্ডি পৌঁছি। একটা গুমোট আবহাওয়া বিরাজ করছিল, যেহেতু শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হয়নি এবং ফলস্বরূপ Democratic Action Committee আইয়ুবের সাথে কনফারেন্স টেবিলে বসতে পারেনি। মানজার বশির, একজন এডভোকেট, যিনি বিরোধীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, পরিস্থিতি আঁচ করার জন্য সকালে আইন মন্ত্রী জাফরের সাথে দেখা করতে চেষ্টা করেন। আমাকে প্রায় মধ্যরাতে জানানো হয় যে, তিনি পরের দিন সকালে জাফরের সাথে দেখা করবেন। জাফর আইনগত অসুবিধা সম্পর্কে কিছু উচ্চবাচ্য করেন। কিন্তু যখন লিগ্যাল নোটিশের উত্তর দেয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ করা হয়, তিনি বললেন, এটা কেবল আইনের বিষয় নয়, সর্বোচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তও বটে।

তাকে বোঝানো হয় যে, নোটিশটি একটি স্পষ্ট উত্তরের যোগ্যতা বহন করে এবং অনতিবিলম্বে এর উত্তর দেয়া উচিত। তিনি বললেন, একই দিন সকালে বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদে আলোচিত হচ্ছে এবং দুপুরের আগেই তিনি আমাকে একটি উত্তর দেবেন। তিনি তাকে দেয়ার জন্য আরো একটি নোটিশ বা নোটিশের সারমর্ম প্রদানের জন্যও বললেন। এক ঘন্টার মধ্যে একটা নতুন নোটিশ তার নিকট প্রেরণ করা হলো। প্রায় সাড়ে বারটায় জাফর আমাকে টেলিফোন করে বললেন যে, তিনি তার সাথে হোটেলে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি এসে জানালেন যে, মন্ত্রিপরিষদ না-সূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন তারা প্রসঙ্গটি নোটিশে অন্তর্ভুক্ত করার সাথে একমত নন। আমার প্রতিক্রিয়া ছিল ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধ, যা আমি মঞ্জুর কাদেরকে অবগত করলাম। তিনিও সরকারের নিতিবাচক মনোভাবে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, পরে আমার সাথে কথা বলবেন এবং

তারপর তিনি জাফরের সাথে কথা বলতে আরম্ভ করেন।

সেই বিকেলে মঞ্জুর কাদের একই হোটেলে তার কক্ষে তার সাথে দেখা করার জন্য আমাকে টেলিফোন করেন। জাফর হোটেলে উপস্থিত হলে তিনি সোজাসুজি তার কক্ষে প্রবেশ করেন। তারা (মঞ্জুর কাদের এবং জাফর) প্রস্তাব করেন যে, সরকার একটা ঘোষণা প্রদানের জন্য প্রস্তুত। শেখ মুজিব 'একজন মুক্ত মানুষ' হিসাবে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করতে পারবেন। আইনগত অবস্থানের ব্যাখ্যা প্রদান করতে বলা হলে জাফর চুপচাপ ছিলেন এবং বলেন, এটাই হচ্ছে একমাত্র ফরমুলা, যা সরকারকে গ্রহণের জন্য তিনি রাজি করাবেন। তারা জোর সুপারিশ করেন যাতে আমি এটা শেখ মুজিবকে অবগত করি।

তাজউদ্দীন, আমিরুল ইসলাম এবং আমি নিজে লাহোর ও করাচি হয়ে ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করি। যেহেতু সেটাই ছিল একমাত্র রুট, যার মাধ্যমে পরদিন সকালে ঢাকায় পৌঁছানো যায়। আসগর খান লাহোর এয়ারপোর্টে এবং ব্রোহী করাচি এয়ারপোর্টে আমাদের সাথে দেখা করেন। মঞ্জুর কাদের যাত্রার আগে আমাকে নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, তিনি নোটিশে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি মেনে নিতে আইয়ুবের ওপর পুনরায় চাপ প্রয়োগের জন্য সন্ধ্যায় আইয়ুবের সাথে দেখা করবেন।

সেদিন ছিল ১৮/১৯ ফেব্রুয়ারি রাত। করাচি এয়ারপোর্ট থেকে মঞ্জুর কাদেরকে টেলিফোন করা হয়। মঞ্জুর কাদের ব্যাখ্যা দিলেন যে, তিনি আইয়ুবের সাথে দেখা করার জন্য সারারাত বসে ছিলেন কিন্তু তাকে বলা হয়েছে আইয়ুব একটা সভায় ব্যস্ত রয়েছেন। তিনি এ ঘটনায় তার বিস্ময় প্রকাশ করেন, মাঝরাতে প্রেসিডেন্ট কোথায় ব্যস্ত থাকতে পারেন। তিনি বলেন, সেটাই ছিল সম্ভবত একমাত্র সময় যখন তিনি আইয়ুবের সাথে দেখা করতে চান এবং তা করতে ব্যর্থ হন। তিনি বিশ্বাস করেন, এই পরিস্থিতিতে এটা প্রতীয়মান হয় যে, কিছু অতিরিক্ত বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পরে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে এটা ছিল একটা চূড়ান্ত সভা, যেখানে আইয়ুব তার তিন বাহিনীর প্রধানকে তলব করেন। আইয়ুব গণআন্দোলন দমন করার জন্য সামরিক শাসন সমর্থন ও মিলিটারি নিয়োগ করার জন্য প্রধানদের সুপারিশ করেন। তিন বাহিনী প্রধান অগ্রসর হতে অস্বীকার করেন। স্বাভাবিকভাবেই ইয়াহিয়া রাজনৈতিক দায় হয়ে পড়েন এবং ঘটনা থেকে বোঝা যায় যে, ইয়াহিয়ার নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। যদি জনগণকে দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে ব্যবহার করা হয় তবে তা ইয়াহিয়া এবং তার চারদিকের বন্ধুদের

স্বার্থে, আইয়ুব ও তার ভেঙেপড়া সরকারের স্বার্থে নয়। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা এই সাক্ষ্যের বিবরণ সমর্থন করেছেন যখন তিনি নিম্নরূপভাবে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সশস্ত্র বাহিনীর নেতাদের ও আইয়ুবের মধ্যকার সভা নিয়ে রিপোর্ট করছিলেন। ১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়ার মন্ত্রিপরিষদে আমি যোগদান করার পর ইয়াহিয়ার সাথে মিলিত হলে আইয়ুব ও উর্ধ্বতন সশস্ত্র বাহিনীর লোকদের মধ্যে কয়েক দফা মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এই বর্ণনাটি জেনারেল আকবর ও প্রেসিডেন্সিয়াল হাউস স্টাফের সদস্য কর্তৃক সমর্থন করা হয়। সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর প্রধানগণ ও তাদের সহকর্মীগণের আইয়ুবের সাথে যৌথ ও পৃথক সভা হয়। সবচেয়ে উল্লেখ্যযোগ্য সভা মধ্য ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত হয়, যখন তিন বাহিনীর প্রধানগণ জেনারেল ইয়াহিয়া, এয়ার মার্শাল নুর খান এবং ভাইস এডমিরাল আহসান একটি রাজনৈতিক মীমাংসার লক্ষ্যে কাজ করার জন্য আইয়ুবকে বলেন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন দমন করার জন্য মিলিটারির উপর নির্ভর না করতেও আইয়ুবকে পরামর্শ দেন। এই উল্লেখ্য কনফারেন্সের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল কে তাদের প্রভুকে অপ্রীতিকর সত্য বলবেন তা স্থির করা। একটা বিরতি, জড়তা এবং নীরবতার সৃষ্টি হয়। নৌবাহিনীর আহসান উদ্যোগ গ্রহণ করবেন না, যেহেতু তিনি তার নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে চান। ইয়াহিয়ার জন্য এটা অসম্ভব, কারণ আইয়ুব কিছু সিনিয়র জেনারেলকে পাশ কাটিয়ে তাকে সেনাপ্রধান করেন। শেষ পর্যন্ত দায়িত্ব পড়ে বিমান বাহিনী প্রধান নূর খানের ওপর। তিন বাহিনীর প্রধানগণ প্রশাসনকে কার্যকর রাখতে এবং কোনো বাইরের দেশ বিশেষ করে ভারত দ্বারা আক্রান্ত হওয়া থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য সর্বনিম্ন পর্যায়ে সশস্ত্র বাহিনীকে ব্যবহার করতে সম্মত হন। আইয়ুবের নিকট একটা রাজনৈতিক মীমাংসা চাওয়ার পরামর্শ নিঃসন্দেহে একটা প্রচণ্ড আঘাত হিসাবে দেখা দেয়। বিগত ১৮ বছর ধরে (১৯৫০-৬৮) সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান মোকাবিলাবিহীন থাকার পরে তাদের দ্বারা তিনি প্রত্যাখ্যাত হন। তাকে একজন ভ্রাম্যমাণ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার জন্য রিপোর্ট করা হয়।

আইয়ুব এবং তিন বাহিনীর প্রধানগণের মধ্যে যখন এই নিষ্ফল আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, তখন আমার সহকর্মীবৃন্দ ও আমি রাওয়ালপিন্ডিতে কী প্রকাশ করা হয় তার ওপর শেখ মুজিবকে রিপোর্ট করার জন্য ঢাকা ফিরে যাচ্ছিল।

বিমানবন্দরে মানিক মিয়া আমাদের অভ্যর্থনা জানান এবং আমরা সেনাসদরের দিকে অগ্রসর হই। যখন শেখ মুজিবকে জাফরের প্রস্তাব বলা হয় যে তিনি একটা ঘোষণার ভিত্তিতে রাওয়ালপিন্ডি যাবেন তিনি একজন মুক্ত মানুষ। শেখ মুজিব এটা অগ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্ত হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বলেন,

শর্তে রাওয়ালপিন্ডি গেলে তার অবস্থান খুব খারাপ হবে এবং জনগণ তাকে গুলি করে হত্যা করবে। তিনি বললেন, বিচারকার্য ডিঙিয়ে একটা লিগ্যাল নোটিশ ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে এবং এটা গ্রহণ করা তাদের ব্যাপার। তিনি বেরিয়ে আসাকেও সমর্থন করেননি। বিশেষ করে যখন অন্য অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ জেলে থাকবেন।

আমি যখন এটা জেনারেল মুজাফ্ফর উদ্দিনকে অবহিত করি, তখন তিনি বলেন, তাকে বলা হয়েছে যে তার পরামর্শকৃত ফরমুলা শেখ মুজিবের কাছে অগ্রহণযোগ্য এবং তিনি গ্রহণ করুন বা না করুন, নোটিশ বা বিষয়টি হাইকোর্টে উঠানো হবে এবং হাইকোর্ট তার মুক্তির আদেশ দিতে পারেন। জাফর বললেন, তিনি কিছুক্ষণ পর টেলিফোন করবেন। তিনি এ-কথা বলার জন্য টেলিফোন করবেন হাইকোর্টের কার্যপ্রণালী সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং তার পরিবর্তে শেখ মুজিবের মুক্তির অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ দিতে ট্রাইব্যুনালকে বসার জন্য বলা হবে এবং এটা হবে জামিনে মুক্তির মতো।

এর অগ্রগতি শেখ মুজিবকে জানানো হয়। তিনি বললেন, জামিনের জন্য তার আবেদন করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ইতিমধ্যে বিশেষ ট্রাইবুনালের ২ জন বাঙালি জজকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে আসা হয়। অবশ্য একজন প্রসিকিউটিং আইনজীবীও ছিলেন। তিনি প্রস্তাব দেন যে, জামিনে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হতে পারে। যখন আমার সহকর্মী আমিরুল ইসলাম এই অগ্রগতি শেখ মুজিবকে জানানোর জন্য তার কাছে যান, শেখ মুজিব দৃঢ়ভাবে জামিনে মুক্তির প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করেন। একটা রিপোর্ট তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলে, তাহলে। যে শেখ মুজিবকে জামিনে মুক্তি দেয়া হচ্ছে। শোনা যায় যে শেখ মুজিবকে ঐ দিন সন্ধ্যায় মুক্তি দেয়া হবে। হাজার হাজার লোক এয়ারপোর্ট রোড থেকে ক্যান্টনমেন্ট পর্যন্ত পায়ে হেঁটে এগিয়ে যেতে থাকে। জামিনে মুক্তি শেখ মুজিবের দৃঢ় প্রত্যাখ্যানের পরিপ্রেক্ষিতে একটি মিলিটারি ভ্যান লাউডস্পিকার নিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই ঘোষণা দিতে দিতে যে, ঐ সন্ধ্যায় শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হবে না। ইতিমধ্যে খাজা সাহাবুদ্দিন ও এডমিরাল এ আর খানসহ আইয়ুবের মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ঢাকায় উপস্থিত হয়েছেন। তাকে রিপোর্ট করার পর আমি যখন শেখ মুজিবের কাছে থেকে বিদায় নিচ্ছিলাম, আমরা তাকে ট্রাইব্যুনালের কথা বললাম। এডমিরাল এ আর খান এবং খাজা সাহাবুদ্দিনকে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলার জন্য প্রবেশ করতে দেখলাম।

এটা পরিষ্কার যে আইয়ুব হাঁসফাঁস করছিল। অতীতের দৃষ্টিতে এটা স্পষ্ট বাহিনীর প্রধানগণ তাকে পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, মিলিটারি অপশন তার কাছে

খোলা ছিল না। অতএব, তাকে রাজনৈতিক নেতাদের সাথে দরকষাকষি করতে হয়েছে। তার কাছে এই অপশন খোলা ছিল যদি শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেয়া হতো, কারণ তাকে বাদ দিয়ে দরকষাকষি খুব কমই ফলপ্রসূ হয়েছে।

পরের দিন সকালে প্রায় ১১ টা ৩০ মিনিটে ঢাকার সর্বত্রই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। শেখ মুজিব একজন মহন জাতীয় বীর এবং পূর্ব বাংলায় সৃষ্ট গণআন্দোলনের নেতা হিসাবে আবির্ভূত হন। তিনি অবস্থান গ্রহণ করেন যে, তিনি কেবল ঢাকায় জনসভা করে এবং জনগণের কাছ থেকে ম্যান্ডেট নিয়ে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের জন্য রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার চিন্তা করবেন। লক্ষ লক্ষ লোকের জনসভায় ৬ দফা স্বায়ত্তশাসনের দাবির প্রতি প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন এবং জনসভায় তাকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদান করা হয়।

এরপর শেখ মুজিব রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স যাওয়ার ম্যান্ডেট পান, এবং তিনি ঘোষণা করেন যে, জনগণের দাবি উত্থাপন করবেন। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন যে এই দাবিসমূহ মানা না হলে তিনি ফিরে আসবেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাবেন।

শেখ মুজিব তার দলের নেতাদের নিয়ে গোলটেবিল বৈঠক উদ্বোধনী অধিবেশনে যোগদানের জন্য রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশে যাত্রা করেন। প্রতিনিধিদলের সাথে সঙ্গী হওয়ার জন্য আমাকে বলা হয়। একটা আশ্চর্য মিলের ব্যাপার এই: ভুট্টো ও শেখ মুজিব একই বিমানে লাহোর যাচ্ছিলেন। ভুট্টো ও তার সহকর্মীগণ প্রথম শ্রেণীতে ছিলেন, কিন্তু শেখ মুজিব ও তার প্রতিনিধিদল ইকনোমি ক্লাসে ছিলেন। এটা শেখ মুজিবকে সুযোগ এনে দেয় বলার। প্রকৃতই আওয়ামী লীগ জনগণের দল, আর পিপিল্স পার্টি হচ্ছে বড়লোকের দল। ভুট্টো ঢাকায় শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন এবং অবস্থান গ্রহণ করেন যে, তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন না। যেহেতু তিনি অনুধাবন করতে পেরেছেন, এটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। উল্লেখ্য, মওলানা ভাসানী একই অবস্থান গ্রহণ করেন। আমি ফেব্রুয়ারিতে নবাবজাদা নসরুল্লাহ্ এবং মওলানা ভাসানীর মধ্যে বৈঠক আহ্বান করি। তখন মাওলানা জোর দিয়ে বলেছিলেন তিনি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যাবেন না, তবে সাফল্য কামনা করেন। এরপর তিনি হাত উঠিয়ে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের জন্য মোনাজাত করলেন। লাহোর বিমানবন্দরে আলাদা আলাদা গ্রুপ ভুট্টো ও শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য আসে। শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানানোদের মধ্যে ছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং জেনারেল আজম। ভুট্টো পরামর্শ দেন যে, শেখ মুজিব তার সাথে বেরিয়ে আসবেন। যারা শেখ মুজিবকে গ্রহণ করতে আসেন তারা এর

বিরোধিতা করলেন। ভুট্টো প্লেন থেকে নেমে এসে একটা ট্রাকে উঠেন এবং অনুসারীসহ এয়ারপোর্ট ত্যাগ করেন। শেখ মুজিব ও তার দল এরপর নেমে আসেন এবং জনতা তাকে অনুসরণ করে শহরের দিকে পৃথক মিছিল সহকারে আসে।

ঐদিন সন্ধ্যায় তারা রাওয়ালপিন্ডি পৌছেন। Democratic Action Committee এর একটা সভা অনুষ্ঠিত হলেও সময়ের অভাবে কোনো উল্লেখযোগ্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়নি। পরের দিন সকালে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। যেহেতু ঈদুল আজহা নিকটবর্তী সেহেতু অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পরামর্শ করার প্রয়োজন অনুভূত হয়। মতৈক্য হয় যে, কনফারেন্স ১০ দিনের জন্য মুলতবি করা হবে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে Democratic Action Committee রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স আরম্ভ হওয়ার পূর্বে একটা সাধারণ দরকষাকষির অবস্থান আলোচনা করার জন্য ২ দিনের জন্য লাহোরে মিলিত হবে।

ঢাকায় ফিরে আসার পর শেখ মুজিব পরামর্শ দেন যে ৬ দফা কর্মসূচিকে কার্যে পরিণত করার জন্য সাংবিধানিক প্রস্তাব তৈরি করতে কার্যকরী বিশেষজ্ঞ দলের (প্রধানত অর্থনীতিবিদ ও অন্যান্য পেশার) সাথে তিনি মিলিত হবেন। কিছু সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার ধারণা হয়েছিল যে ৬ দফা কর্মসূচি অকার্যকর এবং কোনো ভ্যায়াবল ফেডারেল অবকাঠামো এর চারদিকে খাড়া করা যবে না। যে সময়ে নির্দিষ্ট সাংবিধানিক প্রস্তাব তৈরি করা হয় সে সময় কার্যকরী গ্রুপ অনেক সভা করে।

শেখ মুজিব তার সহকর্মীদের নিয়ে ১৯৬৯ সালের ৬ মার্চ লাহোরের উদ্দেশে যাত্রা করেন। একজন উপদেষ্টা হিসাবে লাহোরে প্রতিনিধিদলের সাথে যোগ দিতে এবং রাওয়ালপিন্ডি যেতে আমাকে বলা হয়। অনুমান করা হচ্ছিল যে ড. সারওযার মুর্শিদ এবং ড. মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরীকে প্রতিনিধিদলে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হবে। লাহোরে পৌছে জানা যায় যে, একটা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে পৌছা যথার্থই কঠিন যেহেতু একটা মৌলিক বিচ্যুতি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বকারী নেতৃবৃন্দের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে।

শেখ মুজিব 'ডাক' এর সভায় যোগদান এড়িয়ে যান এবং অসুস্থতার অজুহাতে তার হোটেল কক্ষেই অবস্থান করেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আলোচনা থেকে দূরে থাকছিলেন, যা একটা অচলাবস্থার দিকে নিয়ে যাচ্ছিল, কারণ পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ জোরালোভাবে সভার জন্য গ্রহণযোগ্য দাবিমালায় ৬ দফা দাবির অন্তর্ভুক্তির বিরোধিতা করছিলেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সমর্থিত আওয়ামী

লীগ কর্তৃক যুক্তি প্রদর্শন করা হয় যে Democratic Action Committee এর সম্মত আট দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন এবং এক ইউনিট না করার প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত। Democratic Action Committee নিজেই Federal Parliamentary Government এর জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সুপারিশ করা হয় যে Federal Charter এর ব্যাখ্যা দিতে হবে এবং উক্ত উদ্দেশ্যের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট ভেঙে দেয়ার প্রশ্নে অবস্থান গ্রহণ Democratic Action Committee এর জন্য জরুরি। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিটের ভাঙনের ওপর গ্রহণযোগ্য অবস্থান গ্রহণের প্রবল বিরোধী। যখন এটা তার পেশ করা হয় যে federal বলতে যা বোঝায় তা ব্যাখ্যা করা জরুরি। তিনি বিপরীতে যুক্তি প্রদর্শন করেন যে federal বলতে কি বোঝায় সবাই জানেন এবং যেকোনো ক্ষেত্রে Oxford Dictionary-তে অর্থ খুঁজে দেখতে পারেন। শেখ মুজিব ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সমর্থিত আওয়ামী লীগ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে তাদের অংশগ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে একটি গ্রহণযোগ্য দাবি আদায় স্বায়ত্তশাসনের জন্য ৬ দফা দাবি অন্তর্ভুক্তির জোরালো দাবি জানান। তারা উল্লেখ করেন যে, গণআন্দোলনের চাপের মুখে কনফারেন্স আহ্বান করা হয়েছে। এই আন্দোলন তার সাংবিধানিক দাবি ধরেছে যা ১১ দফা কর্মসূচিতে বর্ণিত হয়েছে। এতে ৬ দফা এবং এক ইউনিটের ভাঙনের ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অন্তর্ভুক্ত।

এর এইরূপ পোলারাইজেশনের ফলে East Pakistan Regional Democratic Action Committee এর একটা সভা খুব তাড়াতাড়ি চামদা হাউসে আহ্বান করা হয়। সব বাঙালি প্রতিনিধিকে বোঝানো হয় যে, পূর্ব অংশে জনগণের মতামতের অবস্থা এবং ১১ দফা আন্দোলন দিয়ে বাঙালিদের দাবি এবং বিশেষ করে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির ওপর কমপক্ষে একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান গ্রহণ করা উচিত। Central Democratic Action Committee এর কাছে ৫ দফার মধ্যে ছিল পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং এক ইউনিটের ভাঙা। Central Action Committee আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ওপর একটি গ্রহণযোগ্য অবস্থান যদি সম্ভব হয়, তৈরি করার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে। এই কমিটি বাতিল হয়ে যায়, যেহেতু পাঞ্জাবিরা ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রচণ্ড বিরোধিতা করে। যুক্তিতর্ক প্রদর্শনের জন্য Metaphysics এবং Jurisprudence দ্বারা খণ্ডন করা হয় যে Democratic Action Committee অথবা আইয়ুবের সংসদ কোনোটিরই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে কিছু করার ম্যান্ডেট ছিল না। এই যুক্তি দিয়ে প্রতিবাদ

জানানো হয় যে Democractic Action Committee এবং সংসদের সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা থাকলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের বিষয়েও ক্ষমতা রয়েছে।

ইতিমধ্যেই আমার মধ্যে একটি ধারণা এসে যায় যে অর্থনীতিবিদদের অন্তর্ভুক্ত করে বিশেষজ্ঞ দলকে শক্তিশালী করা খুবই উপযোগী হবে। ড. আনিসুর রহমানকে, যিনি ইসলামাবাদে অর্থনীতির অধ্যাপক ছিলেন, লাহোরে দলের সাথে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। প্রফেসর ওহিদুল হক, ইসলামাবাদে অধ্যাপক ছিলেন এবং ড. মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ চৌধুরী, যিনি ঢাকা থেকে এসেছেন, তাদেরসহ তিনি পরের দিন দলে যোগদান করেন।

উপকমিটিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পর পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ মাওলানা মওদুদ, মমতাজ দৌলতানা এবং চৌধুরী মোহাম্মদ আলীসহ ৮ মার্চের সন্ধ্যায় শেখ মুজিবের কক্ষে আসেন এবং চাপ দেন যে ৬ দফা দাবি একটা গ্রহণযোগ্য চার্টার অব ডিমান্ড- এর ভিত্তিতে হবে না। শেখ মুজিব এ পয়েন্টে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন যে, তিনি এবং তার দল ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য রাজি না হলে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদান করবেন না। যখন কিছু-কিছু পাঞ্জাবি নেতা যুক্তি প্রদর্শন করেন ৬ দফা কর্মসূচি অকার্যকর, তখন শেখ মুজিব বলেন, তিনি তার সাথে কিছু বিশেষজ্ঞ নিয়ে এসেছেন, যারা যে-কোনো বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করতে পারেন। এটা এমন সময় ঘটে যে সময়ে আমাদের পাঠানো হয়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও শেখ মুজিবের কিছু বিশেষজ্ঞের মধ্যে একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। চৌধুরী মোহাম্মদ আলী একটা ধারণা প্রদান করেন যে, ইস্যু আমার জন্য খুবই জটিল এবং তাদের নিকট যথেষ্ট বিশেষজ্ঞ নেই।

একটা সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন নাছোড়বান্দা পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দের সর্বজন গ্রহণযোগ্য দাবিমালায় ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত করতে তাদের অস্বীকৃতিতে অনমনীয় ও আপসহীন শেখ মুজিবের সাথে বিরোধ সৃষ্টি হয়। শেখ মুজিব ইঙ্গিত দেন যে, ৬ দফা অন্তর্ভুক্ত করা না হলে তিনি রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদানের জন্য রাওয়ালপিন্ডি যাওয়ার পরিবর্তে পরের সকালে ঢাকায় ফিরে যাবেন। পাঠান ও বালুচ নেতৃবৃন্দ ৬ দফা দাবির অন্তর্ভুক্তি সমর্থন করেন এবং এক ইউনিট বাতিল করার ক্ষেত্রে বাঙালির সমর্থনকে স্বাগত জানান। এয়ার মার্শাল আসগর খানের সাথে ৮ মার্চের সন্ধ্যায় জোরালো আলোচনা চলছিল। পরিশেষে একটা আপসের ফরমুলা বেরিয়ে আসে, যার মাধ্যমে সামগ্রিকভাবে প্রতিটি দল তাদের নিজ-নিজ আলাদা দাবি পেশ করার জন্য কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকারী প্রত্যেক দলের উপর ছেড়ে দিয়ে সর্বনিম্ন দাবিদাওয়া পেশ করা

হবে। এভাবেই শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে তাদের দাবি পেশ করতে সক্ষম হবে। এটা শেখ মুজিবের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে যোগদানের সম্মতির ভিত্তিতে হবে।

শেখ মুজিব সড়কপথে ৯ মার্চ রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং ৬ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য দাবি জানিয়ে একটা বিবৃতি তৈরির জন্য আমাদের নির্দেশ দেন। সারা দিন খসড়া তৈরির কাজ করা হয়, যা ৯ মার্চ রাওয়ালপিন্ডিতে নেয়া হয়। এই বিবৃতিতে শেখ মুজিব federal parliamentary democracy প্রতিষ্ঠিত এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচন দাবির সমর্থনে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের জন্য পেশ করেন। এই বিবৃতিতে ৬ দফার প্রত্যেকটির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এক ইউনিট বাতিল সমর্থন করে জোর সুপারিশ করা হয় যে federal legislatre-এ এক মানুষ এক ভোট জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব হবে। দরকষাকষিতে নিয়োজিত করার জন্য আওয়ামী লীগের ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে শেখ মুজিব প্রস্তাব দেন যে, একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হবে, উক্ত কমিটি ৬ দফা ফরমুলার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন অনুমোদনের প্রস্তাবের উপর কাজ করার জন্য প্রত্যেক পক্ষ কর্তৃক মনোনীত বিশেষজ্ঞ নিয়ে গঠিত হবে। আর বিশেষজ্ঞ দল উক্ত দরকষাকষিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত। তার সাথের বিশেষজ্ঞ ছাড়াও ডঃ নূরুল ইসলাম, পাকিস্তান ইন্সটিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকনোমিকস্-এর তৎকালীন পরিচালককেও যোগদান করার জন্য প্রস্তুত রাখা হয়।

রাওয়ালপিন্ডিতে উপস্থিত হয়ে আমি দেখলাম যে মঞ্জুর কাদেরও রাওয়ালপিন্ডিতে রয়েছেন। তিনি আমার সাথে যোগাযোগ করেন এবং আমাকে জানানো হয় যে, একজন উপদেষ্টা হিসাবে আইয়ুব আমাকে রাওয়ালপিন্ডিতে থাকতে বলেছেন। যখন শেখ মুজিবের প্রস্তাব সম্বন্ধে বলা হলো যে, একটা বিশেষজ্ঞ কমিটি মারাত্মক দরকষাকষিতে কাজ করার জন্য গঠন করা উচিত হবে, তিনি এ প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়ে আশা প্রকাশ করলেন, অনুরূপ কমিটি গঠন করা হবে এবং সে ক্ষেত্রে তিনি সরকারের তরফ থেকেও অনুরূপ একটা কমিটি আশা করেন।

যেহেতু সবকিছুই সমানতালে চলছিল, পাঞ্জাবিদের কাছাকাছি নিয়ে আসার আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও তারা ৬ দফা ফরমুলা আলোচনা করতেও অস্বীকৃতি জানান। জানা যায় যে, পাঞ্জাবি বিরোধী নেতৃবৃন্দ ধারাবাহিকভাবে আইয়ুব ও তার আইনমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করছিল। সত্যি সত্যি ৬ দফা ফর্মুলার ওপর আইয়ুব

কর্তৃক আপত্তি উত্থাপনের পূর্বে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী তার উদ্বোধনী বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, সরকারের জন্য Democratic Action Committee এর দাবিতে প্রতিনিধিত্বের সমতার ভিত্তিতে বা এক ইউনিট বাতিলের ভিত্তিতে পরিবর্তন বিবেচনা করা হয়নি। তিনি আরো বললেন, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স এসব প্রশ্ন আলোচনা করার জন্য উপযুক্ত নয়।

ড. নূরুল হুদা, তৎকালীন প্রাদেশিক অর্থ মন্ত্রী, আইয়ুবের দলের সদস্য ছিলেন। তিনি যাহোক, আওয়ামী লীগের উপদেষ্টার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং সরকারি ক্যাম্পে কি হচ্ছে তার কিছু ভিতরের রিপোর্ট দিতেন। তার ধারণা অনুসারে বাজপাখিদের মধ্যেই মতের উল্লেখযোগ্য অমিল রয়েছে। তারা স্বায়ত্তশাসন বা এক ইউনিট বাতিলের দাবিতে কোনো কিছুর সাথে একমত হতে রাজি নন এবং এমনকি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনেরও বিরোধী। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আলোচনা করার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের সমর্থন যোগায়। জাফর এবং এডমিরাল এ. আরকে বাজপাখি আখ্যায়িত করা হয়েছে। দোহা তাদের সমর্থন করেন। রিপোর্ট হয় যে, মঞ্জুর কাদের হুদার মতো কমিটি গঠনে সমর্থন দান করেছিলেন।

আমিও মঞ্জুর কাদেরের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিলাম। আমি যখন ১১ মার্চে তার সাথে দেখা করি, মঞ্জুর কাদের রিপোর্ট করেন যে, তিনি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন সমর্থন করেন। তিনি তারপর উল্লেখ করেন যে, তিনি ৬ দফা ফর্মুলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখছেন এবং ২টি ভিন্ন মুদ্রার বিষয়ে অসুবিধা দেখেন। যখন বলা হলো যে কনফারেন্সে উপস্থাপিত স্টেটমেন্টে federal reserve system-এর মাধ্যমেই একক মুদ্রার বিকল্প প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে, তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেন। যেহেতু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে যে Transcript টি তিনি পান, তাতে এই বিকল্প প্রস্তাবের উল্লেখ নেই। আমি তাকে অবহিত করলাম যে, শেখ মুজিব লিখিত স্টেটমেন্ট দিয়েছেন এবং অনুলিপি বিতরণ করা হয়েছে এবং Transcription এ বড় ধরনের ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। তিনি হতাশা প্রকাশ করেন এবং অনুরোধ করেন যে শেখ মুজিবের স্টেটমেন্টের একটি অনুলিপি তাকে যাতে দেয়া হয়। স্টেটমেন্টটি তাকে দেয়া হয়। ১১ মার্চের রিপোর্ট ছিল যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ইস্যু ও বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের ওপর জোরালো আলোচনার জন্য সরকার ঝুঁকে যাচ্ছে বলা হয়। আইউব ১২ মার্চ তার উদ্বোধনী স্টেটমেন্ট দেবেন বলে আশা করা হচ্ছিল।

সার সংক্ষেপের কোনো কিছু ১২ই মার্চে ঘটেনি, কেননা ঐ দিনকে এডমিরাল এ আর খান এবং এয়ার মার্শাল আসগর খানের মধ্যে প্রলম্বিত ঝগড়া

বিবাদের দিন মনে করা হয়।

১২ মার্চের সন্ধ্যায় ডঃ হুদা ও অন্যদের দ্বারা প্রচারিত রিপোর্ট আরম্ভ হয় যে বাজপাখিগুলো উপরের হাতকে লাভবান করতে শুরু করছে। পরবর্তীতে নিশ্চিত হওয়া যায়, ১২ মার্চের রাতে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্বায়ত্তশাসন বিরোধী গোষ্ঠী অর্থাৎ পাঞ্জাবি বিরোধী নেতৃবৃন্দ এমনকি সরকার পক্ষে বাজপাখি একত্রে মিলিত হন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা এক ইউনিট বাতিলের প্রদত্ত ছাড়ে বাধা দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৩ মার্চ আইয়ুবকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ঐ তারিখে আইয়ুব একটা স্টেটমেন্ট পড়ে শোনান। উক্ত স্টেটমেন্টে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, তিনি বাজপাখিদের চাপে রয়েছেন। একজন কর্মকর্তা, যিনি এসব দরকষাকষিতে জড়িত ছিলেন, তার বক্তব্য অনুসারে আইয়ুবের আর খুব কমই স্বাধীনতা ছিল। কেননা ইয়াহিয়া ও সৈন্যবাহিনী এর মধ্যে ক্ষমতা গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিল এবং দৃশ্যের পিছন থেকে দরকষাকষিতে নির্দেশ দিচ্ছিল। কেননা প্রকৃত শক্তি হিসাবে সৈন্যবাহিনরি উত্থান স্বীকৃত। ১২ মার্চ ইয়াহিয়াকে ৬ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে বাঙালিদের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের গুরুত্ব তুলে ধরেন। ইয়াহিয়া একটা সঙ্গতিপূর্ণ মনোভাব পোষণ করেছেন এবং কৌশলে ইঙ্গিত দেন যে, আইয়ুব এবং মোনায়েম খান ৬ দফা দাবি রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার চেয়ে অস্ত্রের ভাষায় মোকাবিলা করতে গিয়ে ভুল করেছেন।

অতীত প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক অঙ্গনে ইয়াহিয়ার প্রবেশের জন্য ইয়াহিয়ার প্রস্তুতির অংশ হিসাবে এই সভাকে দেখা যেতে পারে। যখন তিনি আপাতভাবে আশা প্রকাশ করেন যে, কনফারেন্সে দরকষাকষি অবশ্যই সফল হবে, তখন তিনি চান তারা ব্যর্থ হোক এবং তাদের ব্যর্থতা নিশ্চিত করতে সৈন্যবাহিনীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন। এ রকম ব্যর্থতা হচ্ছে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি।

একতরফা পুরস্কার ঘোষণার জন্য আইয়ুব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। যে স্টেটমেন্টে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ও পাঞ্জাবি নেতাদের যুক্তিতর্ক অন্তর্ভুক্ত সেই স্টেটমেন্টে তিনি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন বা এক ইউনিটের বাতিল দাবিতে সাড়া দিতে অস্বীকার করেন। তিনি ঘোষণা দেন যে, সরকার federal parliamentary form of government এবং সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটের ভিত্তিতে সরাসরি নির্বাচনের জন্য ১৯৬২ সালের সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিটের প্রশ্নে কাজ করতে আইয়ুবের অক্ষমতা রয়েছে। কারণ কিছু-কিছু মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো কেবল নির্ধারিত

প্রতিনিধি কর্তৃক বিবেচিত হতে পারে। পরবর্তী ঘটনা প্রমাণ করার জন্য গৃহীত অবস্থান ছিল সম্পূর্ণ কৌশলগত। কেননা যখন ২১ মাস পরে নির্বাচিত প্রতিনিধির একটি কাঠামো চূড়ান্তভাবে গঠিত হয়। একই পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ অবস্থান গ্রহণ করে যে, ঐ সব প্রশ্ন এতই মৌলিক যে সেগুলো উক্ত কাঠামো দ্বারা সম্পাদন করতে হবে এবং রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের বাইরে সেগুলোর উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। আইয়ুব তার প্রস্তাব পাঠ করার সাথে সাথেই পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ এমনকি Democratic Action Committee-র সদস্যরাও আইয়ুবকে অভিনন্দন জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কেননা এটা তখন খুবই স্পষ্ট ছিল যে, স্বায়ত্তশাসন বিরোধী শক্তি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উপর দরকষাকষির দরজা বন্ধ করতে সফলকাম হয়েছে। শেখ মুজিব প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। কনফারেন্স হল থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিব গৃহীতব্য কর্মপন্থার ধারার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জন্য তার উর্ধ্বতন সহকর্মীদের নিয়ে আলোচনায় বসেন। ৩টার সময় একটা প্রেস কনফারেন্স আহ্বান করা হয়। প্রেসের জন্য একটা স্টেটমেন্ট প্রস্তুত করার জন্য আমাকে বলা হয়। প্রধান প্রধান বিষয় ছিল প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান, 'ডাক' থেকে প্রত্যাহার এবং আন্দোলনের জন্য অগ্রসর হওয়া। পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তেজনাকর। মঞ্জুর কাদের আমাকে জানালেন যে এখনো প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে, যদি দরকষাকষি আরম্ভ হয়। আকাশে বাতাসে সর্বত্রই গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে সৈন্যবাহিনী ক্ষমতা দখলের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। প্রেস কনফারেন্সে শেখ মুজিব 'ডাক' থেকে আওয়ামী লীগের প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন এবং আরো ঘোষণা দেন যে, গণআন্দোলন চলতে থাকবে। ঐ দিন সন্ধ্যায় Democratic Action Committee বাতিল ঘোষণা করা হয়। যেহেতু শেখ মুজিব প্রতিক্রিয়া জানার জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন, তাই তিনি ঢাকায় টেলিফোন করেন এবং আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আইউবের পুরস্কার প্রত্যাখ্যানকে সমর্থন করে। বাঙালিদের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত।

আইয়ুব বুঝতে পারেন যে, অন্যান্য বাঙালি নেতার মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ক্ষমতা খুব কমই। কনফারেন্স ভেঙে যাওয়ার অনেক পরে তিনি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেন এবং এ কারণে ৬ দফা দাবি গ্রহণ করতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করেন যে এটাকে কার্যকর করতে সাংবিধানিক সংশোধন করতে জাতীয় সংসদে জোরালো সমর্থন পাবেন না। শেখ মুজিব এর বিপরীতে যুক্তি দেখান যে বাঙালিদের মনোভাবের প্রতি দৃষ্টি রেখে যদি অনুরূপ সংশোধনী আনা হয়, তবে আশা করা যায়, সব বাঙালি সদস্য সেগুলো সমর্থন জানাবে। আইয়ুব তারপর তার যুক্তি থেকে সরে আসেন এবং বললেন যে, সেই

সংশোধনী বাস্তবায়ন করতে অনেক সময় লাগবে। শেখ মুজিব তাকে নিশ্চয়তা দেন খসড়া সংশোধনী ৩ সপ্তাহের মধ্যেই প্রণয়ন করা হবে।

শেখ মুজিব উক্ত সভা থেকে ফিরে আসার পরপরই তার উপদেষ্টা দলকে ডাকেন এবং যত সম্ভব দ্রুত এসব সংশোধনী উপস্থাপন করার জন্য তাদের নির্দেশ দেন। ঢাকায় এসে কার্যকরী দল ১৯৬২ সালের সংবিধানের সংশোধনীসমূহ ৩ সপ্তাহের মধ্যে একত্রে উপস্থাপনের জন্য রাতদিন পরিশ্রম করে, যাতে ৬ দফা ফরমুলা এবং এক ইউনিটের বাতিল কার্যকর করা হতে পারে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, আওয়ামী লীগ সদস্যরা জাতীয় সংসদে সংবিধান সংশোধনী বিল আনবেন। কামরুজ্জামান তাকে সাথে করে নিয়ে অনুলিপি রাওয়ালপিন্ডি ২২ মার্চে আইউবকে প্রদান করেন। জাতীয় সংসদে এসব সংশোধনী আলোচিত হওয়ার পূর্বে আইয়ুরের নিকট থেকে সাড়া ছিল দেশের বিভাজনে তার ইচ্ছা প্রদান করে এড়িয়ে যাওয়া। ইয়াহিয়া খান, যিনি আইয়ুবকে বাদ দেয়ার জন্য উভয় অংশে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন, নেমে আসেন। ১৯৬২ সালের সংবিধান বাতিল করা হয়, জাতীয় সংসদ ভেঙে দেয়া হয় এবং সামরিক শাসন জারি করা হয়।

ইয়াহিয়ার উপর পাওয়ার স্ট্রাকচার সংরক্ষণের দায়িত্ব পড়ে, যার ফলে গণআন্দোলন হুমকির মুখে পড়ে। সামরিক শাসন জারি করে তিনি সবকিছু বাগে আনতে সক্ষম হন। তার প্রথম বক্তৃতায় তিনি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য প্রতিশ্রুতি দেন। এর কিছু পরে তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা আরম্ভ করেন। শেখ মুজিব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত Constituent Assembly এর প্রস্তাব পেশ করেন যাতে একমাত্র পথ এবং সংবিধান প্রণয়নের জন্য বাঙালিদের নিকট গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

কোন ভিত্তি উপর জনগণ একত্রে বসবাস করবে তার উপর সম্মতি জ্ঞাপন করে পাকিস্তানের Constituent Units ছাড়াই ২২ বছর কেটে যায়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ Constituent সংসদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করেছে। ১৯৫৪ সালে অক্টোবর মাসে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপে এই সংসদ ভেঙে দেয়া হয়। ১৯৫৬ সংবিধান এমন পরিস্থিতিতে গৃহীত হয় যে পরিস্থিতিতে নির্বাহী বিভাগে এর প্রতিনিধিত্বমূলক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রশ্নে ওঠে। কিছুটা সন্দেহও ছিল, এক ইউনিট ও বিশেষ করে পশ্চিম ও পূর্বের মধ্যে ক্ষমতা এমনকি কেন্দ্র ও অঞ্চলের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগি সামরিক শাসনের হুমকি দিয়ে উক্ত নির্বাহী পরিষদের উপর কার্যত আরোপ করা যাবে কিনা। ১৯৬২ সংবিধান রাষ্ট্রপতির ঘোষণার দ্বারা জারি

করা হয়। জনসংখ্যার ভিত্তিতে গঠিত নির্বাচিত Constituent সংসদের জন্য দাবির মধ্যে অন্যতম ছিল United Front এর ২১ দফা নির্বাচন ইশ্‌তেহারের একটি বিষয়। উক্ত ইশ্‌তেহারের জন্য ১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলায় নির্বাচনে জয়লাভ করেন। এখন এই মৌলিক ইস্যু যথা পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে একত্রে বসবাসের জন্য ভিত্তি জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি কর্তৃক নির্ধারণ করা হবে। এখন আর সুকৌশলে এড়ানো যাবে না। পাঞ্জাবি আর্মির পাকিস্তান শাসন করার কোনো বৈধ ভিত্তি নেই। কিন্তু প্রকৃতই বিড়ম্বনাহীন নয়, পাকিস্তান সুপ্রিমকোর্ট ১৯৭২ সালে কিছুদিন শাসনকার্য পরিচালনা করে। ইয়াহিয়া ছিলেন একজন জবরদখলকারী এবং ক্ষমতার এই ধারণাটি ছিল অসাংবিধানিক।

পাঞ্জাবি নেতৃবৃন্দ যারা আইয়ুবের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু সংশোধনীসহ যেগুলো রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কনফারেন্সে আলোচিত হবে বলে ধারণা করতেন, ১৯৫৬ সংবিধান প্রবর্তনের জন্য চাপ দিতে শুরু করে দেয়। অন্যেরা পাঞ্জাবিদের জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দাবি জানাতে শুরু করে। পাঠান, বালুচ ও সিন্ধিদের একটা বিরাট অংশ তৎক্ষণাৎ এক ইউনিট বাতিলের জন্য চাপ দিতে থাকে।

ইয়াহিয়া বুঝতে পারেন যে বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য উলঙ্গ সামরিক শাসন চালানো যাবে না। তিনি তার শাসনকে বৈধ করা ও উভয় অংশে চাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু ভিত্তি খুঁজছিলেন। তার কঠিন চ্যালেঞ্জ পূর্ব অংশেই বিরাজ করছিল, যেখানে একজন নেতার পিছনে গোটা জনগোষ্ঠী ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। শেখ মুজিব স্পষ্ট করে বলেন যে, ১৯৫৬ সংবিধান বাঙালি জনগণের কাছে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, এখন যে সংবিধানই হোক না কেন, তা হবে ঘোষণা জারির মাধ্যমে। বাঙালির মতামত জনগণের সরাসরি নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত Constituant সংসদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান দ্বারাই নিশ্চিত করা হবে। পাঞ্জাবি অভিজাত শ্রেণী নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে হুমকি পেয়ে তাদের স্বার্থ নিশ্চিত করার জন্য সৈন্যবাহিনীর দিকে ঝুঁকতে থাকে। এই অবস্থার মুখাপেক্ষী হয়ে ইয়াহিয়া কিছু ছাড় দিতে রাজি হন। ১৯৬৯ সালের ২৮ নভেম্বর তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি গণপরিষদ গঠনের জন্য একটা আইনগত কাঠামো, এক ব্যক্তি এক ভোট, যা জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের নীতি সঠিক বলে স্বীকার করা হবে। ৩১৩ আসনের সংসদে পূর্ব অংশে ১৬৯টি আসন দিতে হবে। তিনি এক ইউনিট ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেন। এক ইউনিটের ওপর ছাড় স্পষ্টতই পশ্চিম অংশে প্রধান বিভাগযোগ্য ইস্যুকে লক্ষ্য করেই ছিল। এভাবেই সংসদে বাঙালি শক্তির সাথে যোগ দিয়ে সিন্ধু এন, ডব্লু, এফ, পি এবং

বেলুচিস্তানে এক ইউনিট বিরোধী শক্তির সম্ভাবনাকে ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে এটা করা হয়। সংবিধান অনুমোদন করে বাঙালি প্রতিনিধিদের একীভূত গোষ্ঠী সংগঠন, যাতে ৬ দফা ফর্মুলার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য অন্তর্ভুক্ত।

কোনো সন্দেহে নেই যে ইয়াহিয়ার কাছে এটা একটা বিরাট বিষয়ের উৎস হিসাবে থেকে যায়। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে, যা ১৯৭০ সালের ২৮ মার্চে প্রণয়ন করা হয়, কিছু-কিছু সাধারণ বিধানে এসব উৎকণ্ঠা প্রতিফলিত হয় এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারের স্বার্থের জিম্মাদার হিসাবে সৈন্যবাহিনীর ভূমিকার পুনঃ নিশ্চয়তার সাক্ষ্য বহন করে। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের অনুচ্ছেদ ২০-এ অন্তর্ভুক্ত আছে, সংবিধান এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে পাঁচটি মৌলিক নীতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ৪র্থ নীতি নিম্নরূপভাবে প্রণীত হয় :

বিচার, প্রশাসন ও অর্থসহ যাবতীয় ক্ষমতা ফেডারেল সরকার ও প্রদেশের মধ্যে এমনভাবে ভাগ করে দেয়া হবে এবং প্রদেশের নিকট সর্বোচ্চ স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ আইন, প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু বহিঃ ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে দায়িত্ব পালন এবং দেশের স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ক প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে।

অনুচ্ছেদ ২৫-এ বলা হয় যে, সংবিধান বিল অনুমোদনের জন্য রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপন করতে হবে। এতে আরো বলা হয় যে, সংসদ বাতিল বলে গণ্য হবে যদি রাষ্ট্রপতি অনুমোদন প্রদান না করেন।

এই ধারাটিকে সার্বভৌম Constituent Assembly তে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক গৃহীত Veto সিদ্ধান্তের ক্ষমতাসহ পাঞ্জাবি সংখ্যালঘু ও সৈন্যবাহিনীকে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যবহার হিসাবে বাঙালিরা দেখে থাকে। শেখ মুজিব তখনই ঘোষণা দিলেন যে তিনি এক ব্যক্তি এক ভোটের ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে একটি Constituent Assembly গঠনকে স্বাগত জানান। তার দৃষ্টিতে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান সার্বভৌম হবে এবং অনুচ্ছেদ যেমন ২০ ও ২৫ দ্বারা সংবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা বলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। তিনি এসব বিধান বাতিলের আহ্বান জানান এবং উল্লেখ করেন, যে-কোনো ক্ষেত্রে জনগণের সার্বভৌমত্বের উপর এইরূপ বাধানিষেধ অবৈধ ও বাতিল।

নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য ইয়াহিয়া প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি কিছু নির্দিষ্ট সতর্ক হিসাব করেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, এক ইউনিট ভাঙার সিদ্ধান্ত ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের বাঙালিদের দাবির বিরোধিতায় পশ্চিম অংশের প্রতিনিধিদের একত্রিত করার লক্ষ্যেই নেয়া হয়। তিনি আরো বললেন, যদি সংসদ ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে পারে তবে এটাকে পাঁচ

বছরের জন্য জাতীয় আইন পরিষদে রূপান্তর করা হবে, যদি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটা সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হয়, তবে তা ভেঙে দেয়া হবে। সংখ্যালঘু শাসকগোষ্ঠী যতটুকু প্রয়োজন মনে করে ঠিক ততটুকু স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সমঝোতায় আসার সদস্যদের জোরালো উদ্দীপনা-উৎসাহ্ আশা করা হচ্ছিল। যদি এই সমঝোতা না আসে, রাষ্ট্রপতি অনুমোদন দিতে অস্বীকৃতি জানাতে পারেন। তাছাড়াও ইয়াহিয়া হিসাব করে দেখলেন পশ্চিম অংশে কোনো দলই সুস্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। অন্য কথায় বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতা ধ্বংস হয়ে পড়বে। পঞ্চাশ দশকে শাসক সংখ্যালঘু দ্বারা কার্যকরভাবে ব্যবহৃত কৌশল ছিল এটা এবং ইয়াহিয়া উৎসাহ বোধ করতেন যে এটা সমানভাবে তাকে সাহায্য করবে। প্রৌঢ় বাঙালি রাজনীতিবিদ যেমন-হামিদুল হক চৌধুরীর রিপোর্টে বলা হয়, আওয়ামী লীগ জোরালো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না, এতেও তিনি উৎসাহ বোধ করতেন।

পূর্ব নির্বাচনী প্রচারণা চলার সাথে সাথে এটা আরো স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আওয়ামী লীগ সার্বজনীন সমর্থন নিয়ে আবির্ভূত হচ্ছে মনে হয়। অন্যান্য দল অনুমান করতে আরম্ভ করে দিয়েছে যে একটা পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে, যা আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা এনে দেবে। অতএব, তারা নির্বাচন স্থগিতের জোর প্রচেষ্টা চালাতে আরম্ভ করে দেন।

আগস্টের দিকে বন্যার আগমনে নির্বাচনের তারিখ, যা ৫ অক্টোবর, ১৯৭০ নির্ধারিত মুলতবির চাপ প্রয়োগে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ একটি সুযোগ পেয়ে যায়। তারা উপলব্ধি করেন যে নির্বাচন স্থগিতের কিছু অজুহাত খাড়া করার সুযোগ তাদের এনে দেবে। স্থগিত আদেশ আদায়ে তাদের প্রচেষ্টা সফল হয়। নির্বাচনের তারিখ ৩ অক্টোবর থেকে ৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ পরিবর্তন করা হয়। নির্বাচন স্থগিত করা আওয়ামী লীগের অনুকূলেই কাজ করে। এতে বাংলাদেশের সর্বত্রই ব্যাপক যোগাযোগ ও ব্যক্তিগতভাবে নেতাদের জনগণের কাছে পৌছার সুযোগ সৃটি হয়। সময়ে একটা ঘটনা ঘটে গেল, যার জনগণ এবং বিশেষ করে নির্বাচনের ফলাফলের উপর একটা প্রভাব ছিল। যা ছিল ১৯৭০ সালের নভেম্বরের ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস, বাংলাদেশের সমুদ্রবর্তী এলাকা তলিয়ে দেয়।

ধ্বংসের ভয়াবহতা ও দুর্যোগে প্রাণহানির সংখ্যা বিশ্বব্যাপী সব খবরের কাগজে ছাপা হয়। ইয়াহিয়া এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদর্শিত নিষ্ক্রিয়তা দেশে ও দেশের বাইরে পরিলক্ষিত হয়। ঘূর্ণিঝড়ের পরেই চীন থেকে ফেরার পথে ইয়াহিয়া ঢাকায় যাত্রাবিরতি করেন। কিন্তু অবস্থান করেন নি। সরকারের ত্রাণ কার্যক্রম খুব মন্থর ও অপর্যাপ্ত ছিল। এতে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে এই

অবস্থা মোকাবিলায় সরকারের দুর্বলতার কথা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।

অন্যান্য দলগুলোও নির্বাচন মুলতবি ধ্বনি পুনরায় উত্থাপন করে। আওয়ামী লীগ তার সম্ভাব্য জোরালো ভাষায় নির্বাচন স্থগিতের বিরোধিতা করে। সত্যি সত্যিই শেখ মুজিব ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধা প্রদান ষড়যন্ত্র হিসাবে প্রচার করেন এবং সতর্ক করে দেন যে জনগণ এটাকে প্রতিহত করবে। তিনি উল্লেখ করেন, লক্ষ লক্ষ লোক জীবন দিয়েছে এবং প্রয়োজন হলে বাঙালিরা ষড়যন্ত্র বানচাল করতে ও ক্ষমতা দখল করতে আরো লাখ লাখ প্রাণ দিয়ে জনগণ তাদের ভাগ্য গড়ে নেবে। এই পরিস্থিতির মুখে ইয়াহিয়া নির্বাচন মুলতবি রাখা থেকে ফিরে আসেন। কেবল ঘূর্ণিঝড়ে বিধ্বস্ত এলাকা (১৭টি আসন) নির্বাচন বন্ধ থাকবে। অন্যান্য জায়গায় ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরের মূল তফশিল অনুসারে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

৩১৫ আসনবিশিষ্ট সংসদে পূর্ব অংশে ১৬৯ আসনের ১৬৭-তে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়। শেখ মুজিব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পান। সিদ্ধান্তমূলক নির্বাচনী ফলাফল শেখ মুজিব, আওয়ামী লীগ এবং তার ৬ দফা কর্মসূচির প্রতি সুস্পষ্ট রায়। এই ফলাফল ইয়াহিয়ার পুরো কৌশলকে একটা শোচনীয় বিশৃঙ্খলায় ফেলে দেয়। তিনি স্বভাবতই পূর্ব অংশে খণ্ডিত প্রতিনিধিত্বের উপর ভরসা রাখলেন যাতে করে তিনি তার কৌশল কাজে লাগাতে পারেন। তিনি এখন নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুখোমুখি। এভাবে তিনি দেখতে পেলেন যে তার হাত থেকে সব উদ্যোগ সরে গেছে এবং কৌশলে কাজে লাগাবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। তিনি পূর্ব অংশ থেকে একটা খণ্ডিত প্রতিনিধিত্বের উপর হিসাব-নিকাশ করেন। সত্যি সত্যিই তিনি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মুখোমুখি।

পশ্চিম অংশে নির্বাচনের ভোটে কেবল পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ১৩১ আসনের ৮৩টি আসনে জয়লাভ করেন ভুট্টো। এই ফলাফলে ভুট্টোর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ছিল প্রকাশযোগ্য। নির্বাচন উপলক্ষে তার সর্বপ্রথম বিবৃতি ছিল, পিপলস্ পার্টির সম্মতি ব্যতীত কোনো সংবিধান প্রণয়ন করা যাবে না। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, সিন্ধু ও পাঞ্জাব হচ্ছে ক্ষমতার প্রতিরক্ষা দুর্গ। এরপর এই বিবৃতি দেয়া হয় যে শুধু সংখ্যাগরিষ্ঠতাই জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে না। এটা স্পষ্ট যে জাতীয় সংসদে বাঙালিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সংযত রাখার একমাত্র পথ হচ্ছে সংসদের বাইরে এর বিরোধিতা করা। সেখানে তিনি একটা উৎস থেকে তার শক্তি যোগানের যার উপর সংখ্যালঘু সরকার বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে কাজ করতে সব সময় বিপদগ্রস্ত হবে। এটা ছিল একই

প্যাটার্ন যা পাকিস্তানকে ২৪ বছর ধরে বিকশিত করেছে। আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে, তারা ভোটারের দাবি মতে, ভোটার সাথে একমত নন। এই পর্যায়ে ইয়াহিয়া আপাতত একটি নিবারণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষা করেন। প্রতীয়মান হতে পারে যে ডিসেম্বরের শেষের দিকে অবস্থা দাঁড়াবে, ইয়াহিয়া ৬ দফা ফরমুলা সংশোধনের জন্য চাপ প্রয়োগের জন্য আওয়ামী লীগের সাথে দরকষাকষি করতে তার নিজের নিরপেক্ষ ও প্রাথমিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবেন, যাতে করে শাসক অভিজাত শ্রেণী এবং সৈন্যবাহিনীর স্বার্থ নিশ্চিত করা যায়। যদি তিনি সফল হন, তবে তিনি সম্ভবত পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদরে সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়বেন এবং ভুট্টো সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবেন।

যখন ইয়াহিয়ার মধ্যে এসব চিন্তা-চেতনা নাড়া দিচ্ছিল, ভুট্টো, প্রতীয়মান হয়, জেনারেলদের একটা অংশের সাথে ব্যস্ত ছিলেন। ইয়াহিয়ার একজন উপদেষ্টা কর্তৃক প্রকাশিত একটি বিবৃতি অনুসারে ভুট্টোর একজন গুরুত্বপূর্ণ মিত্র, জেনারেল পীরজাদা, রাষ্ট্রপতির প্রিন্সিপাল অফিসার ছিলেন। প্রতীয়মান হয়, জেনারেল গুল হাসান এবং কিছু অফিসার, যারা ভুট্টোর ক্ষমতা গ্রহণের পরে ১৯৭১ সালের শেষে শুদ্ধিকরণ টিকিয়ে রাখেন, এই দলের অংশ ছিল। এ গুরুত্বসহকারে মূল্যায়ন করা হয়, যিনি ঢাকায় 'গর্ভনমেন্ট হাউসে ব্যয়বহুল ডিনারের পর ঘোষণা করেন, 'ভয় পাবেন না-আমরা এই কালো বেজন্মাদের আমাদের শাসন করতে দেব না।'

জানুয়ারির মাঝামাঝিতে ইয়াহিয়া ঢাকায় আসেন। ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের মধ্যে একটি প্রাথমিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মনে হয় যে ইয়াহিয়া একটা নিবারণমূলক ভাবভঙ্গি রক্ষা করছেন, কিন্তু ৬ দফা কর্মসূচি সম্বন্ধে কোনো ব্যাখ্যা চাননি। স্পষ্টত এটা ছিল তিনি কিভাবে ৬ দফার সারবস্তুর উপর দরকষাকষি আরম্ভ করবেন।

ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা রেকর্ড করেন যে ৬ দফার প্রভাবের ওপর ইসলামাবাদে বিস্তারিত কাজ করা হয়েছে এবং এমনকি একটা খসড়া সংবিধান ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে প্রস্তুত করা হয়। অতএব, ব্যাখ্যার জন্য অনুরোধ প্রকৃতপক্ষে ছিল ৬ দফার সারবস্তুর ওপর দরকষাকষি করার বিনয় আমন্ত্রণ। শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ এ ধরনের দরকষাকষিতে প্রবেশ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না। জুনে নির্বাচনকে শেখ মুজিব কর্তৃক ৬ দফার ওপর একটা রেফারেন্ডাম ঘোষিত হয়। জনপ্রিয় রায় ছিল সিদ্ধান্তমূলক। শেখ মুজিব ঘোষণা দেন যে ৬ দফা এখন জনগণের সম্পত্তি নয় এবং ৬ দফার সারবস্তুর উপর সমঝোতায় আসা কর্তৃত্ব তার নেই। জানুয়ারির প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত বিরাট জনসভায় এ অবস্থা ঘোষণা করা

হয়, জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে সব আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সদস্য ৬ দফার আপস না করার শপথ নেন। শেখ মুজিব তার সিনিয়র সহকর্মী সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহ্‌মেদ, মনসুর আলী, খন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদ এবং এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামানসহ ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করে। তার ৬ দফা কর্মসূচির ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তারা ইয়াহিয়াকে নিশ্চয়তা প্রদান করতে চাইলেন, ৬ দফা কর্মসূচি কার্যকর এবং এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে কেন্দ্রের নিকট ছেড়ে দেয়া সীমিত ক্ষমতা ও কার্যাবলী সাংবিধানিক বিধানের ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় প্রয়োগ করা হবে। ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে সাংবিধানিক বিধানে নিশ্চয়তা প্রদান করা থাকবে যে কেন্দ্রের প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব কেন্দ্রের নিকট ন্যস্ত থাকবে, যা অঞ্চলের দয়ার উপর নির্ভর করবে না।

এই সভার পর ৬ দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করার জন্য আলাদাভাবে পীরজাদার সাথে দেখা করার জন্য শেখ মুজিব আমাকে বললেন। এই সভায় এটা স্পষ্ট ছিল যে, প্রধান উৎকণ্ঠা ছিল কেন্দ্রের বৈদেশিক মুদ্রা ও রাজস্ব সম্পদ নিয়ে। অঞ্চল কর্তৃক বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুদানের নিয়ন্ত্রণ নিয়েও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে সাংবিধানিক ধারায় উল্লেখ থাকে যে সংগৃহীত রাজস্ব ও বৈদেশিক মুদ্রার একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে। বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের ব্যাপারে ব্যাখ্যা দেয়া হয় যে দেশের বিদেশনীতির আওতায় অঞ্চল কর্তৃক বিষয়ের উপর দরকষাকষি বিবেচিত হবে। আরো উল্লেখ করা হয় যে-কোনো বিবাদ সৃষ্টি হবে না, কেননা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে থাকবে। পীরজাদা প্রতিশ্রুতিহীন অবস্থা রক্ষা করে চলেন, কিন্তু গুরুত্ব সহকারে বলে যেতে থাকেন যে ইয়াহিয়াকেও তার সাথে পশ্চিম পাকিস্তান শাসন করতে হবে এবং অতএব ভুট্টোর সাথে একটা চুক্তিতে পৌছানো আওয়ামী লীগের উচিত হবে। তিনি বললেন এক সংবিধান যা আওয়ামী লীগ এমনকি পিপলস্ পার্টিকে সমর্থন করে, সংসদের মধ্য দিয়ে যাত্রা করবে এবং ক্ষমতা হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করবে। পীরজাদার পার্টির মন্তব্য থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ভুট্টো, পীরজাদা, সৈন্যবাহিনী কমপক্ষে একটা শাখা চুক্তির মধ্যে ছিলেন।

উল্লেখযোগ্য যে ঢাকা থেকে ইয়াহিয়া সরাসরি লারকানার উদ্দেশে যাত্রা করেন। যদিও এটাকে "শুটিং ট্রিপ" হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। কয়েক জন জেনারেল শাসক জান্তার একটা অংশ লারকানা উড়ে গেলেন এবং একটা গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয় ভুট্টোর বিয়োগান্তক নাটক ভুট্টো কর্তৃক সত্য বলে প্রকাশ করা হয়। অল্প সন্দেহ ছিল যে বিয়োগান্তক নাটক প্রকাশিত হচ্ছিল,

কিভাবে নির্বাচনে অর্জিত বাঙালি সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। ঘোষণা দেয়া হলো যে, খুব শীঘ্রই ভুট্টো ঢাকা সফর করবেন। অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ ঢাকায় আসতে আরম্ভ করেছেন-নবাব আকবর খান বাসতি, মাওলানা নুরানী এবং সরদার শওকত হায়াত খান।

ভুট্টো ২৭ জানুয়ারি ঢাকা আসেন। আওয়ামী লীগ দল ও জে রহিম, শেখ আবদুর রশিদ, হানিফ রামায়, আবদুল হাফিজ পীরজাদা এবং রফি রাজাকে নিয়ে গঠিত পিপলস্ পার্টির মধ্যে পৃথক সমান্তরাল সভা চলাকালীন সময়ে শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে কয়েক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ দলে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহ্মেদ, মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহ্মেদ, এ, এইচ, এম, কামরুজ্জামান ও আমি। দুদলের মধ্যে আলোচনায় আওয়ামী লীগের সদস্যদের মাথায় একটা চিন্তা আসল যে ৬ দফার ফর্মুলার সারবস্তুর ওপর আলোচনা নিবদ্ধিত থাকবে। আওয়ামী লীগ ৬ দফার বিরুদ্ধে তাদের আপত্তি বর্ণনা করতে পিপলস্ পার্টিকে আহ্বান জানায়। তাদেরকে নিশ্চয়তা দেয়া হয় যে ৬ দফায় কোনো ভুলক্রুটি থাকলে তা দূর করার জন্য প্রত্যেকটি দফার উপর বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হবে। রহিমের নেতৃত্বাধীন পিপলস্ পার্টি নির্দিষ্ট ইস্যু উত্থাপনের পরিবর্তে 'সোস্যালিজম'-এর অর্থ সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করে দেন। 'সোস্যালিজম' প্রতিষ্ঠার জন্য একটা শক্তিশালী কেন্দ্রের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নে শক্তিশালী কেন্দ্রের উল্লেখ করেন। আওয়ামী লীগ সদস্যগণ তার কাছে উল্লেখ করেন যে এইরূপ তুলনা অপ্রাসঙ্গিক। পরিবর্তে ৬ দফা কর্মসূচির দিকে টেনে আনতে চেষ্টা করেন। এই সভার স্মরণীয় বিষয় এই যে ৬ দফা কর্মসূচি কর্তৃক উত্থাপিত নির্দিষ্ট ইস্যুর উপর আলোচনায় নিয়োজিত করতে একগুঁয়েমি প্রকাশ পায়। কোনো বিকল্প সাংবিধানিক কর্মসূচি উপস্থাপিত হয়নি। আলোচনা ছিল সম্পূর্ণ অবারিত ও বাস্তব কোনো যোগাযোগ ছিল না। আমি হাফিজ পীরজাদাকে ভর্ৎসনা করি যে একজন আইনজীবী হিসাবে তার আলোচনা গঠনমূলক হওয়া উচিত। দফাওয়ারী আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তিনি তার সহকর্মীদের সুপারিশ করেন এবং বিশেষ করে তাদের আপত্তির উল্লেখ করতে বললেন, যাতে করে নির্দিষ্ট করে উত্তর দেয়া যায়। তিনি একটা কৌতুকপূর্ণ মন্তব্য করে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, রহিম একজন বৃদ্ধ মানুষ যাকে আনুকূল্য প্রকাশ করতে হবে, এবং তিনি ফেব্রুয়ারিতে দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য ঢাকা আসবেন, তখন সম্পূর্ণ আলোচনার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন। শেখ মুজিব তার সহকর্মীদের অনুরোধ করেছেন যদি তিনি প্রধানমন্ত্রী হন, তিনি রাষ্ট্রপতি হবেন

কিনা এবং অন্যান্য মন্ত্রিত্বের তিনি নিশ্চয়তা দিবেন কিনা এবং তারা কোয়ালিশন গঠন করবেন কিনা।

জানুয়ারির আলোচনার উপসংহারে ভুট্টো এই বলে ঢাকায় একটা সংবাদ সম্মেলনে ভাষণ দেন 'আমাদের প্রকৃত অসুবিধা রয়েছে এবং এর উপর মন্তব্য করার জন্য কমপক্ষে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত আমাদের সময়ের প্রয়োজন। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে বিভিন্ন ইস্যুতে চুক্তি করে Constituent সংসদে যাওয়া খুবই জরুরি নয়, কেননা সংসদে অধিবেশন চলাকালীন সময়েও দরকষাকষি চলতে পারে।' এটা উল্লেখযোগ্য যে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো, সংসদে বর্তমান নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আওয়ামী লীগ সংবিধান প্রণয়নে উপযুক্ত কিনা, ভুট্টো বললেন আইনগতভাবে বলছি, তারা পারে তবে বিষয়টির উপর সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংবিধান প্রণীত হবে। কেননা সংবিধান প্রণয়নের বিষয়টি এবং আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান উদ্ভট টাইপের। সংবিধান প্রণয়নকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতার ঐকমত্যের বিষয়টি দেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশের তার দলের সহকর্মীদের সাথে আলোচনার জন্য তারা ফিরে যাবেন। ঐ আলোচনার পর তারা ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আওয়ামী লীগের সাথে আরো আলোচনার জন্য ফিরে আসবেন।

ফেব্রুয়ারি ২১, ১৯৭১ সালের ঘটনা এবং মনোভাব যা পিপলস্ পার্টি আঘাত হানতে আরম্ভ করে, স্পষ্ট করে দেয় তারা আলোচনা আরম্ভ করতে কাজ করছে না বরং একটা সংকট এবং শেষ পর্যন্ত বিরোধের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন।

২ ফেব্রুয়ারি ১৯৭১ একটা কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা ঘটে যায়। ২ জন যুবক নিজেদের কাশ্মীরি মুক্তিযোদ্ধা পরিচয় দিয়ে একটা ভারতীয় বিমান ছিনতাই করে লাহোর নিয়ে যান। এ ঘটনায় ভুট্টো ও পিপলস্ পার্টি কর্তৃক তাদের সিংহ উপাধি দিয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়। ভুট্টো নিজে তাদের মাল্যভূষিত করেন এবং লাহোর রাস্তা দিয়ে বিজয় মিছিলে করে তাদের নেয়া হয়। ভারতের বিরুদ্ধে ভুট্টো প্রচণ্ড নিন্দামূলক বক্তব্য প্রদান করেন।

শেখ মুজিবের ও আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। ছিনতাই করা বিমান উড়িয়ে দেয়া, এমনকি ছিনতাইয়ের চেয়েও আরো ঘনীভূত সন্দেহটি ছিল যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধিতায় স্বার্থান্বেষী দল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিমান ধ্বংস করার ঘটনাকে নিন্দা জানিয়ে শেখ মুজিব একটা বিবৃতি দেন। বিবৃতিটি নিম্নরূপ :

এ ঘটনাকে এড়ানোর জন্য একটা দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারত। উপলব্ধি করা উচিত ছিল যে জাতীয় জীবনে এই সংকটময় সন্ধিক্ষণে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সৃষ্টি অন্তর্ঘাতকদেরই স্বার্থরক্ষা করবে। এ বিষয়ে তদন্ত করার জন্য আমি সরকারের নিকট জোর সুপারিশ করব এবং এই দুরভিসন্ধিমূলক কাজের দ্বারা পরিস্থিতি ঘোলাটে করা থেকে স্বার্থান্বেষী মহলকে বিরত রাখার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করব।

পিপলস্ পার্টি বিমান ছিনতাই ও বিমান উড়িয়ে দেয়ার জন্য আওয়ামী লীগের নিন্দার বিরুদ্ধে জোর প্রচারণা করে। লাহোরে আওয়ামী লীগের অফিসে আক্রমণ করা হয়। জনশ্রুতি ছড়িয়ে পড়ে যে, আওয়ামী লীগ ও পিপলস্ পার্টির ছিনতাই ঘটনার উপর বিভেদমূলক প্রতিক্রিয়া থেকে বোঝা যায় যে একটি বিদেশী নীতি প্রণয়ন কত কঠিন। এটাই সত্য যে ৬ দফার কর্মসূচির অধীনে পররাষ্ট্র বিষয় ফেডারেল সরকারের অধীনে থাকতে হবে।

চাপে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে আওয়ামী লীগ ছিনতাই ঘটনার উপর অনির্দিষ্ট মন্তব্য করা উচিত। শেখ মুজিব উল্লেখ করে বলেন যে এটা করা বাতুলতা মাত্র। যখন সরকার যা ঘটেছে তার উপর সংক্ষিপ্তভাবে তাকে জানানোর কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি যদিও তিনি স্বীকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। এখানে একটা কৌতূহলময় পাদটীকা দেয়া হয় যে আলভি, অতিরিক্ত পররাষ্ট্র সচিব ১ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় আসেন এবং অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভের দিকে ২ মার্চে তিনি সাক্ষাৎ করার জন্য অনুমতি নেন। আলভি দেখতে পেলেন যে এসব ঘটনায় তার মিশন চাপা পড়ে যায়।

ছিনতাইয়ের একটা উল্লেখযোগ্য ফল ভারত পাকিস্তানি বিমানের ইন্ডিয়ান ভূখণ্ডের উপর দিয়ে চলাচল স্থগিত ঘোষণা করে। এর অর্থ একমাত্র পথ যে পথে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বিমান যাতায়াত করবে, তা হচ্ছে সিলনের (শ্রীলংকা) উপর দিয়ে। এর অর্থ যে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সমাধান খুবই ব্যয়বহুল ও কঠিন, যদি জান্তা তা চায়।

ভুট্টোর সাথে ব্যর্থ আলোচনা এবং জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বানের কার্যপ্রণালী ভয় দেখিয়ে আরম্ভ হয় যে ইয়াহিয়া এবং মিলিটারি জান্তা জাতীয় সংসদ আহ্বান না করার জন্য অজুহাত খুঁজবে। আকাশসীমা দিয়ে বিমান চলাচল স্থগিতাদেশের অর্থ পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্যবাহিনী, গোলাবারুদ সামরিক জান্তার যাতায়াত ও প্রেরণ বাধাগ্রস্ত হবে এবং এতে ক্ষমতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

রেকর্ড করা যেতে পারে যে ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারির শেষে দলের অন্যান্য নেতার সাথে বন্ধ দরজায় শেখ মুজিব সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতার ঘোষণার সম্ভাবনা

বিবেচনা করেন। জাতীয় সংসদ আহ্বানে বিলম্ব আওয়ামী লীগকে অন্য কিছু ভাবতে বাধ্য করে। ঘোষণায় সৈন্যবাহিনীর প্রতিক্রিয়া এবং প্রচণ্ড আক্রমণে জনগণের টিকে থাকা এবং তা অতিক্রম করা সতর্কভাবে পর্যালোচনা করা হয়। অপসৃত স্বাধীনতার ঘোষণাকে একটা বিকল্প পন্থা হিসাবে দেখা হয়। বিদ্যমান মিলিটারি শক্তির উপর কিছু হিসাবের ধারণা করা হয়। আকাশসীমা ব্যবহার নিষিদ্ধ ও তা থেকে সৃষ্ট অসুবিধার কারণে জানমালের ক্ষতিও পর্যালোচনা করা হয়।

স্বাধীনতার খসড়া ঘোষণা তৈরির জন্য আমাকে বলা হয়। পূর্বদৃষ্টান্ত হিসাবে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণা ছিল, যাতে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদানের বিষয়টি যুক্তি দেখিয়ে ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক সাধনকৃত অন্যায়-অনাচারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটা খসড়া সময়মতো প্রস্তুত করা হয় এবং ১০ ফেব্রুয়ারির দিকে শেখ মুজিবের কাছে হস্তান্তর করা হয়, যা তিনি তার নিকট রেখে দেন। তাজউদ্দীন আহ্‌মেদ খসড়া তৈরিতে সাহায্য করেন এবং যদি এই পথ অবলম্বন করা হয়, তবে স্বাধীনতা ঘোষণার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য কর্মপন্থা তিনি বের করবেন। আলোচনা মোতাবেক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ছিল যে প্রধান শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হবে। লাখ লাখ লোক রাস্তায় বেরিয়ে আসবে। এতে সৈন্যবাহিনীকে বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। তখন আসল উদ্দেশ্য, প্রধান লক্ষ্যবস্তু হবে রেডিও স্টেশন, সচিবালয় এবং গভর্নর হাউস, যেখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে গভর্নর নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দেবেন।

ইতিমধ্যেই আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদ আহ্বানের জন্য চাপ দিতে থাকে। জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদে নির্বাচিত সব আওয়ামী লীগ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের যৌথ সভা ১৯৭১ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারির সভা স্বাধীনতা ঘোষণা করার জন্যই ডাকা হয়। আমি সভা শেষে একজন বিদেশী ডিপ্লোম্যাটকে জিজ্ঞেস করতে দেখেছি, এ সভায় আপনি কি ইউডিআই ঘোষণা করতে যাচ্ছেন। খুব সকালে যখন যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং জাতীয় সংসদ আহ্বানে বিলম্বের জন্য পরিবেশ উত্তেজনাকর হওয়ায় ইয়াহিয়া ঘোষণা দেন যে ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

এই ঘোষণায় ভুট্টোর প্রতিক্রিয়া সংকটকে আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৯৭১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি পেশোয়ারে এক বিবৃতিতে তিনি ৬ দফার আপস বা সমন্বয়তার জন্য সমঝোতার অনুপস্থিতিতে ঢাকার ৩ মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগ দিতে তার দলের অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তিনি আরো বলতে থাকেন যে এই কথা উল্লেখ করে পূর্ব পাকিস্তান যেতে তার দলের লোক বিবাদে

লিপ্ত হবে। ভারতের বৈরিতা এবং ৬ দফা অগ্রহণযোগ্যতার কারণে দ্বৈত জিম্মির অবস্থায় তার দলকে পড়তে দেবে না। ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে করাচিতে ভুট্টো বললেন, আসন্ন জাতীয় সংসদের অধিবেশনে যোগ না দেয়ায় তার দলের সিদ্ধান্ত ছিল অটল ও অখণ্ডনীয়।

১৭ ফেব্রুয়ারিতে ভুট্টো করাচিতে বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে আসন্ন জাতীয় অধিবেশনে দলের লোকদের সভায় যোগ দেয়া অর্থহীন। ভুট্টো বললেন, তার দল আওয়ামী লীগের কিছুটা সম্মত মীমাংসা ও সমঝোতায় পৌছাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন আওয়ামী লীগের সাথে আরো দরকষাকষির কোনো সুযোগ নেই। ভুট্টো বললেন, ৬ দফার মধ্যে সবচেয়ে কঠিন দফা বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্য।

এভাবেই ভুট্টোর বিবৃতি থেকে অবস্থানের কঠোরতা প্রকাশ পায় এবং ঢাকায় জানুয়ারির শেষে তার প্রদত্ত বিবৃতির বিরোধী, যখন তিনি বললেন যে আওয়ামী লীগের আরো দরকষাকষি চলবে এবং জাতীয় অধিবেশনে তা অনুষ্ঠিত হবে। পরিবর্তে এখন জাতীয় অধিবেশনে আসতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছেন এবং আওয়ামী লীগের সাথে দরকষাকষির অবকাশ নেই।

বাঙালির ধরপাকড় মিলিটারি জান্তা বা জান্তার কমপক্ষে একটা অংশ পরিস্থিতিকে অনড় করেছে এবং ভুট্টোর সাথে মিলিটারি জান্তার একটা যোগাযোগ রয়েছে, বাঙালির এই ধারণায় সংবাদপত্র কর্তৃক ভুট্টোর নিকট প্রদত্ত প্রশ্নে প্রতিফলিত হয়, যা তার দলের লোকদের জাতীয় সংসদে যোগদানেও ভুট্টোর কোনো সুবিধা হবে না। তিনি বললেন যে তার ও অন্য কোনো লোকের মধ্যে গোপনে চুক্তির কোনো প্রশ্নই ওঠে না। সংবাদপত্র কর্তৃক প্রদত্ত এই ধারণাও সর্বজনবিদিত, ইয়াহিয়ার একজন উপদেষ্টার লেখার মধ্যে ফেব্রুয়ারিতে সম্প্রতি এটা পাওয়া যায়।

এ সময়ের মধ্যে ভুট্টো তার দরকষাকষি জোরালো হচ্ছে জানতে পারেন। জান্তার শক্তিশালী সদস্যগণ ইয়াহিয়ার সাথে না থেকে তার সাথে রয়েছে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ক্ষমতা হস্তান্তর ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য স্কীম তৈরির উদ্দেশ্যে ইয়াহিয়ার একটা মুক্ত হাত রয়েছে। কিন্তু জান্তা "অপেক্ষা এবং দেখা" নীতি অবলম্বন করে, যদি ইয়াহিয়া যেকোনো সাংবিধানিক কলাকৌশল দ্বারা দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সফল হন তবে উত্তম, কিন্তু বিগত জানুয়ারি থেকে যখন ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে নিষ্ফল আলোচনায় বসেন, জান্তা রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক বিষয়গুলোর নিষ্ক্রিয় দর্শক হিসাবে থাকার জন্য প্রস্তুত ছিল না। জানুয়ারি হতে সিদ্ধান্ত তৈরি প্রক্রিয়া পরিবর্তন হয়ে যায়। এটা আমার ধারণা যে

ফেব্রুয়ারিতে আহসানের মতো ইয়াহিয়ার স্থানে হামিদ স্থলাভিষিক্ত হতে পারেন। তিনি সম্ভবত যেতে খুশি ছিলেন না। কিন্তু কতগুলো কারণের জন্য জান্তাকে ইয়াহিয়ার সাথে চলতে হয়েছে। ফলে ইয়াহিয়া একটা অসহনীয় পরিস্থিতিতে তার ভূমিকা চালিয়ে যান।

ফেব্রুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহে একটা সংকটময় পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, ১৯ ফেব্রুয়ারিতে সামরিক বাহিনীর লোকদের চলাচল ঢাকায় পরিলক্ষিত হয় এবং ঢাকায় জাতীয় সংসদ ভবনের সামনে মেশিনগান দেখা যায়। এই পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য সভা আহ্বান করতে শেখ মুজিব তার দলের লোকদের পরামর্শ দেন। সভায় কিছু ছাত্র নেতাও উপস্থিত ছিল। আমি এই সভায় উপস্থিত ছিলাম। সেখান থেকে রিপোর্ট আসে যে, ক্যান্টনমেন্টে একটা কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় এবং ধরপাকড় চলছিল যা থেকে একটা সামরিক অ্যাকশন অনুমান করা হয়। এই অবস্থা মোকাবিলা করা হয় এবং অনুমান করা হয় যে, কারোই সেই রাতে তাদের বাসায় থাকা উচিত হবে না এবং মিলিটারি অপারেশনের মুখে প্রত্যেককে ঢাকা ছাড়তে হবে এবং প্রতিরোধের জন্য দেশব্যাপী জনসাধারণকে সংগঠিত করতে হবে। তবে কোনো মিলিটারি অপারেশন সংঘটিত হয়নি কিন্তু উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

২১ ফেব্রুয়ারি পরিস্থিতি আরো খারাপ হলো। আরেকবার আশা করা হলো যে, শহীদ মিনারের সভায় শেখ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণার ডাক দেবেন। যা হোক সভায় শেখ মুজিব উল্লেখ করেন, বাঙালি জনসাধারণ ঐক্যবদ্ধ, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং তাদের দাবি পূরণ করা না হলে তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রক্তপাত ঘটাবে।

ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য দলের প্রতিনিধিবর্গ আলোচনার জন্য ঢাকায় আসতে থাকে। এসব আলোচনায় আওয়ামী লীগের অবস্থান ছিল যে, যেহেতু তারা ৬ দফার ভিত্তিতে একটা সংবিধান প্রণয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাই তারা অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে খসড়ার স; দিক নিয়ে আলোচনা করবে এবং পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানের স্বার্থের উপর ৬ দফা স্কীমের প্রভাব বা ফেডারেল সরকারের Viability এর উপর আশঙ্কা দূর করার আহ্বান জানানো হবে। শেখ মুজিব কর্তৃক ২৪ ফেব্রুয়ারিতে সংবাদপত্রে বিবৃতি প্রদান করা হয়। উক্ত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের অবস্থার স্পষ্টভাবে বিবরণ দেয়া হয়েছে। বিশ্বাস করা হয় যে, কেবল এই সময়ের জন্য সামরিক জান্তার সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইয়াহিয়া উপদেষ্টার রিপোর্ট নিম্নবর্ণিত হলো ঃ

লারকানার আলোচনার পর সামরিক জান্তা রাজনৈতিক অবস্থা আলোচনা করার জন্য মধ্য ফেব্রুয়ারিতে রাওয়ালপিন্ডিতে মিলিত হয়। উক্ত সভায় সামরিক জান্তা কর্তৃক মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, যদি তিনি আপসহীন মনোভাব অপরিবর্তিত রাখেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে ভুট্টো উত্তেজনাকর ভাষণ পরিহার করেন।

বাজপাখির ন্যায় জেনারেল হামিদ, ওমর এবং গুল হাসান, তার বিশ্বস্ত বন্ধু পীরজাদা ও ভুট্টোকে পাকিস্তানের জাতীয় স্বার্থের রক্ষাকর্তা মনে করেন। সভায় সামরিক জান্তা মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যগণ ইতোমধ্যে নির্বাচনের পরে অব্যাহতি নেয়ার জন্য তাদের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের ৮ ডিসেম্বরের মন্ত্রিপরিষদের সভায় ইয়াহিয়া মুজিবের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকবে। এ কারণে তাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি সাংবিধানিক আলোচনার জন্য তাদের সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। কিন্তু জান্তার উপর ইয়াহিয়ার প্রভাব যা কখনোই অনিয়ন্ত্রিত ছিল না, মুজিবের নীতিকে পরিবর্তন করতে ব্যর্থতার কারণে হ্রাস পেতে থাকে। আহসান ও ইয়াহিয়া উভয়ে সুনাম হারান। আহসান মুক্তি পেতে চান এবং জান্তা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে বাজপাখি লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। ফেব্রুয়ারির ১৭ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়, কিন্তু ৪০ ঘণ্টার মধ্যে মন্ত্রিপরিষদের কিছু সদস্যকে উপদেষ্টা হিসাবে কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকেসহ মন্ত্রিপরিষদের কিছু সদস্যকে আহ্বান করেন। মন্ত্রিপরিষদের পরিবর্তে তিনি উপদেষ্টা পরিষদের সিদ্ধান্ত নিলেন। (কিন্তু আহসানুল হক ব্যতীত প্রস্তাবিত কাউন্সিলের বাঙালি সদস্যগণ থাকতে আর চাইলেন না, মন্ত্রিপরিষদের পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের মধ্যে কেবল Cornelio থাকতে ইচ্ছুক হলেন।)

আওয়ামী লীগের সংবিধান খসড়াকরণ কমিটি খসড়া সংবিধান বিল চূড়ান্ত করার জন্য রাতদিন কাজ করে যাচ্ছিল এবং ১ মার্চের আগেই এ কাজ সম্পন্ন করার জন্য দীর্ঘ সভা অনুষ্ঠিত হয়। ১ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকা আসবেন আশা করা হচ্ছিল এবং শেখ মুজিব কর্তৃক আমাদের বলা হয় যে, খসড়া সংবিধানের একটা অগ্রিম অনুলিপি উক্ত তারিখে ইয়াহিয়াকে প্রদান করা হবে।

সংবিধান খসড়াকরণ কমিটির খসড়া তৈরিতে সংশ্লিষ্ট থাকার সময় একজন উচ্চতর বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা একটা বার্তা নিয়ে আসেন যে, জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। তিনি উপদেশ প্রদান করেন যে, প্রতিবাদ করার জন্য শেখ মুজিবের গভর্নর আহসানের সাথে দেখা

করা উচিত। মেখ মুজিবকে এটা অবগত করা হলো এবং ঐ দিন সকালেই তিনি আহ্সানের সাথে দেখা করেন। শেখ মুজিব আহসানকে বললেন, জাতীয় সংসদের অধিবেশন স্থগিতাদেশকে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে বাঙালিদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবে এবং এটাকে ষড়যন্ত্র হিসাবে মনে করা হবে, এ অবস্থায় বিস্ফোরণ ঘটবে। আহসান ইসলামাবাদকে জানানোর প্রতিশ্রুতি দিলেন। পরে তিনি নিশ্চিত করেন যে এই মতামত জানিয়েছেন কিন্তু সিদ্ধান্তে কোনো পরিবর্তন আসেনি। সত্যি সত্যিই তিনি বললেন যে তাকে পরামর্শ দেয়া হয় যে যদি সংসদ স্থগিত করতে হয় তবে তা নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য, কোনো অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য নয়। ২৮ ফেব্রুয়ারির ভাষণে শেখ মুজিব বলেন সংসদের কোনো একক সদস্য কোনো ন্যায়সঙ্গত বিষয় বলেন, তবে তা গৃহীত হবে। উক্ত তারিখে ভুট্টো একটা দীর্ঘ স্টেটমেন্ট দিলেন। তিনি বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক অনুদানে তার মতানৈক্য কমিয়ে এনেছেন। তিনি এই বলে বক্তব্য শেষ করেন যে সংসদের অধিবেশন স্থগিত করা হবে অথবা সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১২০ দিনের সময়সীমা দূর করা হবে। সংসদ মুলতবির আশু পটভূমিতে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টার বিবরণ থেকে বোঝা যায় ভুট্টো সামরিক জান্তার সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। তার রিপোর্টে বলা হয়—

ইয়াহিয়া একটি অসমর্থিত অবস্থায় তার ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ভুট্টোর আচরণে জাতীয় সংসদ যা মার্চ মাসের ৩ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা, অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য মুলতবি ঘোষণা করা হয়। সংসদের মুলতবির উপর ১ মার্চের ইয়াহিয়ার ঘোষণা প্রচণ্ড উত্তেজনা সৃষ্টি করে। যখন আমি মার্চের ৫ তারিখে এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করি, তাকে বিমর্ষ ও অসহায় দেখাচ্ছিল। আমাকে বোঝানো হয়, তিনি শুধু এতে স্বাক্ষর করেছেন। ভুট্টো ও পীরজাদা বিবৃতি তৈরি করেছে বলা হয়। ইয়াহিয়া পূর্ববর্তী ঘটনার মতোই, এটা প্রচার করেননি। এটা কেবলমাত্র রেডিওতে পড়ে শোনানো হয়।

ঢাকা যাওয়ার জন্য যাতে করে জাতীয় সংসদ মুলতবি ঘোষণা না করো ভুট্টোকে রাজি করানোর জন্য করাচির উদ্দেশে ইয়াহিয়ার রাওয়ালপিন্ডি ত্যাগ করার পূর্বে, তিনি জাতীয় সংসদে যোগদানের উদ্দেশ্যে ভুট্টোকে রাজি করানোর জন্য একই মিশনে পীরজাদা, আহ্সান ও ইয়াকুবকে ইতোমধ্যেই প্রেরণ করেছেন। তিনি ভুট্টোকে প্রতিশ্রুতি দেন যে, যদি মুজিব পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ৬ দফা সংবিধানকে ছুড়ে ফেলে দিতেন এবং যদি তার সংবিধান খসড়া দেশের বিভক্তি বোঝাত তবে তৎক্ষণাৎ সংসদ মুলতবি করে দিতেন। যা হোক কিছুই ভুট্টোকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যখন এটা

স্পষ্ট হয়ে গেল যে সংসদ বর্জনে ভুট্টোর হুমকির ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণ সংসদে যোগদান করেননি, ইয়াহিয়া সংসদ মুলতবির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি একটা বিবৃতি প্রদান করতে চাইলেন যাতে করে পূর্ব পাকিস্তানে উত্তেজনা প্রশমিত হতে পারে। যদিও আমি তার মন্ত্রিপরিষদের সদস্য ছিলাম না, ইয়াহিয়া আমাকে একটা বিবৃতি তৈরি করার জন্য বলেন। অমি দেরি না করে প্রস্তাবিত বিবৃতির খসড়া তৈরি করতে আরম্ভ করে দিই।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানকে প্রতিনিধিত্বকারী ২টি প্রধান দলের মধ্যে অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ৩ মার্চ ১৯৭১ জাতীয় সংসদের সভা মুলতবি করার জন্য আমাকে বাধ্য করা হয়। আমি বোঝাতে চাইলাম যে দুই বা তিন সপ্তাহের বেশি সময় মুলতবি করা হবে না এবং এই সময়ের মধ্যে আমি আমাদের দেশের ২টা অংশের নির্বাচিত প্রতিনিধির মধ্যে সমঝোতা আনার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব। আপনার মনে হতে পারে আমি অতীতে প্রায়ই বলেছি এবং পুনরায় প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পূর্ব অথবা পশ্চিম পাকিস্তানের একটা সংবিধান আরোপ করতে আমার কোনো ইচ্ছা নেই। একটি সঠিক ফেডারেল সংবিধান, যার প্রতি রাজনৈতিক দলগুলো ও আমার শাসনব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি বিভিন্ন ফেডারেল ইউনিটগুলোর ঐকমত্য ছাড়া তৈরি করা যাবে না। আমি সবচেয়ে খুশি হব, যখন ফেডারেল ইউনিয়নের ওপর একটা ঐকমত্য গঠিত হবে এবং আমার পক্ষ থেকে আমার জাতিকে আমি নিশ্চয়তা দিতে চাই যে, আমি এই চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনে সব প্রচেষ্টা চালাব।

আমি আন্তরিকতার সাথে আশা করি এবং অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের আমার ভ্রাতৃবর্গের নিকট আবেদন করি এবং একটা ঐকমত্যের ফরমুলার জন্য কাজ করতে ২ বা ৩ সপ্তাহের অল্প সময় দেয়ার জন্য আবেদন করছি। ইনশাআল্লাহ আমরা এই কঠিন অবস্থা অতিক্রম করতে পারব। আমরা কায়েদে আজমের অবিস্মরণীয় উক্তি "পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে", স্মরণ করি। জাতির পিতার ইচ্ছা পূরণের জন্য আমরা সবাই আমাদেরকে উৎসর্গ করি।

ইয়াহিয়া যখন করাচির উদ্দেশে যাত্রা করেন আমি ব্যক্তিগতভাবে ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে বিবৃতি হস্তান্তর করি। তিনি পরে এটা পীরজাদাকে দেন, যিনি ভুট্টোর সহযোগিতা ধ্বংস করে দেন। আমি এখনো দুঃখবোধ করি যে আমি করাচিতে ইয়াহিয়ার সাথী হইনি। এই ঘটনার জন্য বিতৃষ্ণা ছিল যে আমি মন্ত্রিপরিষদের কোনো সদস্য ছিলাম না, উপদেষ্টা হওয়ার জন্য তার প্রস্তাব গ্রহণে আমার অক্ষমতা আমি প্রকাশ করি। করাচিতে ইয়াহিয়ার সঙ্গী হয়ে আমি

ইয়াহিয়ার সাথে আমার সংশ্লিষ্টতা সম্বন্ধে অহেতুক ধারণা সৃষ্টি করে থাকতে পারি। কিন্তু এখন আমি অনুভব করি যে ইয়াহিয়ার মারাত্মক দুর্বলতা ছিল তার খামখেয়ালি মনোভাব। তিনি আমার খসড়া অনুমোদন করেন কিন্তু আমার অনুপস্থিতিতে ভুট্টো ও পীরজাদা আরেকটি খসড়া উপস্থাপন করলেন ইয়াহিয়াকে। তার দুর্বল ব্যক্তিত্ব নিয়ে যদিও আমি এর প্রমাণাদি দিতে পারিনি, আমি সামরিক সচিবসহ প্রেসিডেন্টের পার্সোনাল স্টাফের নিকট থেকে জানতে পারি যে, ইয়াহিয়া ভুট্টোর সহযোগিতায় পীরজাদা কর্তৃক প্রণীত বিবৃতি স্বাক্ষর করতে খুবই অনিচ্ছুক। কিন্তু প্রচণ্ড চাপ ছিল এবং ইয়াহিয়া তা পরিত্যাগ করেন।

গভর্নর আহ্সানের মাধ্যমে ইয়াহিয়ার নিকট একটা স্পষ্ট সংকেত প্রদান করা হয় যে, সংসদ মুলতবির ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানে একটা রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটাবে। আহ্সান নিশ্চয়তা দেন যে তিনি এসব সংকেত প্রেরণ করে আসছেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি রাতে তখনো নির্দেশ ছিল যে ১ মার্চ ইয়াহিয়া ঢাকায় পৌঁছবেন। ঢাকায় প্রেসিডেন্টের আগমন উপলক্ষে প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পাদন করা হচ্ছিল। করাচি হতে আসা বিমানটিতে যা ১ মার্চে অবতরণ করে, ইয়াহিয়া ছিলেন না। উক্ত বিমানে ভ্রমণকারী একজন সরকারি কর্মকর্তা রিপোর্ট করেন উক্ত বিমানে ইয়াহিয়া যাওয়ার কথা থাকার কারণে করাচিতে ২ বার বিলম্ব ঘটে। শেষ পর্যন্ত তিনি থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বলা হয় যে ঐ রাতে ভুট্টোর সাথে ব্যাপক আলোচনা হয়। আওয়ামী লীগের সংবিধান ড্রাফটিং-এর গোটা কমিটি খসড়া সংবিধান বিলে ফিনিশিং টাচ দেয়ার জন্য পার্টি অফিসে সমবেত হন। ১ মার্চের শেষ সময় পর্যন্ত কমিটির কাজ করে এবং খসড়ার সব কাজ সম্পন্ন করে তখন পার্টির একজন কর্মী এসে রিপোর্ট করেন যে বেলা ১টার সময় একটা গুরুত্বপূর্ণ বেতারবার্তা সম্প্রচার করা হবে। কাজ বন্ধ করে দেয়া হলো এবং শেখ মুজিবসহ পার্টির অন্যান্য নেতা সংবিধান ড্রাফটিং কমিটির সদস্যদের সাথে মিলিত হন। বেতারবার্তা শোনার জন্য একটা রেডিও নিয়ে আসা হয়।

১৩.০৫ টার সময় বেতার ঘোষক ইয়াহিয়া নির্দেশিত বিবৃতির মূল অংশ পড়ে শোনান। বিবৃতিতে ছিল যে পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের অধিবেশন মুলতবি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এটা একটা অনির্দিষ্ট সময়ের মুলতবি। উল্লিখিত কারণ ছিল যে ভবিষ্যৎ সংবিধানের প্রধান প্রধান ধারার উপর একটা গৃহীত ঐকমত্য রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সৃষ্টি হয়নি। পূর্ব পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা রাজনৈতিক বিরোধের ফল তিনি উল্লেখ করেন এবং এভাবে পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রতিনিধিদের অধিবেশন থেকে বিরত রেখে যদি তিনি ৩ মার্চে উদ্বোধনী অধিবেশনে যেতেন, অধিবেশন বিভক্ত হয়ে

যেত। আরো উল্লেখ করা হলো যে সংবিধান তৈরির ইস্যুতে একটা যুক্তিপূর্ণ সমঝোতায় উপস্থিত হতে রাজনৈতিক নেতাদের আরো সময় দেয়া উচিত এবং সংবিধান তৈরির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে সংসদের অধিবেশন ডাকা হবে।

অন্য কথায়, ইয়াহিয়া স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেন যে সরকার গোষ্ঠীর সংবিধান তৈরির ওপর একটি ভেটো প্রদানের ক্ষমতা থাকতে হবে এবং তাদের সাথে পূর্ব সমঝোতা না হলে অধিবেশন ডাকা হবে না। বাঙালির সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তারা গুরুত্বহীন।

বেতার ঘোষণা শোনার প্রতিক্রিয়া একটা ক্রোধে পরিণত হয়। উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে উল্লিখিত প্রকাশ্য অপমানের চেয়ে বেশি বাঙালিদের কাছে কোনো প্রকাশ্য অপমান ছিল না। মিনিটের মধ্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দলের অফিসে প্রত্যেকের উদ্ভূত থেকে অনুভূত ক্রোধ জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে যায়। সরকারি কর্মচারীরা সচিবালয় ও অন্যান্য সরকারি অফিস থেকে বেরিয়ে আসে। ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে কর্মচারী কর্মকর্তা বেরিয়ে আসেন। একটা ক্রিকেট ম্যাচ স্টেডিয়ামে চলছিল। দর্শকরা রেডিও ঘোষণা শোনা মাত্রই স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসে। ছাত্ররা ইতোমধ্যেই বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে।

বেতার সম্প্রচার শুনে শেখ মুজিব নির্দেশ দিলেন যে আওয়ামী লীগের সব সংসদ সদস্য বিকেল ৩টায় হোটেল পূর্বাণীতে সমবেত হবেন। সেখানে তিনি পরবর্তী কর্মপন্থার উপর ভাষণ দেবেন।

কোনো সন্দেহ ছিল না যে আমাদের ইতিহাসে একটা সিদ্ধান্তমূলক মুহূর্ত এসেছে। এটা স্পষ্ট ছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের ক্ষমতা হস্তান্তরে জনসংখ্যা লঘিষ্ঠ শাসক শ্রেণী প্রস্তুত ছিল না এবং তারা একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে। ট্যাঙ্ক সজ্জিত ও বিমান বাহিনী সমর্থিত একটি সেনাবাহিনী রয়েছে। এদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের পক্ষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের একটা একতা রয়েছে, যা ক্ষোভের সাথে কাজ করছে। যদিও তারা অস্ত্রবিহীন এবং কোনো প্রতিবাদের মুহূর্তে অনেক রক্ত ঝরাতে পারে।

এটা স্পষ্ট যে বাঙালিদের জন্য একটি পথই রয়েছে— তা হচ্ছে যুদ্ধের আহ্বান। এভাবেই যুদ্ধের হুমকি আসন্ন। জানা ছিল না, মিলিটারি আক্রমণ উক্ত তারিখেই আরম্ভ হবে কিনা। ইত্যবসরে আমি পূর্বাণী হোটেলে পৌছলাম। বিভিন্ন দিক থেকে জঙ্গি মিছিল হোটেল পূর্বাণীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ ঘটনা থেকে মিছিলের জঙ্গিময়তা স্পষ্ট যে আর সকলের হাতে বাঁশ লাঠি ছিল এবং স্বাধীনতার শ্লোগান দিচ্ছিল।

এ অবস্থায় জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া বিস্ময়কর ছিল। ১৯৬৯-এর গণআন্দোলনের সফলতায় উদ্বুদ্ধ উচ্চ আশা প্রথমত রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ব্যর্থতায় এবং পরে দ্বিতীয়বার সমরিক আইন জারির মাধ্যমে মাটিতে মিশে যায়। আবারও আশার আলো ও সাইক্লোনের পর অসহিষ্ণু পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থার জন্য তারা নির্বাচনে যান এবং তাদের রায় প্রদান করেন। নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা দেয়ায় বিলম্বিত দরকষাকষিতে সামরিক সরকারের সুনাম বা পাঞ্জাবে ক্ষমতার সুনামে তাদের সামান্যই বিশ্বাস ছিল। জাতীয় অধিবেশন মুলতবির ঘোষণায় সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় এবং পাকিস্তানের ঐক্যবদ্ধতায় তাদের বিশ্বাসে চিড় ধরে। ১৯৬৯-এর অভিজ্ঞতা থেকে পদের বিশ্বাসী হতে শিখিয়েছে এবং তারা এখন ইতিহাস সৃষ্টিতে অধিকতর কার্যকর ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এভাবে সৃষ্ট লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা এবং তারা এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার জন্য রাজনীতিবিদদের নিকট দাবি জানান।

আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যগণ বিকেল ৩টার মধ্যেই সমবেত হয়। দলের নেতৃবৃন্দ দ্বারা পরিবেষ্টিত শেখ মুজিব ৩.২০ মিনিটে উপস্থিত হন। পরিস্থিতি ছিল উৎকণ্ঠাময়। বাইরে হাজার হাজার আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সমবেত হয়েছে। শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন, কেবলমাত্র সংখ্যালঘু দলের মতভেদের কারণে সংবিধান প্রণয়নের গণতান্ত্রিক ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে এবং সংসদের অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মুলতবি রাখা হয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা যতটুকু জানি, আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের প্রতিনিধি এবং আমরা সহজেই এটাকে মোকাবিলা না করে ছেড়ে দিচ্ছি না।

তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ডাক দিলেন। পরবর্তী দিনের জন্য একটা কর্মসূচি ঘোষণা দিলেন। ২ মার্চ ঢাকায় সর্বাত্মক ধর্মঘট, ৩ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট এবং ৭ মার্চ জনসভার ঘোষণা দিলেন।

জাতীয় অধিবেশন মুলতবির প্রাথমিক চ্যালেঞ্জ অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এর অর্থ কোনো বাঙালি ইয়াহিয়া বা মিলিটারিকে কোনোভাবেই সহযোগিতা করবে না। ২ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবের বিবৃতিতে বলা হয়- "সরকারি কর্মচারীসহ প্রতিটি বাঙালির পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে গণবিরোধী শক্তিকে সহযোগিতা না করা এবং বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা। আরো ঘোষণা দেয়া হয় যে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই বৈধ ক্ষমতার উৎস।"

আগত দিনের কাজ ছিল অসহযোগ আন্দোলনকে পরিচালিত করা যাতে প্রশাসনকে অকার্যকর করার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জন করা যায়। কিন্তু একই সাথে

নিশ্চিত করা যে পূর্ব অংশের লোকের জীবনযাত্রা ও গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস বিঘ্নিত না করা।

কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশ জারির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাজউদ্দীন, আমিরুল ইসলাম ও আমাকে নির্দেশ দেয়া হয় খসড়া করার এবং শেখ মুজিব ও দলের নেতা কর্তৃক এসব নির্দেশনাবলী অনুমোদিত হওয়ার পর জারির কাজ দেয়া হয়।

প্রথম নির্দেশ ২ মার্চ জারি করা হয় এবং সরকারি অফিস, সচিবালয়, হাইকোর্ট ও অন্যান্য কোর্ট, কিছু-কিছু সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, যেমন: ডাকঘর, রেলওয়ে ও অন্যান্য যোগাযোগ সার্ভিস, পরিবহন (সরকারি-বেসরকারি), মিল কারখানা, শিল্প ও বাণিজ্যিক স্থাপনাসমূহ এবং মার্কেটসমূহ সর্বক্ষেত্রে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ৩-৬ মার্চ ১৯৭১ প্রদেশব্যাপী হরতালের ডাক দেয়া হয়। এ্যাম্বুলেন্স, সংবাদপত্রের গাড়ি, হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ হরতালের আওতামুক্ত থাকে। অফিস, আদালত, শিল্পপ্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণভাবে অচল হয়ে পড়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় মিলিটারি সান্ধ্য আইন জারি করে যা শান্তিপূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করা হয়। সেনাবাহিনী এ আইন অগ্রাহ্যকারী জনসাধারণের ওপর গুলি চালায় এবং কিছুসংখ্যক লোক আহত হয়। প্রতীয়মান হয় যে জেনারেল ইয়াকুব, মিলিটারি কমান্ডার, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেন, কিন্তু আন্দোলন দমন করার জন্য তার যথেষ্ট ফোর্স ছিল না। বলা হয় যে এটা সামরিক রায় ও অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ না করার জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। যে-কোনো ক্ষেত্রে জেনারেল টিক্কা খান, যিনি বেলুচিস্তানে বেসামরিক লোকদের বিরুদ্ধে নির্মম অপারেশন পরিচালনার জন্য কুখ্যাতি অর্জন করেন, মার্চের প্রথম সপ্তাহে তাকে সরানো হয়।

৩ মার্চ ছাত্র কর্তৃক আহূত সভায় শেখ মুজিব সৈন্যবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানান। যদি জনগণের শাসন মেনে না নেয়া হয় এবং জোরপূর্বক দমন করা হয়, তবে জনগণ তাদের জীবন ত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করবে না। তিনি কাজ না করার জন্য আদেশ দেন। একই সন্ধ্যায় ঢাকায় ১০ মার্চ ইয়াহিয়া কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য রাজনৈতিক নেতাদের রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের প্রস্তাব দিয়ে ইসলামাবাদ থেকে একটা বেতার ঘোষণা প্রচার করা হয়। জান্তা আন্দোলনের বিস্তৃতি অনুধাবন করতে আরম্ভ করে। রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সের ডাক উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে দেয়। যেহেতু এর অর্থ জাতীয় সংসদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী একটি দলকে অন্য নেতৃবৃন্দের সাথে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্সে বসতে হবে। ইতোমধ্যেই সান্ধ্য আইন জারি করা হয় ও নিরস্ত্র বেসামরিক লোকদের

উপর গুলিবর্ষণ আরম্ভ হয়ে যায়। এ বেতার ঘোষণায় শেখ মুজিব কর্তৃক তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যানের জন্য চাপের কথা আমার মনে হয়। এই পরামর্শ দিয়ে একটা বা ২টা ঘোষণা ছিল যে এই প্রস্তাব তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান না করা হতে পারে কিন্তু একটা উত্তর দেয়ার পূর্বে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হতে পারে। কেউ-কেউ পরামর্শ দেন যে পরবর্তী দিন পর্যন্ত সামান্যতম উত্তর বারিত করা হবে। তবে শেখ মুজিব বিদ্যমান মনের ভাব প্রতিফলন ঘটিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে তৎক্ষণাৎ একটি প্রত্যাখ্যান ঘোষণা করা হবে। অবিলম্বে জারি করার জন্য একটা বিবৃতি তৈরি করতে আমাকে বলা হয় এবং কয়েক মিনিটের মধ্যেই কনফারেন্সের আহ্বান নির্মম তামাশা হিসাবে আখ্যায়িত এবং প্রত্যাখ্যান করা হয়। দেশের বাইরে ও ভিতরে মার্চের ৭ নির্ধারিত সভায় পুনরায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। বিদেশী ভাষ্যকারগণ অনুমান করতে থাকেন যে মার্চ মাসের ৭ তারিখে ইউডিআই অনুষ্ঠিত হবে।

ইতোমধ্যেই অসহযোগ আন্দোলন আরো জোরালো আকার ধারণ করে। সাধারণ ধর্মঘট অব্যাহত রাখার নির্দেশ প্রতিপালনে এটা খুব শিগগিরই স্পষ্ট হয়ে যায় যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সার্ভিস প্রদান নিশ্চিত করা খুবই জরুরি এবং কিছু-কিছু প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড অব্যাহত রাখা হবে যাতে করে জনসাধারণ ক্লেশ, দুঃখ, দুর্দশা দূর করতে পারে। অসহযোগ আন্দোলন ১ মার্চ শুরু হওয়ায় অনেক সরকারি ও বেসরকারি কর্মচারী তাদের বেতন-ভাতা উঠাতে সক্ষম হননি। অনেকেই যারা চেকের মাধ্যমে বেতন পান, তারা চেক ভাঙাতে পারেননি। সর্বস্তরের লোকজন বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান উল্লেখ করে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করার জন্য সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসে।

সমস্যা মোকাবিলা করার জন্য মার্চের ৪ তারিখে আরো নির্দেশ জারি করা হয়। এসব নির্দেশনা ইতিবাচক আদেশের আকারে হবে, অর্থাৎ, এসব নির্দেশে কিছু-কিছু কাজ করা থেকে জনসাধারণকে বিরত থাকতে বলা হবে না বরং আওয়ামী লীগ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশাবলী অনুসারে কার্য সম্পাদনের বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হবে। এটাই হচ্ছে পাকিস্তানের পূর্ব অংশের অস্থায়ী সরকারের কার্য পরিচালনায় আওয়ামী লীগের প্রথম পদক্ষেপ। এভাবে ৪ মার্চে বিশেষ নির্দেশাবলী জারি করা হয় যে সরকারি অফিস, যেখানে কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদান করা হয়নি, কেবলমাত্র বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য বিকেল ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত খোলা থাকবে। আরো নির্দেশ জারি করা হয় যে ব্যাংক অধিক রূপীর বেতনের চেক ভাঙানোর জন্য বাংলাদেশের মধ্যে নগদ লেনদেনের উদ্দেশ্যে ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত

কাজ করবে।

যেহেতু ধারণা রয়েছে যে ব্যাংক খোলা থাকবে, ব্যাংকের মাধ্যমেই পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার করা হবে, তাই বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয় যে বাংলাদেশের বাইরে কোনো রেমিট্যান্স প্রেরণ করা হবে না, এ বিষয়ে স্টেট ব্যাংককে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। এই সময়টা সকালের পরিবর্তে বিকাল ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয় যাতে করে বোঝা যায় যে অফিসসমূহ আওয়ামী লীগ কর্তৃক জারিকৃত আদেশ মোতাবেক স্বাভাবিক সময়ে খোলা হচ্ছে না। বাংলাদেশের ডাক্তার, সাংবাদিকদের গাড়ি, ফায়ার সার্ভিস, স্থানীয় ট্রাঙ্ক ও টেলিফোনকে এ আদেশসমূহের বাইরে রাখা হয়। যদি প্রয়োজন হয়, তবে ৪টা ৩০ মিনিটের পরেও খাদ্যের গুদাম খোলা রাখারও নির্দেশ জারি করা হয়।

কিছু কিছু ট্রেড ইউনিয়নের সদস্য রিপোর্ট প্রদান করেন যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে একটা প্রতিষ্ঠানের সক কর্মচারীর মোট মজুরির জন্য ১৫০০ রুপির চেয়ে বেশি পরিমাণের চেক ভাঙানো দরকার।

৬ মার্চে সানাউল হকের নেতৃত্বে সিভিল সার্ভেন্টদের একটা দলের সাথে আমার এই বলে যোগাযোগ হয় যে তারা শেখ মুজিবকে সমর্থন করার জন্য যৌথভাবে ঘোষণা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এবং তার সাথে তারা দেখা করতে চান। উদ্দেশ্য হলো এখন থেকে তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নির্দেশে কাজ করবেন। আমি একটা সভার আয়োজন করি, যাতে সানাউল হকের নেতৃত্বে সিভিল সার্ভেন্টের প্রতিনিধিবর্গ আওয়ামী লীগের নির্দেশাবলী পালনে তাদের প্রতিশ্রুতি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেন। শেখ মুজিব নির্দেশ দেন যে তারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এবং ৩ জন, যাদের নির্দেশাবলি প্রণয়নের জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়, সিভিল সার্ভেন্টদের সাথে প্রতিদিন মিলিত হবেন। এটা প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়, যা পরবর্তী সপ্তাহের পূর্ব অংশের কার্যাবলী পরিচালনা করত। ৬ মার্চ দলের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের একটা সভা শেখ মুজিবের বাসায় অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ৭ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জনসভায় গৃহীতব্য পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। আশা করা যাচ্ছিল যে ৭ মার্চে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হবে। প্রকৃতপক্ষে ছাত্র এবং যুবক গোষ্ঠী এ রকম ঘোষণাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিল। আসলে ৭ মার্চের আগে দলের সদস্যদের মধ্যে একটা সন্দেহ বিরাজ করছিল যে একমাত্র স্বাধীনতা গ্রহণযোগ্য লক্ষ্য। অন্যকিছুই ছাত্র-যুবক গোষ্ঠী এবং রাজনৈতিক সচেতন গোষ্ঠীর একটা বড় অংশের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল না। কিন্তু এ বিষয়ে দায়িত্বভার শেখ মুজিব ও দলের ওপর নির্ভর

করছিল। ৭ মার্চ তারিখ স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদানের পুরাপুরিভাবে সংশ্লিষ্টতা খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

স্বাধীনতার একতরফা ঘোষণার অর্থ হবে সৈন্যবাহিনীকে সরাসরি জড়িয়ে ফেলা। তারা শুধু ফোর্স ব্যবহারের জন্য ছুঁতাই খুঁজবে না, বরং তারা জোর করে তাদের ইচ্ছা চাপিয়ে দেয়ার জন্য সবকিছু দিয়ে আঘাত করবে। নিরস্ত্র জনসাধারণ কি এ রকম আক্রমণের ধাক্কা সহ্য করতে পারবে? বহির্বিশ্বে এর প্রতিক্রিয়া কি হবে? অন্যান্য দেশ কি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে?

স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার কি স্বীকৃতি আদায়ের জন্য সুসংগঠিত মিলিটারি আক্রমণের মুখে দীর্ঘদিন টিকে থাকতে পারবে? তাছাড়াও শক্তিশালী দেশসমূহ কি স্বীকৃতি দেবে? এবং স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ কি গ্রহণ করবে? এমন ধরনের অনেক প্রশ্ন দেখা দেবে। সভায় শেখ মুজিব অনেক মতামত শুনলেন, যেগুলো বিভিন্ন সদস্য কর্তৃক প্রকাশ করা হয় এবং রায় প্রদান করা হয়। পুরো পরিস্থিতির পর্যালোচনা করা হয়। সভা চলাকালীন ইয়াহিয়া বেতারে একটি বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিটা ছিল উত্তেজনায় ভরা এবং বাঙালিদের নিকট মারাত্মক অপমানসূচক। এতে বিদ্যমান পরিস্থিতির জন্য শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করা হয়। এই বিবৃতিতে ভীতি প্রদর্শনকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়।

যখন বোঝা গেল যে, পর্যাপ্ত ফোর্স প্রয়োগে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা যেতে পারে। তখন আমি লুঠতরাজ, হত্যা থেকে আইন ভঙ্গকারীদের বিরত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ব্যবহার করতে পূর্ব পাকিস্তানের কর্তৃপক্ষকে আদেশ দিই।

আমাকে সর্বশেষে এটাকে স্পষ্ট করতে হলো যে যতক্ষণ পর্যন্ত আমি পাকিস্তানি সৈন্যবাহিনীর কমান্ডে রয়েছি, ততক্ষণ পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব নিশ্চিত করব। এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ বা ভুল থাকবে না। এই দেশকে রক্ষা করার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের প্রতি আমার দায়িত্ব রয়েছে। তারা আমার নিকট থেকে এটা আশা করে এবং আমি তাদের হতাশা করব না। হাজার হাজার নির্দোষ পাকিস্তানির মাতৃভূমি ধ্বংস করতে দেব না। পাকিস্তানের সংহতি, অখণ্ডত্ব ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর কর্তব্য এবং এ কর্তব্য পালনে তারা কখনো ব্যর্থ হয়নি।

আড়ম্বরহীন ভাষায় অনূদিত বার্তাটি ছিল এই যে, ইয়াহিয়া বিশ্বাস করেন পরিস্থিতির সামরিকভাবে সমাধান করা যেতে পারে এবং তিনি নিজেকে পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় শক্তির ধারক মনে করেন।

বার্তায় বর্ণিত হুমকি খুবই স্পষ্ট। বেতারবার্তা সম্প্রচার শেষে শেখ মুজিব

নির্দেশ দিলেন যে, কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সভা পরবর্তী সন্ধ্যা পর্যন্ত মুলতবি করা হবে এবং ইতোমধ্যে পরের দিন গৃহীতব্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিদ্ধান্তের ভার সরাসরি তার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। শেখ মুজিব দলের বড় নেতা জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদ, ক্যাপটেন মনসুর অ্যালী, এ এইচ এম কামরুজ্জামানকে পরামর্শের জন্য ডাকেন। আমিও তাদের সাথে যোগ দিই। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান খুব গুরুত্বসহকারে পর্যালোচনা করা হয়। এটা সত্য যে এই ঘোষণা সৈন্যবাহিনীকে, যারা একটা সামরিক আক্রমণের জন্য পাঁয়তারা করছিল, তা করার জন্য সুযোগ করে দেবে। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, এরূপ সুযোগের কথা তাদের কাছে প্রকাশ করা হবে না। একই সাথে আন্দোলনের গতিশীলতা অবশ্যই রক্ষা করা হবে এবং জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগ করতে হবে। ধারণা করা হলো যে আন্দোলন যদি চলতে থাকে এবং জনসাধারণের একতা অক্ষুণ্ন থাকে তবে ইয়াহিয়া ও সামরিক জান্তার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফল আসবে না। অতএব, সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে স্বাধীনতার স্পষ্ট ঘোষণা হবে না। ইয়াহিয়ার উপর চাপ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে বিশেষ কিছু দাবি দেয়া হবে এবং চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে স্বাধীনতার এসব দাবির সমর্থনে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া হবে। এই দাবিগুলোর মধ্যে ব্যারাকে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য চলাচল নিষিদ্ধ এবং হত্যার তদন্ত অন্তর্ভুক্ত। শেখ মুজিব নির্দেশ দেন, যেন অনতিবিলম্বে সামরিক শাসন প্রত্যাহার ও জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

বিদ্যমান পরিস্থিতি উল্লেখ করে একটা আনুষ্ঠানিক বিবৃতির খসড়া তৈরি করতে আমাকে বলা হয়। ৭ মার্চ জনসভার পরে সংবাদপত্রে প্রচার করা হবে। ঘোষণার গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ৭ মার্চে শেখ মুজিবের ভাষণ প্রদানের পর একটা লিখিত বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রদান করা হবে। ঐদিন রাতেই একটা খসড়া বিবৃতি তৈরি হয়। পেশকৃত খসড়ায় সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং শেষে অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ ছিল ঃ

'সংগ্রামের বর্তমান পদক্ষেপের লক্ষ্য হচ্ছে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। এই লক্ষ্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন অবশ্যই চলতে থাকবে।'

তাজউদ্দীনের তত্ত্বাবধানে বিবৃতি লিখার জন্য শেখ মুজিব নির্দেশ দেন এবং

প্রদত্ত ভাষণের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন করার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে জারি করবেন।

ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ কেবলমাত্র ১৯ মিনিটের। উক্ত ভাষণে গুরুত্বপূর্ণ বাক্য ছিল 'বর্তমানে আমাদের সংগ্রাম হচ্ছে স্বাধীনতার, আমাদের সংগ্রাম মুক্তিসংগ্রাম।' বিশেষ দাবি হিসাবে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর। লিখিত টেক্সট, যা প্রচার করা হয় বিশেষ দাবি হিসাবে এই ২টি দফা অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য হিসাবে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেয়া হয়। শেখ মুজিব আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পূর্বমুহূর্তে থেমে যান। কারণ, এটা স্পষ্ট যে সৈন্যবাহিনীকে শহরের সুবিধামতো স্থানে বসানো হয়েছে এবং যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হয়, তবে আক্রমণ চালানো হবে। উল্লেখ্য যে আগের রাতে একজন ব্রিগেডিয়ার এই বলে ইয়াহিয়া খানের নিকট থেকে একটা বার্তা পেয়েছেন যে, তিনি শিগগিরই ঢাকা আসবেন এবং একটা সমঝোতায় পৌছার আশা করেন, তাতে করে বাঙালিদের সন্তুষ্ট করা যাবে। এটা ছিল একটা কৌতূহলী যোগাযোগ, তার বেতার ভাষণে প্রদত্ত অপরাধ হাল্কা করার প্রচেষ্টা এবং ৭ মার্চের সভায় শেখ মুজিব কর্তৃক গৃহীত পরিস্থিতিকে প্রভাবান্বিত করার প্রচেষ্টা। আমাকে তার নিজের জন্য একটা alibi তৈরির প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হয়। এভাবে যদি স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়া হতো, তবে তিনি বিশ্বকে দেখাতেন যে তিনি ঢাকায় যাওয়ার প্রস্তাব দিতেন এবং একটা শান্তিপূর্ণ সমঝোতায় পৌছতেন। কিন্তু শেখ মুজিব একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করে শক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্র তৈরি করে দেন। ৭ মার্চে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা থেকে শেখ মুজিবের বিলম্ব আরেকটি চিন্তাভাবনা।

পরবর্তী সপ্তাহের জন্য আরো কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। 'No tax campaign' অব্যাহত থাকে। প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অব্যাহত রাখার জন্য ৭ ও ৯ মার্চে ছাড় ও বিশেষ নির্দেশ ঘোষণা করা হয়। নির্দেশ দেয়া হয় যে, রেলওয়ে ও বন্দর কাজ করবে। তবে রেলওয়ে কর্মচারী ও বন্দরের কর্মচারীদের সহযোগিতা না করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। যদি জনগণের বিরুদ্ধে নির্যাতন চালানোর উদ্দেশ্যে ফোর্স আনা নেয়ার জন্য রেলওয়ে ও বন্দর ব্যবহৃত হয়। ৮ মার্চের নির্দেশনায় ব্যাংকের জন্য বিশেষ নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত ছিল। বাঙালি ব্যাংকারদের সাথে কয়েক দফা আলোচনার পর এই নির্দেশাবলী গৃহীত হয়। এসব নতুন নির্দেশনায় মিল কারখানা পরিচালনার জন্য শিল্প কাঁচা মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ব্যাংকিং লেনদেনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। তাছাড়া ১ হাজার রুপী পর্যন্ত ব্যক্তিগত উত্তোলনের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয় যে, সংশ্লিষ্ট সরকারি অফিস, সার ও পাওয়ার পাম্প, ডিজেল সরবরাহের উদ্দেশ্যে খোলা থাকবে। আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে, খাদ্য সরবরাহ, ইটের ভাটায় কয়লা সরবরাহ, পাট ও চালের বীজ বিতরণের কাজ পরিচালিত হবে। ব্যাংকার এ কে এন আহ্‌মেদ, সিনিয়র বাঙালি, স্টেট ব্যাংকের অফিসার, যারা করাচি থেকে আসেন, এর সাথে নির্দেশমালার উপর কাজ করার জন্য আরো সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ইয়াহিয়া মার্চের ১৫ তারিখে ঢাকা আসেন, ১৬ মার্চের সকালে শেখ মুজিব তার সাথে দেখা করেন। সভা এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়। যখন শেখ মুজিব ফিরে আসেন, তিনি সিনিয়র নেতাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। আমাকেও ডাকা হয়। প্রকৃতপক্ষে সপ্তাহগুলোতে ইয়াহিয়া বা তার উপদেষ্টাদের সাথে প্রতিটি সভার পর আলোচনা- পর্যালোচনার জন্য একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিব রিপোর্ট দেন যে, ইয়াহিয়া জাতীয় অধিবেশন মুলতবি করায় তার কাজের ব্যাখ্যা প্রদান আরম্ভ করেছেন। শেখ মুজিব তার সাথে আলোচনা করতে ব্যর্থতায় মারাত্মক গাফিলতির জন্য তাকে দোষারোপ করেন। ইয়াহিয়া তখন বললেন তিনি বর্তমান পরিস্থিতির পন্থা খুঁজে বের করতে চান, যাতে শেখ মুজিব তাকে বলেন যে, যা কিছু ঘটেছে তার আলোকে ও জনসাধারণের মনোভাবের আলোকে ৭ মার্চে উত্থাপিত কোনো দাবিই, বিশেষ করে অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তর দাবি ছাড়া কোনো কিছুই আলোচিত হবে না। ইয়াহিয়া তখন বললেন যে তাকে অবগত করা হয়েছে একটা সংবিধান প্রণীত হওয়ার পূর্বে সামরিক আইন প্রত্যাহারে কিছু আইনগত বাধা রয়েছে। শেখ মুজিব তার উত্তরে বলেন, তিনি এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে তার আইন বিশেষজ্ঞদের বলবেন এবং বোঝানো হবে যে-কোনো আইনগত বাধা সৃষ্টি হবে না।

এর পরে শেখ মুজিব নির্দেশ প্রদান করেন যে একই দিন সন্ধ্যায় অনুমিত আইনগত বাধার বিষয়টি আলোচনার জন্য আমি লে. জেনারেল পীরজাদার সাথে সাক্ষাৎ করব। আমি সেদিন সন্ধ্যায় পীরজাদার সাথে দেখা করি এবং পীরজাদাকে অভিযোগ করার সুযোগ নিলাম যে তারা অধিবেশন মুলতবিতে একটা মারাত্মক অশিষ্টতার অপরাধে দোষী এবং তাকে বললাম এটাকে সব বাঙালি জনসাধারণের নিকট প্রকাশ্যে অপমান হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। তাকে অস্থির ও গম্ভীর মনে হলো। তারপর তিনি অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবির বিষয়ে আসেন। তিনি যুক্তি

দেখান যদি সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়, তবে একটা আইনগত শূন্যতা সৃষ্টি হবে। আমি তৎক্ষণাৎ এ বলে তার যুক্তি খণ্ডন করে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংবিধান প্রণয়নের মধ্যে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে একটা Interim Arrangement's Order চালু করা হবে এবং একই আদেশ প্রেসিডেন্ট/প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক ঘোষণা দেয়া হবে। এই যুক্তি আসন্ন দরকষাকষিতে কাজে লাগে।

পরবর্তী সকালে ১৭ মার্চ শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন এবং সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য জোরালো দাবি জানান। ইয়াহিয়া আবারও আইনগত বাধার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, এসব বিষয় আলোচনা করার জন্য তার বর্তমান আইন উপদেষ্টা বিচারপতি কর্নেলিয়াসকে পাঠিয়েছেন। ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা ও আওয়ামী লীগ দলের মধ্যে একটা সভার প্রস্তাব করা হয়। ১৭ মার্চ সন্ধ্যায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহ্মেদ ও আমাকে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টা পীরজাদা, কর্নেলিয়াস এবং কর্নেল হাসান (এডভোকেট জেনারেল) এর সাথে দরকষাকষিতে বসার জন্য নির্বাচিত করা হলো। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে পীরজাদার সাথে সভা আরম্ভ করা হয় যে উক্ত সকালে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যে আলোচনায় ইয়াহিয়া একটা ঘোষণা দেবে এর ভিত্তিতে বলতে থাকে। তিনি নির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়ের নির্দেশনা দিলেন, যেগুলোর জন্য আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। তার মতানুসারে শেখ মুজিব প্রস্তাব দিলেন যে পূর্ব অংশের জন্য পূর্ব অংশের সদস্যদের দ্বারা আলাদাভাবে একটা সংবিধান এবং পশ্চিম অংশের জন্য পশ্চিম অংশের সদস্যদের দ্বারা আলাদাভাবে একটা সংবিধান তৈরি করা হবে এবং তারপর তারা একত্রে বসে পাকিস্তানের জন্য সংবিধান তৈরি করবেন। আরো নির্দেশ দেয়া হয় যে ৬ দফার ভিত্তিতে স্বায়ত্তশাসনের উদ্দেশ্যে পূর্ব অংশের বিধান প্রণয়ন করা হবে। পশ্চিম অংশের প্রদেশগুলো ১৯৬২ সালের সংবিধান মোতাবেক প্রদেশকে প্রদত্ত মাত্রার স্বায়ত্তশাসন ভোগ করবে। বাদবাকি ক্ষমতা কেন্দ্রের নিকট থাকবে। কর্নেলিয়াস পরামর্শ দেন যে জাতীয় অধিবেশনের সিদ্ধান্ত দ্বারা অনুরূপ একটা প্রাদেশিক সংবিধান চালু করা হবে। তারপর পরামর্শ দেয়া হলো যে, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার সাথে একটা আইনগত বাধাহীন সভায় উভয় পক্ষের উপদেষ্টাদের বসার জন্য দলিলের খসড়া হাতে পাওয়ার পূর্বেই সবচেয়ে ভালো হবে, যাতে করে সেখান থেকে মৌলিক নির্দেশাবলি পাওয়া যেতে পারে।

পাকিস্তান গভর্নমেন্ট হাইকোর্ট পেপারে বর্ণিত তথ্য সত্য নয়, ১৭ মার্চ, প্রাদেশিক গভর্নরদের সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ গঠনের

একটা সামরিক আইন ঘোষণার ইতোমধ্যেই খসড়া করা হয়েছে বা পটভূমিতে ফিরে আসার সামরিক আইনের অনুরূপ আদেশ দেয়া হয়েছে। আলোচনা প্রকৃতপক্ষে পরীক্ষামূলক ছিল এবং অধিকাংশ সময় আইনগত শূন্যতার বিষয়ে ব্যর্থ হয়, যা কর্নেলিয়াস ও পীরজাদার বক্তব্য অনুসারে সমস্যা সৃষ্টি হবে, যদি সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। যুক্তি দেখানো হয় যে, একটা অন্তর্বর্তীকালীন বন্দোবস্ত আদেশ ঘোষণা দিয়ে কার্যকর করা হবে যা সামরিক আইন প্রত্যাহার ও সংবিধান প্রণয়নের মধ্যে একটা যোগাযোগ সৃষ্টি করবে।

বর্তমানে রেকর্ডে রয়েছে যে ১৭ মার্চের সভার পর ইয়াহিয়া খান টিক্কা খানকে প্রস্তুত হওয়ার জন্য বলেন এবং সে অনুসারে ১৮ মার্চের সকালে মেজর জেনারেল খাদিম হোসেন, রা ফরমান আলী ২৫ মার্চ তারিখে কার্যকরযোগ্য সমগ্র প্রদেশে কঠোর সামরিক ব্যবস্থার জন্য পরিকল্পনায় প্রদত্ত কোড নাম অপারেশন সার্চলাইটের জন্য নীল নক্সা তৈরি করেন।

১৯ মার্চের সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে আরো একটা সভা করেন এবং জোরালো আবেদন জানান যে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরই একমাত্র সমাধান। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে একটা Interim Arrangement Order কার্যকর করা হবে। উক্ত আদেশ রাষ্ট্রপতির ঘোষণা দ্বারা কার্যকর করা হবে। একই দিনে সন্ধ্যায় ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণ আওয়ামী লীগ দলের সাথে মিলিত হন।

পাকিস্তান গভর্নমেন্টের শ্বেতপত্রে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয় যে প্রেসিডেন্টের দল আইনগতভাবে যতটুকু সম্ভব আওয়ামী লীগের দাবি পূরণের জন্য সামরিক আইনের বিধান প্রণয়নের কোনো নির্দেশনা পায়নি। প্রকৃতই পরের দিন সকালে আইনগত শূন্যতার বিষয়ে যৌক্তিকতার উপর যথেষ্ট সময় নেয়া হয় এবং কেবলমাত্র তারপরই একটা দলিল খসড়ার বিষয়ে সবাই আলোচনায় বসেন।

২০ মার্চের সকালে শেখ মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন। এ উপলক্ষে শেখ মুজিব তার সাথে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহ্মেদ, ক্যাপটেন মনসুর আলী, খোন্দকার মোশতাক আহ্মেদ, এ এইচ এম কামরুজ্জামান ও আমাকে নিলেন। ইয়াহিয়ার পক্ষে পীরজাদা, কর্নেলিয়াস ও কর্নেল হাসান উপস্থিত ছিলেন। পূর্বের দিন যখন আর্মির ট্রাক টঙ্গী দিয়ে যাচ্ছিল, তাদেরকে জনসাধারণ আক্রমণ করে এবং সৈন্যবাহিনী ও জনসাধারণের মধ্যে গুলিবিনিময় হয়। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল সৈন্যবাহিনীকে জনসাধারণের প্রথম প্রতিরোধ।

শ্বেতপত্রে বলা হয় যে, জনসাধারণ বাধা প্রদান করেছে যা শ্বেতপত্র দ্বারা আর্মি সাপ্লাইয়ের স্বাভাবিক চলাচল মনে করে যখন বাঙালিদের নিকট এসব সাপ্লাই জনসাধারণকে ম্যাসাকার করার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে। পরিস্থিতি ছিল খুবই উত্তেজনাময়। কিছুটা উত্তেজনার মধ্যেই ইয়াহিয়া বললেন, যদিও তিনি মীমাংসার জন্য এসেছেন এবং সৈন্যবাহিনীকে সংযম দেখানোর জন্য আদেশ প্রদান করা হয়, তিনি আওয়ামী লীগ কর্তৃক আর্মির সরবরাহে বাধা প্রদান সহ্য করবেন না। শেখ মুজিবও এই বলে জোরালো প্রতিবাদ করেন যে যখন দরকষাকষি চলছে, প্রত্যাশা করা হয় যে সৈন্যবাহিনী ব্যারাকেই থাকবে। ইয়াহিয়া এই বলে প্রতিবাদ করেন যে, এমনকি যদি তারা ব্যারাকে অবস্থান করেন, তবুও আর্মি সরবরাহ চলাচল জনসাধারণের নিকট উত্তেজনাকর বলে মনে হবে, কেননা পূর্বে এ রকম অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে নিরীহ নিরস্ত্র লোকদের উপর সৈন্যবাহিনীর লোক কর্তৃক গুলি চালানো হয়েছে। সত্যি সত্যিই জয়দেবপুরের খুব নিকটে কয়েক দিন পূর্বে সর্বশেষ প্রতিআক্রমণ সংঘটিত হয়। নিরীহ লোকদের উপর গুলি চালিয়ে সৈন্যবাহিনী কিছু লোককে হত্যা করে। এভাবে স্থানীয় লোকদের আবেগ বৃদ্ধি পায়। শেখ মুজিব তাদের অনুরোধ জানান যে সৈন্যবাহিনী যেন কোনো উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি না করে। তিনি আরো বললেন যে আপনারা জানেন যদি নিরীহ বেসামরিক লোকদের হত্যা অব্যাহত থাকে, তবে তাদেরও জবাব দেয়ার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। তারপর একটি রাজনৈতিক সমাধান আসবে এবং আর কোনো রক্তপাত ঘটবে না।

শেখ মুজিবের এই জোরালো বিবৃতি ইয়াহিয়ার ওপর কিছুটা প্রভাব ফেলে মনে হয়। যার ফলে তিনি এই বলে রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি প্রত্যাখ্যান করেন যে তিনি একজন সাধারণ লোক ছিলেন এবং যদিও নীতিগতভাবে শেখ মুজিবের দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত, কিন্তু তাকে তার বিশেষজ্ঞগণ বলেছেন সংবিধান কার্যকর একটা আইনগত শূন্যতা সৃষ্টি করবে। কর্নেলিয়াস বিষয়টি লুফে নিলেন এবং সাংবিধানিক আইন ও যে-কোনো আইনগত প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষের উৎস থাকার প্রয়োজনীয়তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পড়েন। আমি তৎক্ষণাৎ এই বলে প্রতিবাদ করলাম যে যদি Interim Arrangement Order এর আকারে একটি আদেশ ইয়াহিয়া কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়, তাহলে কোনো শূন্যতার সৃষ্টি হবে না। এই আদেশটি সংবিধান গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বৈধ ও কার্যকর থাকবে। সেহেতু এ বিষয়ের উপর যুক্তিতর্ক চলতে থাকে, ঠিক সেই মুহূর্তে আমি একটা পন্থা বের করার চিন্তাভাবনা করি এবং দেখলাম বিষয়টি সংবিধান বিশেষজ্ঞ যেমন : এ কে ব্রোহী, যার সিদ্ধান্ত তারা গ্রহণ করতে পারেন,

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হোক। আমি জানি ব্রোহী ঢাকায় এবং আমার বিশ্বাস যে তার মতামত আওয়ামী লীগকেই সমর্থন করবে, যেহেতু এটা আইনগত দিক দিয়ে অনুকূলে ছিল। আমি আরো জানতাম যে কর্নেলিয়াস বিশেষভাবে ব্রোহীকে সম্মান করেন এবং এই পরামর্শটি গৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আমার ধারণাটি সঠিক। কর্নেলিয়াস বললেন এরূপ মতমাত সহায়ক হতে পারে। আমি এই রকম মতামত প্রকাশ করলাম। শেখ মুজিব ইয়াহিয়াকে বিশ্বাস করলেন না এবং বললেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য পন্থা বের করার কাজ বিশেষজ্ঞদের যাতে সবাই সম্মত হতে পারে। যদি আমরা প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিতে সম্মত হই তবে তা কার্যকর করার দায়িত্ব হবে বিশেষজ্ঞদের।

তারপর প্রস্তাব করা হলো যে মৌলিক বিষয়গুলো যেগুলো প্রণীতব্য প্রস্তাবিত ডকুমেন্ট হবে, উল্লেখ করা হবে। খসড়া ঘোষণায় উল্লেখ করা হবে :

ক. সামরিক আইন প্রত্যাহার

খ. নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর

গ. পূর্বাঞ্চলে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন (গুরুত্ব দেয়া হয় যে এটা অবশ্যই ৬ দফার কর্মসূচির ভিত্তিতে হবে।)

একমত পোষণ করা হয় যে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণ কিভাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হবে, তা আলোচনা করার জন্য সেই দিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের সাথে সভায় বসবেন।

তারপর ইয়াহিয়া এই বিষয়টি উত্থাপন করলেন যে তিনি মনে করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ করা প্রয়োজন। শেখ মুজিব বললেন, সেটা তার ব্যাপার এবং তিনি যেভাবে ইচ্ছুক, অগ্রসর হতে পারেন। ইয়াহিয়া বললেন, তিনি মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সম্মতির প্রয়োজন হবে। অন্যথায় এর দায়দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। তিনি আরো বললেন, একটি ঘোষণা তৈরি করার জন্য তাকে অনুরোধ জানিয়ে সব রাজনৈতিক নেতার স্বাক্ষরিত পত্র চান। তারপর ইয়াহিয়া বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দ, বিশেষ করে ভুট্টোকে আহ্বান জানাতে প্রস্তাব করবেন।

শেখ মুজিব বললেন, প্রেসিডেন্ট যা খুশি তাই করতে পারেন এবং সিদ্ধান্ত নেয়া তার ব্যাপার। শেখ মুজিব আরো বললেন, তিনি সরাসরি ভুট্টোর সাথে দেখা করবেন না। তবে ইয়াহিয়া আলাদাভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারেন। এটাও একটা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। একটা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে ভুট্টো ও ইয়াহিয়া মূলত একই স্বার্থে কাজ করছেন এবং আলাদাভাবে তাদের দরকষাকষি করতে দেয়ার অর্থ হবে তাদের দরকষাকষিতে সুবিধা করে দেয়া।

আমি বললাম, খসড়া প্রণয়নের কাজ সরকারের পক্ষ থেকে করা হবে। কেননা তারা আইন মন্ত্রণালয়ের কর্মবলের মাধ্যমে তা করতে পারবেন। আরো বলা হলো, আইন মন্ত্রণালয়ের লিগ্যাল ড্রাফ্‌টম্যানকে পাঠাতে হবে। খসড়া কপি প্রস্তুত হওয়া মাত্রই আওয়ামী লীগের নিকট পাঠাতে হবে।

২১ মার্চের সকালে শেখ মুজিব আমাকে পাঠালেন। তিনি এবং তাজউদ্দীন আলোচনার মধ্যভাগে ছিলেন এবং তিনি আমাকে একটা ধারণা দিলেন যে, তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি চিন্তাভাবনা করছেন এবং তিনি মনে করেন কেবল প্রদেশগুলোতে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য প্রেসকে বলবেন। বাঙালি জনগণের আবেগকে প্রাধান্য দিয়ে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসানো সমীচীন হবে না। মনে হয় এ সিদ্ধান্তে আসার পিছনে তাকে অনেক কারণ খুঁজে পেতে হয়েছে:

(১) আবেগ, মেজাজ, বিশেষ করে ছাত্রদের মাঝে এমনভাবে ছিল যে তাদের আন্দোলন দমানো যাবে না এবং আওয়ামী লীগ তার দাবির উপর কোনো ছাড় দেবে না। কেন্দ্রে ক্ষমতায় আরোহণই হচ্ছে মীমাংসার উপায়। সত্যি সত্যিই কিছু ছাত্রনেতা এর আগে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে জোরপূর্বক এই বিষয়গুলো উল্লেখ করে।

(২) সংবিধান অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রের ক্ষমতা গ্রহণ, কেন্দ্রে আওয়ামী লীগকে অকার্যকর করার ঝুঁকি এনে দেবে এবং এভাবে সংবিধান প্রণয়নের পূর্বে তাদের অক্ষমতা প্রকাশ পাবে।

(৩) প্রদেশে ক্ষমতা গ্রহণ শুধু ফরমুলা, যার দ্বারা আওয়ামী লীগ কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ ছাড়াই তার অবস্থান সংহত করবে, যা পাঞ্জাবি আমলা ও সৈন্যবাহিনী গুরুত্বের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে দায়িত্ব পালন খুবই কঠিন হবে।

(৪) এতে অবশ্য প্রাদেশিক সরকারের সম্পদ সংগ্রহের সুযোগ আওয়ামী লীগকে এনে দেবে।

প্রতীয়মান হয় যে ইয়াহিয়া নিজেই এই ফরমুলা নিয়ে অগ্রসর হবেন, যেহেতু তিনি এর মাধ্যমে কেন্দ্রে তার অবস্থান ধরে রাখতে পারবেন। সেভাবেই শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন ইয়াহিয়ার সাথে একটি জরুরি সভার আহ্বান জানালেন। তারা ইয়াহিয়াকে বললেন বর্তমান পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বিধান তৈরি করা হবে।

ইতোমধ্যেই একটি লিখিত বিবৃতি তৈরি করা হয় এবং ব্রোহী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। এটা কর্নেল হাসানকে সরবরাহ করা হয়। পাকিস্তান গভর্নমেন্ট

শ্বেতপত্র খসড়া ঘোষণার আইনগত বৈধতার ব্যাপারে পয়েন্টগুলো সমর্থন করতে সংবিধান বিশেষজ্ঞ দিতে আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা নিরূপণে ডাহা মিথ্যার দোষে দোষী।

মার্চের ২১ তারিখে কর্নেল হাসান কর্তৃক প্রণীতব্য খসড়ায় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা প্রস্তুত ছিল এবং তা সংগ্রহ করার জন্য এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করা হয়। এই খসড়াটি আওয়ামী লীগ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। স্বাভাবিকভাবেই এটা খুব তাড়াতাড়ি করে প্রস্তুত করা হয়েছে। আনন্দের বিষয় হলো যে এতে পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়ে বিধান তৈরি করার জন্য পূর্বাঞ্চলের সদস্যদের নিয়ে গঠিত পৃথক কমিটির সাথে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিষয়ে পশ্চিমাঞ্চলের সদস্য নিয়ে গঠিত পৃথক কমিটির সাথে আলোচনায় বসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এতে উল্লেখ করা হয়, যে তারিখে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করবে সে তারিখ থেকে সামরিক আইনের ঘোষণা বাতিল ঘোষিত হবে। এই খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আওয়ামী লীগ দেখল যে এই খসড়াটি অনেক বিষয়ে অসম্পূর্ণ ও ফরমুলার সংখ্যায় খুব বড়। প্রথমত, তাদেরই ধারণা সামরিক আইন বাতিল খুব দ্রুত হবে। প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক শপথ গ্রহণ বিলম্বিত করা হবে। আওয়ামী লীগ একটি ফরমুলার পরামর্শ দিল, যদ্দারা প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ ঘোষণার তারিখ হতে ৭ দিন পর যেটা পূর্বে হবে, কার্যকর হবে।

ইতোমধ্যেই ভুট্টো মার্চের ২১ তারিখে উপস্থিত হলেন, যখন সংশোধিত খসড়াটি উপস্থাপিত হয়। কর্নেলিয়াস বললেন যে খসড়াটি সম্পূর্ণ ও কার্যকর। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম যে, এটাকে আওয়ামী লীগের খসড়া হিসাবে বর্ণনা করা যাবে না। ড্রাফটিং-এর সম্পূর্ণ কাজটিকে যৌথ কাজ হিসাবে গণ্য করা হবে। সংশোধিত খসড়া ঘোষণাপত্রের প্রতিটি ধারা পঠন আরম্ভ হয়। পীরজাদা উল্লেখ করলেন যে তিনি ভুট্টোর উপদেষ্টাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন এবং আগেই নির্দেশ দিয়েছেন যে সংশোধিত খসড়ার অনুলিপি ভুট্টোর নিকট প্রেরণ করা হবে।

ভুট্টোর নিজের কথায় তার আগমনে পরিস্থিতি নিম্নরূপ ছিল:

সেই তারিখে সন্ধ্যা ৭টা ৩০ ঘটিকায় প্রেসিডেন্ট হাউসে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করি। ১৬ তারিখ হতে ২০ তারিখ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সাথে অনুষ্ঠিত সভার কথা প্রেসিডেন্ট আমাকে বললেন। অগ্রগতির আলোকে শেখ মুজিব ১৮ তারিখে সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করেন। উক্ত সংবাদ সম্মেলনে তিনি বললেন অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগ ও প্রেসিডেন্টের বিশেষজ্ঞগণ প্রস্তাবিত সাংবিধানিক ব্যবস্থার উপর আলোচনা করলেন। প্রেসিডেন্ট

আওয়ামী লীগ কর্তৃক উপস্থিত প্রস্তাবের ব্যাপারে আমাকে অবগত করেন।

প্রস্তাবের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো, অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং সরকারের অনুরূপ ক্ষমতা হস্তান্তরে বিঘ্নতা সৃষ্টি না করে পাঁচটি প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে। এই প্রস্তাব অনুসারে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করে যাবে বা যদি তিনি মনে করেন গণপ্রতিনিধির বাইরের উপদেষ্টাদের সহায়তা নিতে পারেন। এটাও প্রস্তাব করা হয় যে, জাতীয় সংসদকে ২টা কমিটিতে ভাগ করা হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হবে একটি এবং অন্যটি হবে ঢাকায় বাংলাদেশের জন্য। কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের পৃথক পৃথক রিপোর্ট তৈরি করবে এবং জাতীয় সংসদে তাদের রিপোর্ট পেশ করবেন। তারপর জাতীয় সংসদে পরবর্তী কাজ হবে উভয় কমিটির প্রস্তাবের উপর আলোচনা-পর্যালোচনা করা এবং একত্রে বসবাসের পথ ও পদ্ধতি বের করা। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা মোতাবেক যেটা হবে ১৯৬২ সালের সংবিধানের সংশোধিত আকারে, ৬ দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলোর ১৯৬২ সালের সংবিধানে প্রদত্ত ক্ষমতা থাকবে, কিন্তু প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে পারস্পরিক সমঝোতায় গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি অনুসারে স্বায়ত্তশাসনের পরিধির উপর স্বাধীন থাকবে। পুরো কমিটি রাষ্ট্রপতির ঘোষণার আকারে প্রকাশ করা হবে।

প্রস্তাবের ব্যাখ্যা প্রদানের পর ইয়াহিয়া আমাকে (ভুট্টো) বললেন তিনি শেখ মুজিবকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, প্রস্তাবে ইয়াহিয়ার সম্মতি প্রথমত ভুট্টোর সম্মতির উপর নির্ভর করবে। তবে তিনি (ইয়াহিয়া) আরো সন্তুষ্ট হবেন যদি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতৃবৃন্দ তাদের সম্মতি দেন।

২২ মার্চের সকালে শেখ মুজিব যখন লিখিত খসড়া ঘোষণাপত্রটি নিয়ে ২টি দলের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ করার জন্য ইয়াহিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করেন, প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য ভুট্টো রাজি করে এ কথাটি সত্য নয়। শেখ মুজিবের কথা অনুসারে ভুট্টো পরামর্শ দেন যে বাইরে বারান্দায় আলোচনা করা তাদের জন্য শ্রেয়, যাতে করে তাদের কথা কেউ শুনতে না পারে। এই সভার জন্য ভুট্টোর নিজের কথা ছিল নিম্নরূপ :

২২ মার্চের সকালে আমি নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পূর্বে প্রেসিডেন্ট হাউসে উপস্থিতি হলাম, মুজিবর রহমান ১১টায় এলেন। আমরা একে অন্যকে স্বাগত জানালাম এবং কিছু আনুষ্ঠানিক কথাবার্তা বিনিময় করলাম। এরপর আমাদের প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আবারও আমাদের

অভ্যর্থনা জানানো হলো।

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টকে বললেন তিনি আওয়ামী লীগের প্রস্তাবের উপর তার চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছেন কিনা। প্রেসিডেন্ট তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন যে সম্মতি প্রদান করা আমার জন্য জরুরি ছিল এবং সে কারণে আলোচনায় উপস্থিত ছিলাম। এতে মুজিবুর রহমান লক্ষ্য করলেন যে প্রস্তাবসমূহ প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয়েছে এবং আমাকে রাজি করার জন্য এটা করা হয়েছে এবং বলতে থাকলেন একবার নীতিগতভাবে প্রস্তাবে ভুট্টো সম্মত হলে তারা আনুষ্ঠানিক আলোচনার আয়োজন করবে। কিন্তু তখন পর্যন্ত আলোচনা অনানুষ্ঠানিক ছিল এবং প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে এসে তিনি প্রেসকে বললেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন এবং মি. ভুট্টোও উপস্থিত হতে পারেন। প্রেসিডেন্ট উত্তর দিলেন, এটা যথেষ্ট ভালো নয়, কিন্তু শেখ মুজিব অবিচল থেকে গেলেন।

আমরা মিলিটারি সচিবের ঘরে ঢোকার সাথে সাথে শেখ মুজিব জেনারেল মোহাম্মদ ওমর, জেনারেল ইসহাক, প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিব, প্রেসিডেন্টের এডিসি, যারা ঘরে বসে ছিলেন, তাদের সবাইকে চলে যাওয়ার জন্য বললেন। কেননা তিনি আমার সাথে কথা বলতে চান এ বিষয়ে মনোভাব হঠাৎ পরিবর্তনে আমি কিছুটা বিস্মিত হয়ে গেলাম। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন এবং তার পাশেই আমাকে বসালেন। তিনি আমাকে বললেন, পরিস্থিতি খুবই খারাপ এবং এটা অতিক্রম করার জন্য আমার সাহায্যের দরকার। এ বিষয়ে ঘর লোকে ভরে যাবে মনে করে আমরা বাড়ির পিছনে বারান্দায় চলে এলাম এবং প্রেসিডেন্টের অভ্যর্থনার ঘরের পিছনে স্তম্ভের পাশে বসলাম।

শেখ মুজিব পুনরায় উল্লেখ করেন যে তিনি সামরিক সচিবের ঘরে আমাকে বলতে থাকেন পরিস্থিতি অনেক দূর গড়িয়েছে এবং পেছনে ফিরে আসার কোনো অর্থ নেই। তার কথা অনুসারে সর্বোত্তম পথ হচ্ছে তার প্রস্তাবে আমাকে সম্মত হওয়া। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, কোনো বিকল্প নেই। আমাকে তিনি বললেন, তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন যে পিপলস্ পার্টি হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানে একমাত্র শক্তি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনীতিবিদ কালক্ষেপণ করছেন। তিনি নিজে থেকেই সংবাদ দিলেন যে খান আবদুল ওয়ালী খান ব্যতীত সবাইকে তিরস্কার করেছেন। খান আবদুল ওয়ালী খানের দল একটি প্রদেশে প্রতিনিধিত্ব করে। তিনি বললেন, তিনি বুঝতে পেরেছেন যে সম্মত হওয়ার জন্য আমাদের দুজনকে দরকার। তিনি আমাকে বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানে আমি যা চাই তাই করতে পারব এবং তিনি আমাকে সমর্থন দেবেন। বিনিময়ে আমি পূর্ব পাকিস্তান

ত্যাগ করব এবং আওয়ামী লীগের প্রস্তাব বাস্তবায়নের নিশ্চয়তা প্রদানে তাকে সাহায্য করব। তিনি আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরামর্শ দিলেন এবং তিনি পূর্ব পাকিস্তান দেখবেন। তার কথা অনুসারে এটা হচ্ছে অচলাবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায়। তিনি মিলিটারির বিরুদ্ধে আমাকে সতর্ক করে দিলেন এবং তাদের বিশ্বাস না করতে বললেন। যদি তারা প্রথমে তাকে ধ্বংস করে, তারপর তারা আমাকেও ধ্বংস করে দেবে। আমি উত্তর দিলাম যে ইতিহাস ধ্বংস করার চেয়ে আমি ধ্বংস হতে চাই। এই প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য তিনি আমার উপর চাপ প্রয়োগ করেন এবং ২টি কমিটি গঠনেও চাপ দিতে থাকেন।

আমি তাকে বললাম, আমি স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাবে আমার সুচিন্তিত মতামত দেব এবং সুন্দর সমাধানে পৌঁছতে সম্ভাব্য সব কিছুই করব। তবে প্রস্তাবের চূড়ান্ত কাঠামো যাই হোক না কেন জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাস করাতে হবে। যদি প্রয়োজন হয় রাষ্ট্রপতির ঘোষণা জারির মাধ্যমে ক্ষমতা অর্পণ করতে হবে সিদ্ধান্তের আকারে। আমি তাকে আরো অবহিত করলাম যে আমি অধিবেশনের বাইরে প্রণীত প্রস্তাবের বিষয়ে কোনো পত্র দিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

মুজিবুর রহমান এমন সংক্ষিপ্ত আকারে অধিবেশন অনুষ্ঠানের ধারণা বাতিল করে দেন। ব্যবস্থার প্রকৃতি যাই হোক না কেন, পুরো দেশের জন্য অধিবেশন হিসাবে জাতীয় অধিবেশনের সভা ব্যতীত এতে সম্মত হওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দিকগুলোর ব্যাখ্যা প্রদানের পর তিনি চলে যাওয়ার জন্য উঠে পড়লেন। আমি তার গাড়ি পর্যন্ত গেলাম এবং আমরা একে অন্যকে বিদায় জানালাম। এটা ছিল আওয়ামী লীগের নেতাদের সাথে সর্বশেষ সভা।

শেখ মুজিব কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক অবস্থান ভুট্টো নিশ্চিত করেন। ভুট্টোর জেদ যে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন প্রথমে বসবে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা অনুমোদন করবে, যদিও পরবর্তীতে অনুমোদন করা হয়। শেখ মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে বাকবিতণ্ডার পর ভিতরে এবং বাইরে সৃষ্ট ধারণা যে রাজনৈতিক মীমাংসার সম্ভাব্য ক্ষীণ আভাস পরিলক্ষিত হয়। আওয়ামী লীগ রিপোর্টে শেখ মুজিব বলেন যে তিনি মনে করেন ইয়াহিয়া এবং ভুট্টো বুঝতে পেরেছেন প্রস্তাবিত লাইনে সমাধান পাওয়াটাই তাদের উদ্দেশ্য। কমপক্ষে পশ্চিমাঞ্চলে তাদের অবস্থানটা ছিল সুসংহত। ইয়াহিয়া প্রেসিডেন্ট থাকবেন, ভুট্টো পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন এবং যেহেতু পশ্চিমাঞ্চলের জন্য সংবিধান পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটি দ্বারা প্রণীত হবে, তাই ভুট্টোর দল উক্ত কমিটিকে প্রভাবান্বিত করতে পারেন। আমি কিছু-

কিছু বিদেশী সংবাদদাতাকে স্মরণ করি যারা বলেছেন ইয়াহিয়া ও ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে তাদের অবস্থান নিশ্চিত করার জন্য যা চান, কমিটি ২টি তাই করবে। ক্ষীণ আশার মধ্য দিয়ে ২২ মার্চ অতিবাহিত হয়। মীমাংসার ক্ষীণ সম্ভাবনা দেখা যায়। ২৭ মার্চের সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ আমার অফিসে খসড়া ঘোষণাটি পড়েন। সেখানে শেখ মুজিব ও অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ আসেন এবং খসড়াটি ভালোভাবে পড়ে শোনানো হয়। যেহেতু এটা ধারণা করা হয় যে খসড়াটি চূড়ান্তভাবে ঘোষণায় পরিণত হবে। ২২ মার্চের সারারাত চূড়ান্ত খসড়া তৈরির জন্য কাজ করা হয়।

২৩ মার্চ ছিল অসাধারণ দিন। আগের দিনে "পাকিস্তান দিবস" পালিত হয়। ঐ দিন হাজার হাজার বাংলাদেশের পতাকা বিক্রি হয়। আমার মনে হয় আমি সকাল ৬.০০ টায় গাড়ি চালিয়ে সংশোধিত খসড়ার অনুলিপিসহ আমার অফিসে যাই। আমি নবাবপুর রেলওয়ে ক্রসিং-এ একটা বাংলাদেশের পতাকা ক্রয় করি। সংশোধিত খসড়া নিয়ে সকাল ৭.০০টায় আমি শেখ মুজিবের নিকট উপস্থিত হই। শীঘ্রই অনেক মিছিল সেখানে আসল এবং তার বাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। অধিকাংশ বাড়ি ও গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা শোভা পাচ্ছিল।

আওয়ামী লীগ দল তাদের গাড়িতে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে সকাল ১১.৩০ মিনিটে প্রেসিডেন্টের বাসায় উপস্থিত হয়। প্রেসিডেন্টের বাড়িতে মিলিটারি অফিসারের শত্রুভাবাপন্ন প্রতিক্রিয়া সবার চোখে পড়ে যখন তারা পতাকা দেখেন।

যখন আওয়ামী লীগ নেতারা প্রবেশ করেন তাদেরকে বলা হয় যে এম, এম, আহমেদ ও অন্য অর্থ বিশেষজ্ঞদেরকে সরকার আর্থিক ও অর্থনৈতিক ধারাগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য নিয়ে এসেছে। সত্যি সত্যি এম, এম, আহমেদ বললেন যে তিনি মনে করেন ৬ দফা কর্মসূচি কিছু পরিবর্তনসহ কার্যকর করা যেতে পারে। পীরজাদা প্রস্তাব দেন যে এম, এম, আহ্মেদ আওয়ামী লীগ দলের অর্থ বিশেষজ্ঞদের সাথে মিলিত হতে পারেন এবং নূরুল ইসলামের নাম উল্লেখ করেন।

প্রকৃতই আওয়ামী লীগের অর্থনীতিবিদ আনিসুর রহমান, রেহমান সোবহান এবং অন্যরা নূরুল ইসলামের বাসায় প্রতিদিন মিলিত হতেন এবং প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের সংশোধিত খসড়ায় আর্থিক ও অর্থনৈতিক ধারা গৃহীত হতো। আওয়ামী লীগ আর্থিক বিশেষজ্ঞদের মধ্যে পৃথক সভার জন্য এই প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক নয়। কেননা তারা কালক্ষেপণের অজুহাত ছাড়া কিছুই মনে

করেননি। আওয়ামী লীগ বুঝতে আরম্ভ করল যে ইয়াহিয়ার উপদেষ্টাগণ প্রতিটি ধারার উপর আলোচনা দীর্ঘ করতে চেষ্টা করছেন এবং এটা স্পষ্টভাবে শ্লথগতিসম্পন্ন কৌশল হিসাবে মনে করা হয়। ২৩ মার্চের সান্ধ্যকালীন সভায় এম, এস, আহমেদ খসড়ায় সংশোধন ও সংযোজনের আকারে কিছুসখ্যক লিখিত পিপ উপস্থাপন করেন। এমনকি বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্যের বিষয়ে এম, এম, আহমেদ কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। তিনি বললেন কোনো বাধাবিঘ্ন ছাড়াই বৈদেশিক বাণিজ্য পশ্চিমাঞ্চলের উপর ছেড়ে দেয়া হবে। সাহায্যের বিষয়ে তিনি বললেন, অসুবিধা দূর করা যাবে যদি বৈদেশিক নীতির বিষয়সমূহ কেন্দ্রের উপর ছেড়ে দেয়া হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পুনর্গঠনের ব্যাপারে তিনি বললেন, এটা করা হবে এবং অন্তর্বর্তী সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঢাকা শাখা বাংলাদেশের রিজার্ভ ব্যাংক হিসাবে কাজ করবে। বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হিসাবেও বিভাজন থাকবে। পূর্বাঞ্চল থেকে রপ্তানির অর্জিত আয় ঢাকা শাখায় একটি হিসাবে পরিচালনা করা হবে। কর সংগ্রহের বিভাজন একটা জটিল সমস্যা এবং একমত হয় যে আওয়ামী লীগ অন্তর্বর্তী সময়ে এই বিষয়ে বাস্তবসম্মত কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

আওয়ামী লীগ তাদের অর্থনীতি বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগ দিতে চলে যান। বিশেষজ্ঞগণ প্রফেসর নূরুল ইসলামের বাসায় নিয়মিতভাবে সভা করে আসছিলেন। এম, এম, আহমেদ কর্তৃক প্রণীত সংশোধনগুলো আলোচিত হয়। বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ, ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট বিধিবিধান তৈরি করেন। তাছাড়াও উক্ত সন্ধ্যায় পরের সভায় সরকারের নিকট পেশ করার জন্য বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা হয়।

২৩ মার্চের সন্ধ্যায় যখন আওয়ামী লীগ এসব অর্থনৈতিক ধারার উপর আলোচনা আরম্ভ করার জন্য ফিরে আসেন, তখন তারা জানতে পারলেন যে ইয়াহিয়া সারা দিন প্রেসিডেন্ট হাউসের বাইরে থাকবেন। তার ক্যান্টনমেন্ট অবস্থানের ব্যাপারে পীরজাদা কিছু-কিছু সংবাদ উল্লেখ করেন ও পরবর্তী আমালত থেকে দেখা যায় ২৩ মার্চ জেনারেলগণ সভায় ব্যস্ত ছিলেন। আমরা নিশ্চিত জানি এই সময়েই অপারেশন সার্চলাইটের পরিকল্পনার চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয় এবং এর ২ জন প্রস্তুতকারী ঢাকার বাইরে ব্রিগেড কমান্ডারদের নির্দেশনা প্রদানের জন্য ২৪ মার্চ হেলিকপ্টারে ঢাকার বাইরে যান। এ সব পরিস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় পরিবেশ অপ্রতিরোধ্য এবং অর্থনৈতিক ও আর্থিক ধারার ব্যাপারে আওয়ামী লীগের সাথে এম, এম, আহমেদের আলোচনাকে সরকারি পক্ষ দ্বারা শুধু সময়ক্ষেপণের জন্য বিলম্বিত করা হয় এবং সামরিক সমাধানের জন্য সৈন্যদের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়। ২৪ মার্চের আগে

আওয়ামী লীগ এসব অর্থনৈতিক ধারার উপর আলোচনা এবং পুরো খসড়া ঘোষণার প্রতিটি ধারা-উপধারা পড়ে শোনানো সম্পন্ন করে। যখন আওয়ামী লীগ ২৪ মার্চ সান্ধ্য অধিবেশনে যোগদানের জন্য রওয়ানা দেয়, তখন শেখ মুজিব নির্দেশ দেন যে, রাষ্ট্রের নামের জন্য আমরা Confederation of Pakistan এর প্রস্তাব দেব। তিনি নির্দেশ দিলেন আমাদের ব্যাখ্যা দিতে হবে যে জনমত মোকাবিলার জন্য এটা খুবই জরুরি। আংশিকভাবে এতে স্বাধীনতার জন্য জনমতের তীব্রতার প্রতিফলন ঘটে।

যখন এই প্রস্তাব সরকার পক্ষের কাছে পেশ করা হয়, এই যুক্তি দেখিয়ে জোরালোভাবে আপত্তি জানালেন যে আমাদের জন্য এটা একটা মৌলিক পরিবর্তন। আমরা যুক্তি দিই যে নামের পরিবর্তন অর্থহীন। যেহেতু সব ধারা অপরিবর্তিত থেকে গেছে। সুতরাং সীমিত কিন্তু গ্রহণযোগ্য ফেডারেল সরকারের ব্যবস্থা করা হবে। এই যুক্তিকে কর্নেলিয়াস গ্রহণ করেন, কিন্তু বাধা দিলেন ঐ প্রস্তাবে যেখানে কনফেডারেশন এর স্থলে ইউনিয়ন শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তারপর আওয়ামী লীগ এ বলে তার অবস্থান পুনর্বার ব্যক্ত করলেন, যদি একটা শব্দে পার্থক্যের বিষয়ে বিষয়টির সুরাহা না হয়, তবে পরে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার মধ্যের সভায় বিষয়টি মীমাংসা করা হবে, যখন চূড়ান্ত খসড়াটি তাদের বিবেচনার জন্য তাদের নিকট পেশ করা হবে।

আওয়ামী লীগও বুঝতে পারে যে বাইরের পরিস্থিতি খুবই থমথমে। কেননা সৈন্যবাহিনীকে সামরিক শক্তি ব্যবহার করে চট্টগ্রামে এম, ভি, সোয়াত খালাস করার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এবং হাজার হাজার বেসামরিক লোক চট্টগ্রাম বন্দর যাওয়ার পথে তাদের প্রতিরোধ করছে। রংপুর থেকেও মিলিটারি অপারেশনের রিপোর্ট আসে। সৈন্যবাহিনী কর্তৃক প্রচণ্ড আক্রমণ পরিচালনার রিপোর্ট ঢাকায় আসে। অতএব, ধারণা করা হয় যে ২৪ মার্চের সন্ধ্যার সভাই শেষ সভা হবে, যেখানে আলোচনা একটা কাছাকাছি অবস্থানে নিয়ে যাবে, কেননা কৌশলগত আলোচনা আরো দীর্ঘায়ু করার কিছু নেই।

সন্ধ্যায় খসড়ার সব ধারা ও তফশিল পড়ে শোনানোর কাজ সম্পন্ন করা হয়। আমি তারপর পীরজাদাকে বললাম কখন খসড়া চূড়ান্ত করা হবে। আওয়ামী লীগ দলের পক্ষ থেকে প্রস্তাব করা হয় যে, খসড়া চূড়ান্ত করার জন্য ঐ দিন সন্ধ্যায় কর্নেলিয়াসের সাথে আলোচনায় বসি, যাতে করে পরের দিন সকালে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার নিকট পেশ করা যায়। কর্নেলিয়াস রাজি ছিলেন না, এই সন্ধ্যায় আমাদের কিছু আলোচনা রয়েছে আপনি আগামী কাল সকালে সাক্ষাৎ করেন। যখন আমি পরামর্শ দিলাম যে পরের দিন একটা সময় নির্ধারণ করা হবে,

পীরজাদা আবারও এই বলে বাধা দিলেন যে, এটা টেলিফোনে মীমাংসা করা হবে এবং টেলিফোনে তার সাথে যোগাযোগ করতে হবে। পীরজাদা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি মনে করেন কখন ঘোষণা তৈরি করা হবে'। তাতে আমি উত্তর দিলাম যে গতকালের আগের দিন এটা তৈরি করা উচিত ছিল এবং কাজ এগিয়ে যাচ্ছে (চট্টগ্রাম ও রংপুরের অবস্থার কথা আমার স্মরণ হয়ে গেল, যেখানে সৈন্যবাহিনী বেসামরিক লোক ও বাঙালি পুলিশের উপর গুলিবর্ষণ করে)। সময় দ্রুত ফুরিয়ে যাচ্ছে। এই পস্থিতিতিতে তাজউদ্দীন বললেন, আওয়ামী লীগ মনে করে তারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সবকিছুই আলোচনা করেছেন এবং আলোচনা করার আর বেশি কিছু নেই। যা কিছু বাকি রয়েছে তা হচ্ছে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য তাদের নিকট খসড়া উপস্থাপন করা। একবার অনুমোদিত হয়ে গেলে ঘোষণাপত্র প্রণয়ন করা হবে। তাজউদ্দীনের এই বিবৃতির ব্যাখ্যা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আওয়ামী লীগই দরকষাকষি ভেঙে দেয়। প্রকৃতপক্ষে এটা সত্যের ধারেকাছে ছিল না। যেহেতু পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয়েছে, যা দরকার তা হচ্ছে শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়ার জন্য খসড়ার চূড়ান্তকরণ। আমি ২৫ মার্চ সারা দিন টেলিফোন কলের অপেক্ষায় ছিলাম। এই টেলিফোন কলটি কখনোই আসেনি। এমনকি আমি যখন ২৫ মার্চের রাত ১০টা ৩০ মিনিটে শেখ মুজিব থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসি, শেখ মুজিব আমাকে বললেন আপনি অনুরূপ টেলিফোন কল পেয়েছেন কিনা। আমি তাকে আশ্বাস দিলাম, আমি তা পাইনি। ঐ রাতে বাঙালি লোকদের উপর সৈন্যবাহিনী দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হয় এবং গণহত্যা ও রক্তপাত এড়ানোই ছিল আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য এবং দরকষাকষির মাধ্যমে রাজনৈতিক মীমাংসা আরম্ভ হয়।

(বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের ইতিহাস থেকে সংগৃহীত ডকুমেন্টস, তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা)।

রেহমান সোবহান

স্বাধীনতা সংগ্রামে আমার সরাসরি অংশগ্রহণ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পরে। যাই হোক, এক দশকজুড়ে একজন অর্থনীতিবিদ হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে আলোচনা করে আসছি। বাঙালি অর্থনীতিবিদদের প্রায় সকলেই হীনম্মন্যতায় ভুগতেন পাকিস্তানের বুর্জোয়া শ্রেণীর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে কথা বলতে। ১৯৬০ সাল থেকেই আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেছি অর্থনীতির বৈষম্য সম্পর্কে জনসমাবেশে, পেশাগতদের মধ্যে এবং বিভিন্ন পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে যে, দুই পাকিস্তানে বৈষম্যমূলক অর্থনীতি চলছে। এতে মানুষ অবগত হয়েছে এবং আমার সহকর্মীরা ও বিশিষ্টজনরা বুঝতে পেরেছিল পাকিস্তানের শাসন সম্পর্কে।

বাঙালি অর্থনীতিবিদরাই পাকিস্তানের অর্থনৈতিক নীতিমালা তৈরি করেছিলেন সভা, সেমিনার ও কমিটির মাধ্যমে। ১৯৬০ সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণের পক্ষে অংশ নিয়েছিলাম। দ্বিতীয় পর্যায়ে বিষয়টি পর্যালোচনা হয় একই বছরে যখন অধ্যাপক আখলাকুর রহমান, মোশারফ হোসেন এবং আমি এতে যুক্ত হই। প্রথম আর্থিক ব্যবস্থাপনা কমিশনে (১৯৬১ সালে) যেখানে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম এবং আমি উপদেষ্টা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে যোগ দিয়েছিলাম। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আমি, মোশারফ যোগ দিয়েছিল ১৯৫৬ সালে। চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নীতিমালা গ্রহণে সহায়তা করেন অধ্যাপক মাজহারুল হক, নুরুল ইসলাম, আখলাকুর রহমান, আনিসুর রহমান এবং আমি জড়িত ছিলাম ১৯৭০ সালে। এই পরিকল্পনাগুলোতে পূর্ব পাকিস্তানকে আরো সমৃদ্ধ করার ব্যাপারটা থাকত। ১৯৬৯-৭০ সালে একটি সাপ্তাহিকের নিবন্ধে পূর্ব পাকিস্তানের বঞ্চিত মানুষের কথা বলার সুযোগ হয়।

অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সমৃদ্ধির জন্য এই গবেষণা ও অবস্থান বাঙালি অর্থনীতিবিদদের আরো সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানায়। এর মধ্যে কিছু অর্থনীতিবিদ অর্থনীতির বিষয়গুলো নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আলোচনা শুরু করেছিলেন। আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি এর দ্বারাই অনুপ্রাণিত হয় যদিও সচেতনভাবে কোনো অর্থনীতিবিদ এর সাথে জড়িত ছিলেন না। ১৯৬৯ সালে

রাওয়ালপিন্ডিতে গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অধ্যাপক ওয়াহিদুল হককে একটি স্মারকলিপি তৈরি করতে অনুরোধ করেন যা আলোচনা সভায় মতবিনিময় করার জন্য পেশ করা যাবে। ১৯৭০ সালের গ্রীষ্মে অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক আনিসুর রহমান, ড. এ আর খান, ড. স্বদেশ বোস, ড. হাসান ইমাম এবং আমি করাচিতে ডঃ কামাল হোসেনের কাছে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী মেনিফেস্টো জমা দেই। এটা আসলে আমাদের একটা বিশ্লেষণ এবং বিভিন্ন বিষয়ের উপর একটা ব্যাখ্যা প্রদান।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত আমাদের সম্পৃক্ততা ছিল অনিয়ন্ত্রিত। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ব্যাপক বিজয়ের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফার উপর ব্যাপক কাজ করার উদ্যোগ নেন। কেননা এই ৬ দফা নির্বাচনে প্রচারণায় বিশেষ একটা দিক ছিল। তিনি ৬ দফাকে ব্যাপক আলোচনায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন এবং জাতীয় পরিষদে আলোচনার মাধ্যমে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা ও আলোচনা করেছিলেন।

নির্বাচনের মাসগুলোতে বঙ্গবন্ধু সংবিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস নিয়েছিলেন। এই আলোচনাগুলো অনুষ্ঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগের হাই কমান্ড দ্বারা যাদের মধ্যে ছিলেন তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, খন্দকার মোশতাক আহমেদ, ড. কামাল হোসেন, অধ্যাপক সারওয়ার মোরশেদ, অধ্যাপক আনিসুর রহমান এবং আমি তো ছিলামই। এই দিনগুলোতে দীর্ঘায়িত এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হতো বুড়িগঙ্গার পাড়ে একটি বাড়িতে, যাতে মুখ্য ভূমিকা ছিল ড. কামাল হোসেনের। অন্য দিকে তাজউদ্দীন আহমেদ তার বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা দিয়ে অন্যান্য কৌশল নির্ধারণ করতেন। বঙ্গবন্ধুর নিজের অবশ্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল যা এতে আরো সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই সময় এই দলটি সংবিধানের খসড়া তৈরি করে এবং ভবিষ্যতে যে-কোনো ইস্যুতে আলোচনা করতে পারে এমন কৌশল নির্ধারণ করা হয়।

তৎকালীন প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর কোনো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনা যাতে সংবিধানে আসে এবং ৬ দফার ওপর জনমত সংগ্রহে আমি বঙ্গবন্ধু ও তাজ উদ্দীন আহমদকে অনুরোধ করেছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানে অনির্ধারিত সফর করার জন্য ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে। এই সফরের সময়ে আমি আলাদাভাবে লাহোরে পিপলস্ পার্টির নেতা ড. মুবাশশির হাসান, মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরীর সঙ্গে কথা বলি। কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে এবং একতাবদ্ধভাবে কাজ করতে কোনোটাতেই তারা মত দিলেন না। আমি স্বাধীনতার পরে কাসুরীর সঙ্গে কিছু বিষয়

নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখলাম সেই সহায়তা করেছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে ড. কামাল হোসেনকে কারারুদ্ধ অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদ করতে।

যখন আমি লাহোর থেকে করাচি যাচ্ছিলাম তখন ব্যারিস্টার রাফি রেজার সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল, যিনি ছিলেন ভুট্টোর সংবিধান বিষয়ক উপদেষ্টা। তার সঙ্গে আলোচনা করে বুঝলাম, ভুট্টো তার উপর নির্ভর করেছেন জাতীয় সংবিধানের কি হবে। তিনি এতে কিছু কাজ করেছিলেন। ভুট্টো তার আরেক শুভাকাঙ্ক্ষী আবদুল হাফিজ পীরজাদার সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করেছিলেন। ঢাকা আসার পর আমি বঙ্গবন্ধুকে রিপোর্ট করেছিলাম যে, পিপলস্ পার্টি খুবই আগ্রহ দেখিয়েছে সংবিধান সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য।

বিষয়টি পরিষ্কার হয় যখন ভুট্টো ১৯৭১ সালের জানুয়ারিতে ঢাকা সফরে এসেছিলেন। তখন আমি তাজউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি যে, তারা ৬ দফার ওপর পর্যালোচনা করে একটি সাংবিধানিক কাঠামো তৈরি করবে। পিপিপি'র এই সফরে আমি ব্যারিস্টার রফি রেজা, মোবাশশির হাসান এবং অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে, যেমন মেহরাজ মোহাম্মদ খানের সঙ্গে কথা বলি।

আমার ব্যক্তিগত অভিমত হলো, পিপিপি এবং ইয়াহিয়া খান কেউই মার্চ ১ ১৯৭১-এর আগে ৬ দফার ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করতে রাজি নন। পরে আমি জেনেছি, আওয়ামী লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে।

এই সংকটময় মুহূর্তে মার্চের ১ তারিখে আমি কিছু বিষয় নির্দেশ করে একটি ফোরামে লিখেছিলাম। যেখানে ৬ দফার প্রয়োজনীয়তা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের মনোভাব বর্ণিত ছিল। পাকিস্তানের সংকটে ছয় দফাই একমাত্র সমাধান তাই আমি উল্লেখ করেছিলাম। এ পথ বেয়ে গেলে অনেক লড়াই করতে হবে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা এতেই নিহিত। এই সময়ে কিছু বাঙালি পাকিস্তানকে অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। প্রশ্ন হলো, ভাগ হয়ে যাওয়াটা কিভাবে সম্ভব হবে। সাংবিধানিকভাবে নয়, সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পহেলা মার্চের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত করেন, আমার কাছে মনে হলো বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বঙ্গবন্ধুর কথা অনুযায়ী বাংলাদেশের সব স্থান থেকে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। রাজনৈতিক পক্ষগুলো আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে গেল এবং পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ মার্চের ২৬ তারিখে সামরিক বাহিনীকে লেলিয়ে দিয়ে এই ধারণা প্রদান করে যে, এখন সামরিক শাসন চলবে।

সাফল্যজনক অসহযোগ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ গভীর সংকটে এবং অর্থনৈতিক অচলাবস্থার মধ্যে পড়ে। তখন জনবল, প্রশাসন এবং আইন বিভাগ

বঙ্গবন্ধুর ডাকে সাড়া দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মুখোমুখি হয়। এই শূন্যতা অবশ্য সামাজিক জীবনকে ফাটল ধরাতে পারেনি। বঙ্গবন্ধু ধারণা করেছিলেন পাকিস্তানের প্রশাসন ও রাজনৈতিক শক্তি দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান হঠাৎ করে ৬ মার্চ ১৯৭১ সালে সেনাবহিনী তুলে নেন। পলাশির পর বাঙালিরা এই প্রথম তাদের শাসন দেখতে পেল।

এই সময় কিছু অর্থনীতিবিদ উদ্ভট আচরণ করেছিলেন অর্থনৈতিক সংকটের ব্যাপারে। প্রশ্ন দেখা দেয় পশ্চিম পাকিস্তান থেকে রেমিটেন্স, মুদ্রার অপ্রতুলতা বা সরবরাহ না থাকা, রপ্তানি বাণিজ্য সম্পর্কিত বিনিময় কার্যক্রম ও কাঁচামাল এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় আমদানির ব্যাপারে সংকট সৃষ্টি হয়।

ধানমণ্ডি ৩২ নম্বর রোডে অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বাড়িতে শেখ মুজিবের সরকারের অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম শুরু হয়। সার্কিট হাউস রোডে ড. কামাল হোসেনের বাড়িতে প্রশাসনের তৃতীয় কেন্দ্র হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে। আমাদের মধ্যে প্রশাসন ও ব্যাংকারদের মধ্যে কেউ-কেউ দেখা করতেন অধ্যাপক নুরুল ইসলামের দ্বারা সংকটের সুরাহা করতে। এরপর তারা কর্মক্ষেত্রে সেই নির্দেশমতো কাজ করে যেতেন। প্রত্যেক দুপুরে বার্তা প্রেরণ করা হতো তাজউদ্দীন আহমেদ ও ড. কামাল হোসেনের মাধ্যমে, সেই ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে নয়তো ড. কামাল হোসেনের বাড়ি থেকে।

চলমান দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে বিদেশী সংবাদ মাধ্যমকে অবহিত করা হতো। প্রতিদিন আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা তথ্য সংগ্রহ করে পরিস্থিতি তার দেশের পাঠকদের কাছে তুলে ধরত। যেমন: Tilman এবং Pegg Durdin ছিলেন "New York Times", Sydney Schanberg I 'New York Times` যিনি স্বাধীনতা যুদ্ধও কভারেজ করেছিলেন এবং তিনি পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বহিষ্কৃতও হয়েছিলেন। তিনি পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী হন। আরো ছিলেন Peter Preston (বর্তমানে সম্পাদক) এবং Mortin Adeney-Guardian, Peter Hazelharst - Times, Seling Horrison - Washington Post, Henry Bradsher-Washington Star. এই সকল অভিজ্ঞতালব্ধ সাংবাদিক প্রত্যেকে সংবাদ সংগ্রহ করে দেশের পরিস্থিতি নাটকীয়ভাবে তার দেশের কাছে উপস্থাপন করতেন।

Peter Hazelthart বলেছিলেন, কিছুদিন আগে তিনি ভুট্টো সাহেবের সঙ্গে লারকানায় কথা বলেন। ভুট্টো বলেছেন, এই বাংলাদেশে আলোড়নটা হলো শহরে কিছু নেতার চায়ের কাপে ঝড়ের মতো। সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের মানুষদের হত্যাযজ্ঞ করে এবং রাজনৈতিক নেতাদের জেলে ঢুকিয়ে এমন এক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যাতে আলোচনায় বসতে হয়। আসলে এই ধরনের উদ্ভট চিন্তা ভুট্টো-ইয়াহিয়া

খানের সঙ্গে মিলিতভাবে করেছিলেন যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের মার্চে সেনাবাহিনী লেলিয়ে দেওয়া হয়। এই সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর কর্নেল ইয়াসিন এবং টি. এন্ড. টি. বিভাগের মি. এন. হুদা ছিলেন অধ্যাপক নূরুল ইসলামের ভায়রাভাই। তারা প্রায়ই অধ্যাপক নুরুল ইসলামের বাসায় আসতেন। ইয়াসিনের কাজ ছিল পাকিস্তানি সৈন্যদের ঢাকায় সরবরাহ করা। এমনকি তাদের খাবারও সরবরাহ করা তাদের দায়িত্ব ছিল। এভাবে তালিকা পাস করতেন কোনো পার্টির সেচ্ছাসেবক যে পরে সরবরাহ পদির্শন করতো এবং শাস্তি স্বরূপ ক্যান্টনমেন্টে তার সরবরাহ বন্ধ করে দেয়।

এর পরে যখন সেনাবাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ দেশে ঢুকে পড়ে তখন ইয়াসিন এবং হুদাকে তুলে নেয়া হয়। হুদাকে গ্রেফতার করা হয় এবং শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে তাকে জেরা করে অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও আমার সাথে সম্পর্কে জানতে চায়? ভারতের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা কি সহায়তা করে দিয়েছে, তার মধ্যে স্বীকার করতে বলা হয়, আমরা এসব কাজে জড়িত। প্রতারণার অশ্রয় নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করা হয়। তার বিরুদ্ধে ট্রায়াল শুরু হয় ১৯৭১ সালেই।

কর্নেল ইয়াসিনের অদৃষ্ট ছিল মন্দ। তিনিও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন এবং তাকে করাচিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তাকেও শারীরিক নির্যাতন চালানো হয় বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য। এই দুইজন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ও আমার বিপরীতে শারীরিক নির্যাতন ভোগ করেন।

যখন ইয়াহিয়া এবং মুজিবের মধ্যে আলোচনা চলছিল তখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ছিলেন নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং কামাল হোসেন। তারা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলেন ইয়াহিয়ার দলের সদস্যদের সঙ্গে সংবিধান সম্পর্কে। সেই দলে ছিল মেজর জেনারেল পীরজাদা, বিচারপতি কর্নেলিয়া, এম এম আহমেদ। আমরা এর পরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে বসে কিছু নোট নিয়েছি যা ইয়াহিয়া দলের তৈরি এবং আমরাও কিছু অবদান রাখছিলাম। যেন আলোচনাটা ফলপ্রসূ হয়। এই আলোচনাটা বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল। একটি আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো ডঃ কামাল হোসেনের চেম্বারে অর্থাৎ 'কোটিহিলে'। এখানে আওয়ামী লীগের নেতারা সারারাত ধরে ঠিক করেছিলেন চূড়ান্ত আলোচনায় কী হবে? আমাদের শেষ আলাপচারিতা হয়েছিল এম. এম. আহমেদের সঙ্গে একটি লিখিত বিবৃতি নিয়ে। শেষ পর্যন্ত ইয়াহিয়ার দলের অর্থনৈতিক এজেন্ডা অন্তর্ভুক্ত করে আলোচনা শেষ হয়। এর ব্যতিক্রম ছিল ২৪ মার্চ জেনারেল পীরজাদার এই আলোচনা সম্পর্কে সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচারিত। ২৫ তারিখের পরের রাতে এম. এম. আহমেদ পশ্চিম পাকিস্তানে

চলে যান। পীরজাদা ঢাকার কাজ শেষ করবেন বিধায় বিচারপতি কর্নেলিয়াসও ঢাকা ছেড়ে চলে যান। অবশ্য এই আলোচনায় আমার মতামত সম্পর্কে ASIAN REVIEW তে লিখেছিলাম যা আজ পর্যন্ত রেকর্ড হয়ে আছে। ডঃ কামাল হোসেন অবশ্য আলাদাভাবে তার অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

এই আলোচনার পক্ষগুলো অত্যন্ত টেনশনের মধ্যে তাদের কার্যকলাপ চালায়।

মার্চের তৃতীয় সপ্তাহে আমাদের এক বন্ধু মঈনুল হাসান আমাকে বলল, বঙ্গবন্ধুকে একটা খবর দিতে হবে যা সংগ্রহ করা হয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে। সে এ-সময় কিছুই বলল না কিন্তু পরে তিনি বলেছিলেন, খবরটি তিনি পেয়েছেন এয়ার ভাইস মার্শাল খন্দকারের কাছ থেকে যিনি পাকিস্তান বিমান বাহিনীতে কর্মরত। আমি সকাল ১০টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে তাকে নিয়ে গেলাম। সে যখন এই খবরটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল তখন সেখান দিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা যাচ্ছিলেন ধর্মঘটের কারণে। বঙ্গবন্ধু খবরটি নোট দিলেন এবং বললেন ব্যাপারটা তিনি জানেন।

দুপক্ষের আলোচনার সময় আমার সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কয়েকজন নেতার দেখা হয়েছিল। গাউস বক্স হলো বেলুচিস্তানের। এই আলোচনার সময় দৈনিক সংবাদের সম্পাদক আহ্‌মেদুল কবির সাহেব উপস্থিত ছিলেন। ওয়ালী খান ও বক্সের মতামত হলো, ইয়াহিয়া খান, মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে আলাপ হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট রাজ্য বা প্রদেশ নিয়ে। পাঠান এবং বেলু চিদের নিয়ে।

২৫ মার্চের বিকেলবেলা আমি মাজহার আলী খান (পিতা-তারিক আলী) এবং একজন বিশিষ্ট সাংবাদিককে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে গেলাম। এই সময় বাড়িটি ছিল অবরোধ করা বিভিন্ন সাংবাদিক দ্বারা।

মাজহার আলী খান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ায় আমি তাকে নিয়ে গিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে সব সময় ভিড় থাকতো। পাকিস্তান টাইমসে থাকার সময় থেকেই মাজহারকে বঙ্গবন্ধু চিনতেন। যখন মিয়া ইফতেখার উদ্দিন এটি চালু করেছিলেন। খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাগত জানালেন। বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে একটি ফাঁকা ঘরে নিয়ে আসলেন এবং বললেন, 'সেনাবাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়েছে ক্র্যাকডাউন করবে'। আমি আমার স্মৃতি থেকে লিখছি, তিনি আরো বললেন, ইয়াহিয়া মনে করেন আমাকে মেরে পতন ঘটাবে। কিন্তু এই যদি মনে করে থাকে তাহলে ভুল করবে। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবে আমার কবরের উপর। বঙ্গবন্ধু নিয়তিবাদী চরিত্রের লোক ছিলেন, মৃত্যু তার কাছে ব্যাপার ছিল না। তিনি মনে করতেন নতুন প্রজন্ম স্বাধীনতার লড়াই এগিয়ে নিয়ে যাবে। এই আলাপের পর মাজহার আলী খান বের করতে চেষ্টা করলেন কেন কিছু coo নেতা আসন্ন রক্তস্নানের কথা বলছে। ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর বাড়ি থেকে বের হয়ে আমরা হোটেল

ইন্টারকন্টিনেন্টালে গেলাম মাহমুদ আলী কাসুরীর সঙ্গে দেখা করতে। তার কণ্ঠস্বরের জোরের চাইতে আরো উঁচু গলায় তিনি বললেন, 'আওয়ামী লীগ কোনো সিদ্ধান্তে আসলো না।' আমার মনে হয় একটি খসড়া তৈরি হয়েছিল যা সংবাদ মাধ্যমে খুব শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। কিন্তু তারপরও আমি বললাম আপনি এ খবর কোথায় পেলেন। মাহমুদ খান আমাকে বললেন, জেনারেল পীরজাদা তাকে এ-কথা বলেছেন। আসলে পূর্ব পাকিস্তানিরা এ-রকম কাহিনী প্রচার করলে সেনাবাহিনীর ক্র্যাকডাউনে সুবিধা হবে। কাসুরী আসলে বলতে চেয়েছিলেন দুই পাকিস্তানের একতা রক্ষার্থে রক্ত ঝরতে পারে। যেরকমভাবে Lincoln যুদ্ধ করেছিল একতার কথা বলে। আমি কাসুরীর কাছ থেকে বেরিয়ে আসার সময় মনে হলো সেই Bartrand Russel যুদ্ধকালীন অপরাধের ট্রাইবুনাল যেমন ছিল আমেরিকার সঙ্গে ভিয়েতনাম।

এরপর আমি সার্কিট হাউসে কামাল হোসেনের বাড়ির রাস্তা অতিক্রম করার সময় দেখলাম সেনাবাহিনী আক্রমণ করবে বিধায় আওয়ামী লীগের কর্মীরা রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়েছে। রাত ৯টা থেকে ১০টার দিকে প্রথম স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আওয়াজ শুনলাম যা ইপিআর ও পুলিশ ব্যারাকে আঘাত হানছে। আমি সরাসরি বঙ্গবন্ধুর বাসায় ফোন করলাম তিনি কেমন আছেন জানতে। আমি জানি না কে ফোন তুলেছিল। কিন্তু কণ্ঠস্বর শুনে মনে হলো তিনি আছেন। এর পরে আর উত্তর এলো না। ফোনের সকল লাইন ডেড হয়ে গেল।

পরের ৩৬ ঘণ্টা আমরা বিভিন্ন গোলাবারুদের ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের আওয়াজ শুনলাম এবং দূর থেকে আগুনের শিখা দেখলাম এবং ২৬ তারিখে ইয়াহিয়ার ঘোষণা শুনলাম। আমরা সকলে বুঝলাম স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হয়েছে। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম যে, এর শেষ আছে।

পরবর্তী ৩৬ ঘণ্টায় আমি বাসায় আটকে থাকলাম এবং টেলিফোন লাইন কেটে দেয়ার কারণে পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংসতা সম্পর্কে জানতে পারলাম না। ২৭ মার্চের সকালে কারফিউ শিথিল করলে আমি কিছু কারণে Ford Foundation-এর সামনে গেলাম যেখানে Deniel Thoner যিনি Sorborne এ Pakistan Institute of Development Economics থেকে এসেছিলেন, তিনি থাকতেন। আমি তাকে বললাম ধানমণ্ডির দিকে গাড়ি নিয়ে যেতে। কারণ, নুরুল ইসলাম ঠিক আছেন কিনা। যখন আমি বাসায় ফিরে এলাম দেখি মঈনুল হাসান এবং মি. এ. আলম যিনি পাকিস্তান টোব্যাকো কোম্পানিতে ছিলেন আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ময়েদুল চাচ্ছিল আমি যেনো বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। কারণ, পাকিস্তান সেনাবাহিনী অকাতরে মানুষ মারছে। তিনি কামাল হোসেনের সাথে যোগাযোগ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু জানতে পারেন পাকবাহিনী তাকে ধরার জন্য বাসায় গিয়েছিল কিন্তু ধরতে পারেনি।

আমি মনে করেছিলাম আমি পাক বাহিনীর দৃষ্টিতে পড়বো না। কারণ, পাক বাহিনী যাদেরকে ধরছে যারা রাজনীতির সাথে যুক্ত। তবুও মঈনুল আমাকে সতর্ক করে দিলো। আমি ঘর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। ঘর ছাড়তে আমি নারাজ ছিলাম, যে আমার এবং আমার পরিবারের কিছুই হবে না। কিন্তু আমার স্ত্রী-পরিবারের বিপন্ন হতে পারে। তাই সে আমাকে বাড়ি ছাড়তে বলল এবং ঢাকা ছেড়ে অন্যস্থানে গিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবদান রাখতে বলল।

প্রচুর অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি আমার পরিবারের কারণে গুলশানের অন্য বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। মুয়ীদ আমাকে বলল যে, সে আজ দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে গিয়েছিল। সেখানে পাক বাহিনী নৃশংসভাবে সবাইকে মেরেছে। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক ও অধ্যাপক আনিসুর রহমানকে দখলদার বাহিনী ধরে নিয়ে যায়, অপজিটে জগন্নাথ হলের ফ্লোরে রক্তের নদী বয়ে যায়। সিঁড়ির ধাপগুলোও রক্তে ভেজা এবং যেন মনে হয় মরু প্রান্তর রিপোর্ট পাওয়া গেছে অধ্যাপক রাজ্জাক ইতিমধ্যে নিহত হয়েছেন। খবরটি শুনে আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়লাম, শুধুমাত্র আমার বন্ধু বলে নয়, এমন একজনকে হত্যা করা হয়েছে যে এগুলোর সাথে জড়িত নয়।

২৭ মার্চের রাতটা এমনভাবে কাটালাম, মনে হলো আমি রিফুজি। পরদিন সকাল বেলা মুয়াদ আমাকে দেখতে আসলো এবং রিপোর্ট দিল বিকেলে কারফিউ উঠানোর পর আমার বাসায়.পাক বাহিনী আসে আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য। পরে আমি জেনেছি আমার স্ত্রীর কাছে দুই ট্রাক ভর্তি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্য এসেছিল। এর নেতৃত্ব দিয়েছিল কর্নেল সাঈদ উদ্দিন। এই কর্নেল যে বঙ্গবন্ধুকে ধানমণ্ডির ৩২ নাম্বার থেকে ২৫ মার্চের রাতে গ্রেফতার করে নিয়ে এসেছিল।

আমার ছোট ছেলে তাইমুর (৮ বছর), পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন এসেছিল সে তখন কর্নেল সাঈদ উদ্দিনকে আমার কাছে কেন এসেছে তা জিজ্ঞেস করেছে এবং সৈন্যদের বন্দুকের সামনে বলেছে, তাকে ধরে নিয়ে যেতে। তখন তার চেহারায় রক্তিম ভাব ফুটে উঠেছিল। আমার স্ত্রী সালমা শুনেছে এক দল সৈন্য আমাদের বাসার সামনে এসেছে এবং সে ভয় পেয়েছিল তাইমুরের জন্য। সে দ্রুতবেগে বাড়ির পিছনে যাওয়ার চেষ্টা করে পারেনি সৈন্যদের বন্দুকসহ ঢোকার কারণে। কর্নেল সাঈদ উদ্দিন আমাদের প্রতিবেশীদের আমার অবস্থান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তখন সে জানলো যে, আমি সকালেই বাসা ছেড়ে চলে গেছি। তখন আমাকে না পেয়ে তারা আমার স্ত্রী এবং সন্তানকে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেয়, আমাকে পাওয়া যাবে ভেবে। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশীদের আপত্তির কারণে তারা স্ত্রী ও সন্তানকে ছেড়ে যায়।

এই খবরে আমি বুঝলাম যে, সামরিক অভিযানের প্রথম ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আমাকে ধরার চেষ্টা করেছে বিধায় আমি তালিকাভুক্ত হয়েছি। মুয়ীদ আমাকে

উপদেশ দিলো, তুমি ঢাকা ছেড়ে চলে যাও। কারণ, বাড়ি বাড়ি তল্লাশি করা হচ্ছে, তাতে কেউ কোথাও তোমাকে আশ্রয় দেবে না। এই সময়ে আমার যুদ্ধে ভূমিকা কি হবে। আমি আমার স্ত্রীর নামে চিরকুট লিখলাম যে তোমরা ঢাকা ছেড়ে চলে যাও, তাহলে আমি স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ভালোভাবে কাজ করতে পারব।

ঢাকা ছাড়ার প্রস্তুতির সময় মুয়ীদ আমাকে গুলশানে মোকলেসুর রহমানের (সিধু মিয়া) বাড়ি নিয়ে গেল। সেখান থেকে আমি নদী পার হয়ে বেরাইদ গ্রামে রওয়ানা হই। গ্রামটি সিধু মিয়ার শ্বশুরের। আমি অনেক লোকের সঙ্গে মাঠের উপর দিয়ে হেঁটে গ্রামে পৌঁছলাম। বহু লোকের ভিতরে আনিসুর রহমানকে দেখে এগিয়ে গেলাম। তার থেকে শুনলাম তার অভিজ্ঞতার লোমহর্ষক ২৫ ও ২৬ মার্চ। সে বলল কিভাবে পাক হানাদার বাহিনী আক্রমণের উদ্দেশ্যে তাদের ব্লকের ফ্লাটে এলো এবং গুলি করে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতা, (ইংরেজী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) তিনি থাকতেন একতলায় এবং অধ্যাপক মুনিরুজ্জামান, পরিসংখ্যান বিভাগের, সেই শিক্ষক থাকতেন উপরের তলায়।

অধ্যাপক রাজ্জাক ছিলেন। কিছু পাকিস্তানি সেনা দরজায় প্রচণ্ড আঘাত করতে শুরু করলে তারা কিছুটা সময় নিয়েছিলেন দরজা খুলতে। পাকিস্তানি সৈন্যরা মনে করেছিল যে ঘরে কেউ নেই। আনিস দুরাত এবং একদিন কাটিয়েছে তার ফ্লাটে উবু হয়ে মেঝেতে শুয়ে। স্ত্রী এবং দু কন্যাসহ সেনাবাহিনীর সদস্যরা সিঁড়ির উপর নিচ করেছে মৃতদেহকে টেনে হেঁচড়ে নেয়ার জন্য।

বেরাইদ গ্রামে আমরা আসলাম মি. মতিনের বাড়িতে, যেমন: জামিল চৌধুরী ও তার পরিবার, মোকাম্মেল হক, মি. মতিন ও তার পরিবার, ঢাকা টেলিভিশনের মোস্তফা মনোয়ার। বেরাইদে আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হয় যে, আমি পাকিস্তান আর্মির অন্যতম টার্গেট। আমাদের ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে পালিয়ে যাওয়া উচিত এবং ফেরত আসা উচিত আন্তর্জাতিক সমর্থন নিয়ে।

২৯ মার্চের সকাল বেলা আনিসুর রহমান, মোস্তফা মনোয়ার এবং আমি, মি. মতিনের আত্মীয় মি. রহমত উল্লা এবং মি. রশিদের সাথে যিনি এলাকার একজন শিক্ষক আগরতলা পাড়ি দেয়ার জন্য রওয়ানা হই। নদীর সীমানার সেখানে সিধু মিয়া ও মুয়ীদকেও দেখতে পাই।

আমরা শীতলক্ষ্যা নৌকা দিয়ে পাড়ি দেই নরসিংদীর কাছ দিয়ে। সকল পথেই আমি পার হয়ে আসি ঢাকা মানুষের সঙ্গে। নরসিংদীতে আমরা দুপুরের খাবার খাই নদী পার হয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার জন্য। আমরা দেখলাম ঢাকা থেকে আগত মনোবল ভেঙে যাওয়া অনেক লোকজন। আমরা গুজব শুনতে পেলাম চট্টগ্রামে প্রতিরোধ শুরু হয়েছে কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো কিছুই চোখে পড়ল না, যাতে বোঝা যায়

প্রতিরোধ হচ্ছে। প্রথম আমরা নিদর্শন দেখতে পাই বাংলাদেশের পতাকা উড়ছে একটি লঞ্চে যা মেঘনা নদী থেকে যাত্রী নিয়ে নরসিংদী পৌঁছে দিচ্ছে।

কিছুক্ষণ পরে আমরা লঞ্চটিকে দেখলাম নদীর তীরের দিকে টেনে নেয়া হচ্ছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে অনেক দূরে। এখানে কিছু ছাত্র আমাদের অনুরোধ করল এবং বলল লঞ্চে উঠে আসতে। এই সময়ে আনিস এবং আমি ভয় প্রকাশ করলাম না কারণ পাকিস্তানি গুপ্তচর হয়তোবা এই জনসমাবেশে থাকতে পারে। আমরা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ছিলাম আমাদের পরিচয় প্রকাশ করতে। সম্ভাব্য ঘটনা ঘটলো তীরে। এখানে তীরে কিছু লোক আমাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিল। এই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার করে মোস্তফা মনোয়ার কিছু উপস্থিত বুদ্ধি দিয়ে বলেছিলেন, আশপাশে কোনো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আছে নাকি তাহলে তারা এসে তাদের শিক্ষককে চিনতে পারবে।

আনিস এবং আমি সংগ্রাম পরিষদের নেতার কাছে যাওয়ার আগে আমাদের পরিচয় প্রকাশ করলাম না। কারণ, আশপাশে হামলা করার লোক থাকতে পারে। এই সময়ই Oxford University Press এর পিয়ন আমাকে দেখে চিনতে পারে এবং এমন চিৎকার করে যে জনসমাবেশ তা শুনতে পারে। এর পরে আমরা স্থানীয় স্কুলে যাই। সেখানে সংগ্রাম পরিষদের এক আওয়ামী লীগের নেতা ও অন্যরাও ছিলেন। এবার আমরা আমাদের পরিচয় দিলাম। তারপরও পরিচয় পরিষ্কার হলো না, কেউ কেউ আমার নাম শুনেছে বটে তবে চিনতে না পারার কারণে আমরা সাধারণ মানুষের মধ্যে রইলাম। এ সময় আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা বের হয়ে যাবো এবং জনসমাগমে গিয়ে প্রমাণ নিয়ে আসবো। যখন আমরা বের হয়ে যাচ্ছি তখন মুকদাতা আনিসের সরাসরি ছাত্র এবং আমারও অর্থনীতির ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং তার ভাই মোফাখখের, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের সঙ্গে দেখা হলো। এরা পাশের গ্রামে থাকতো। যখন মোস্তফা মনোয়ারের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র খোঁজাকে কেন্দ্র করে কিছু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সেখানে উপস্থিতি হলো।

যখন আমাদের পরিচয় প্রকাশ হলো তখন গ্রামে সম্মানিত ব্যক্তি বলে গণ্য হলাম। আমরা তখন স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতার বাড়ির দিকে রওয়ানা দিলাম। এই সময়ে খবর ছড়িয়ে পড়ায় অনেক লোক সেখানে জড়ো হলো। আমাদের খবর ছড়িয়ে পড়ল কিন্তু আমাদের নামহীনতা তখনও অব্যাহত ছিল বলেই আমরা রওয়ানা হতে পারলাম।

আমরা স্থানীয় নেতাকে বললাম গ্রামের জনগণ যেন এ সময় সতর্ক থাকে। পাকিস্তানি অন্তর্ঘাতক ও প্যারাসুটের সাহায্যে বিমান থেকে অবতরণকৃত সৈন্য থেকে। স্থানীয় জনসাধারণের কাছে অস্ত্র ছিল। তাই নিয়ে প্রস্তুত ছিল সতর্ক প্রহরাসহ। আমাদের খরচেই সাধারণ অস্ত্র নিয়ে লড়তে হবে। গ্রামের লোকজন চার সপ্তাহ যাবৎ

সুচারু ও সুন্দরভাবে স্বেচ্ছায় মানুষের আগ্রহ রয়েছে সশস্ত্র প্রতিরোধে। স্থানীয় নেতারাই এ জনসাধারণকে অনুপ্রাণিত করেছেন।

মুক্তা এবং মোফাখখের আমাদের নিয়ে গেল তাদের গ্রামে। মোফাখখের তাই অধ্যাপক নোমানের কাছে, বর্তমানে তিনি ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ। সেখানে সিদ্ধান্ত হলো আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে থাকবো এবং গভীর রাতে ভ্রমণ করব। কেননা আমরা উপলব্ধি করলাম নদীতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী টহল দিতে পারে। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া যাওয়ার উদ্দেশ্যে নৌকা ভাড়া করলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল মুক্তা, মোফাখখের এবং তার বড় ভাই মোহাদ্দেস যিনি রেডিও পাকিস্তানে ছিলেন। আমরা রশিদ ও রহমত উল্লাহ থেকে বিদায় নিলাম। তাদের বললাম যে, আমাদের বাসায় যেন খবর পৌঁছে দেয়া হয়।

৩০ মার্চের সকাল পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া ছিল মুক্ত অঞ্চল। ব্রাহ্মণবাড়িয়া তখন মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। আমাদের কিছু লোকজনের সাথে দেখা করার সুযোগ হলো। ঐ দিন দুপুরে আমরা তিতাস গ্যাস রেস্ট হাউসে বিশ্রাম নিলাম। এই প্রথম বেঙ্গল রেজিমেন্ট-এ খালেদ মোশারফের সঙ্গে পরিচয় হলো। তিনি আমাদের বললেন, কিভাবে পাকিস্তানি কমান্ডারকে আটক করা হয়েছে এবং স্বাধীন ব্রাহ্মণবাড়িয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করছে।

মেজর মোশাররফ আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিরোধ ব্যবস্থা দেখাতে এবং রাতে আমাদের তিনজনকে নিয়ে গেলেন টিয়াপাড়া চা বাগানে যেখানে তিনি ছিলেন। পাকিস্তানের সৈন্যদের আকাশ থেকে আক্রমণ ঠেকাতে আগে থেকেই সতর্কভাবে পুরো এলাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল। বাগানের ম্যানেজারের বাংলোর সকল লাইট ব্ল্যাকআউট করা হলো। সেখানে সমবেত সৈন্যদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং আমাদের জানালেন কুমিল্লা ক্যান্টনমেন্টে কিভাবে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ হয়েছে। তিনি বললেন অন্যান্য এলাকা থেকে কোনো ক্লোজ যোগাযোগ করা যাচ্ছে না এবং তার সংকেতের অল্পই উত্তর আসছে এবং রেডিওতে চট্টগ্রামের খবর দিচ্ছে।

আমরা সেই রাতে চা বাগানে রেডিওতে শুনলাম বাঙালিরা টাকা সংগ্রহ করছে অস্ত্র সংগ্রহের আশায়। মোশাররফ বললেন যে, আমাদের সীমানা পেরিয়ে যেতে হবে এবং সেখানে অনুরোধ জানাতে হবে। আরো অস্ত্রের জন্য এবং প্রবাসী বাঙালিরা সেখানে আছে যেখানে আর্থিক সহায়তা করতে হবে। মোশাররফ বুঝতে পেরেছিলেন, যদি মুক্তিযোদ্ধারা অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ না পায় তাহলে তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে। তিনি আবার বললেন, আমি এবং আমার অফিসাররা একটা রাষ্ট্রের অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ ঠেকাতে পারব না। তাদের সামরিক প্রশাসন থেকে

নির্দেশ দরকার। তিনি আমাকে সাজেস্ট করলেন যে, সার্বভৌম সরকারের নামে যে সকল অফিসার ও মানুষ বাঙালি রেজিমেন্ট আছে তাদের সকলকে বাংলাদেশ সর্বাঙ্গীন হওয়ার পর রিকমিশন্ড সেনাবাহিনীতে নেয়া হবে। খালেদ তো জানে না যে, আমি সংবিধান তৈরিতে অবদান রেখেছিলাম তবু আমি বললাম যদি কোনো নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে দেখা হয় তাহলে অবশ্যই এই ব্যাপারটা বলবো। অবশ্যই আমরা তাদের কাছে দায়বদ্ধ যারা নিজের ও পরিবার ছিন্ন করে দেশ মাতৃকার টানে লড়াই করে যাচ্ছে।

৩১ মার্চ সকালবেলা মোশাররফ বললেন, জিপে করে তিয়াপাড়া সীমান্তে আগরতলায় আপনাদের পৌঁছে দেই। বর্ডারে গিয়ে দেখলাম সীমান্তে স্রোতের মতো মানুষ যাচ্ছে এবং মানুষ যাচ্ছে ঝুঁকি ব্যতিরেকে।

আগরতলায় গিয়ে জানতে পারলাম, বাংলাদেশের একটি বড় দল স্টেডিয়ামে আছে। সেখানে গিয়ে আমাদের দেখা হলো এম. আর. সিদ্দিকী, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, অন্যান্য আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য, ছাত্র এবং কর্মীদের সাথে যারা নোয়াখালী, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা থেকে এসেছে। এম, আর, সিদ্দিকী এবং ঠাকুর দুপুরে দিল্লি থেকে উড়ে এসেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে। তাকে বলতে যে কি ধরনের নৃশংস অবস্থা চলছে এবং অনুরোধ করতে, এমন ব্যবস্থা নিতে যাতে প্রতিরোধ আসে। আমি সিদ্দিকীর কাছে শুনলাম তার কাছে কোনো তথ্য নেই- আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মারা গেছেন না জীবিত আছেন। তিনি ব্যক্ত করলেন চট্টগ্রামে সংগঠনের কথা, ঢাকায় ব্যাপক ম্যাসাকারের কথা এবং দেশের মানুষ কিভাবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে। অধ্যাপক রায় আমাদের নিয়ে গেলেন মি. পি. এন. হাকসাবের কাছে যিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সহকারী ছিলেন, তার কাছেও সব ব্যাখ্যা করা হলো।

আমরা ঠিক বুঝতে পারছিলাম না ভারতীয় সরকার কতটুকু হাত বাড়িয়ে দেবে। এই রকম মনোভাব নিয়ে আমরা দিল্লি এসে পৌঁছলাম। তাজউদ্দীন আহমেদও ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামকে নিয়ে দিল্লি এসে পৌঁছেছেন এবং তারাও আরো গভীরভাবে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তিনি বললেন, তিনিও সঠিক জানেন না তাঁর সহকর্মীরা জীবিত আছে কিনা। আমি তাজউদ্দীন আহমেদের কাছে আমার আসার ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিলাম। তিনি বললেন, তিনি, আমিরুল ইসলাম ও কামাল হোসেন ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসায় গিয়েছিলেন। এর পরই রিপোর্ট আসে সেনাবাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে। তারা বঙ্গবন্ধুকে বললেন, তাদের সাথে নিরাপদ জায়গায় যেতে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তাদের সাথে যেতে চাননি এবং তাঁদের উপদেশ দেন আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যেতে। এরপর তাজউদ্দীন আহমেদ ও আমিরুল ইসলামের সঙ্গে ড. কামাল হোসেন আলাদা হয়ে যান। ধানমণ্ডিতে লুকিয়ে পড়েন,

এরপর যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাজউদ্দীন এবং ইসলাম তাদের পথে কুষ্টিয়া রওয়ানা হন।

আমরা এরপর একসাথে দিল্লিতে মর্মাহত হয়ে শুনলাম ডঃ কামাল হোসেনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এরপরই খবর শুনলাম আওয়ামী লীগের একজন নেতা সীমান্ত ক্রস করেছেন। তাজউদ্দীন আহমেদ সীমান্তের দিকে গেলেন সহকর্মীকে দেখার জন্য। তাজউদ্দীন আহমেদ চিহ্নিত ছিলেন এবং তার কাছেই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের নেতৃত্বদানের কথা ছিল।

সরকারের একটা ঘোষণা শুনে আমাদের মনে হলো এটা স্বাধীন সরকারের বা স্বাধীনতা ঘোষণার খসড়া। এই স্বাধীনতার ঘোষণা বঙ্গবন্ধুর অনুমতিতে যা প্রচার হয়েছিল চট্টগ্রামে বেতরে, প্রথমে ঘোষণা করেন আবদুল হান্নান আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে এবং পরে মেজর জিয়াউর রহমান—এই ছিল স্বাধীনতার ব্যাপারে মূল ঘোষণা।

আমি তাজউদ্দীন আহমেদকে নিয়ে একটি স্বাধীনতা ঘোষণা তৈরি করলাম অতীতের পটভূমি দিয়ে এবং বাংলাদেশের যে গণহত্যা হচ্ছে তা নিয়ে।

আমি, তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ইসলাম বিবিসি থেকে শুনলাম ইয়াহিয়া খানের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমেদ ওয়াশিংটনের কাছে সাহায্য চাইছে এবং কনসোর্টিয়ামের কাছে সাহায্যের জন্য বলেছে। তাজউদ্দীন আহমেদ অনুরোধ করলেন যে, এটা দিয়ে পাকিস্তানের লাভ হলেও বাংলাদেশের ক্ষতি হচ্ছে। আমি মতামত দিলাম তাজউদ্দীন আহমেদকে যে, এখনই লন্ডন ও ওয়াশিংটনে গিয়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বলবে এবং ঘোষণা দেবে, যে-কোনো পরিস্থিতিতে তারা বাংলাদেশের পক্ষে থাকবে। আমার উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে কিছু বিশিষ্ট নাগরিক বসবাস করেন, তাদের সহায়তায় বাংলাদেশের ইস্যু তুলে ধরার চেষ্টা করব।

মার্চ-এপ্রিলের মধ্যে আমি লন্ডনে যাই। যখন আমি লন্ডনে পৌঁছি, আমি জানতে পারি যে, আমার স্ত্রী এবং সন্তান পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে গেছে এবং এরা আমার স্ত্রীর বোনের কাছে জর্দানে আছে। এই সংবাদটি আমার চিন্তা দূর করল, তাতে আমি আরো স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য অবদান রাখতে পারি। লন্ডনে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে দেখা করি। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন। তিনি লন্ডনে এই সময়ে ছিলেন এবং তারাই কয়েকজন লন্ডনে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ ও গণহত্যা সম্পর্কে বলেছিলেন। তিনি এই গণহত্যা বন্ধ করতে এবং পাকিস্তানের পক্ষে মার্কিন সাহায্য দেয়ার পক্ষে পুনরায় চিন্তাভাবনা করতে আহ্বান জানান। যে সব আমেরিকান ২৬ তারিখের পর বাংলাদেশে অবস্থান করছিলেন তারা তথ্যাদি ও চিঠি লিখে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।

এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে আমার পুরনো কিছু বন্ধু সিনেটরের নেতৃত্বে এক চা চক্রের আয়োজন করেন, যাতে এম এম আহমেদ তার মতামত প্রকাশ করেন পাকিস্তান সম্পর্কে। তিনি কিছুটা নিজ পক্ষে নিলেও আমাদের বন্ধুরা বুঝতে পারেন।

ডেমোক্রেটিক পার্টির পক্ষে চার্চ এবং কেনেডি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি যারা বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ব্যাপারে সিনেট এবং ডেমোক্রেটিকদের বোঝাতে পারবেন। সিনেটর Copaxby রাজি হয়েছিলেন এ ব্যাপারে আলাপ করার জন্য। এটা ছিল বড় পাওয়া এবং সর্বোচ্চ প্রাপ্তি যা এম. এম. আহমেদের প্রচেষ্টা থেকেও বড়। আমার পক্ষে আমি আনতে পেরেছিলাম সিনেটর চার্চ ফুলব্রাইট, বৈদেশিক সম্পর্ক কমিটির চেয়ারম্যান এবং রিপাবলিকান পার্টির অনেক সদস্যকে। এইসব উচ্চপদস্থ লোকের কাছে বলা হয়, কিভাবে তারা গণহত্যা চালাচ্ছে এবং ব্রিটিশ সরকারকে মনে করিয়ে দেয়া হয় যে, এর পরেও পাকিস্তান কি করে সাহায্য পায়। বাংলাদেশে আরো গণহত্যা চালিয়ে গেলে সাক্রবি চার্চ উদ্যোগ নেন যে, পাকিস্তানে বিদেশী সাহায্যের বিলটি আটকে দেয়ার জন্য। কিন্তু কাহিনীর এই শেষ অংশ এবং বড় একটি পাওয়া।

আমাদের সাফল্য দেখে এম. এম. আহমেদ স্থির করেন প্রেসক্লাবে কিছু বলবেন। আমরা সিদ্ধান্ত নেই তাকে বিরত করতে হবে। রাজ্জাক খানের মাধ্যমে আমাদেরও সংবাদ সম্মেলন করতে হবে। এখান থেকে আমাদের কথা বিশ্বের প্রধান প্রধান সংবাদ মাধ্যমে চলে যাবে। Voice of America তে আমার বক্তব্য প্রচার করলে সারা বিশ্ব তা শুনতে পায়। Dawn এর নাসিম আহমেদ, পরে ভুট্টোর প্রেস সচিব হয়েছিলেন, অন্য একজন সাংবাদিক কুতুবদ্দিন আজিজ তারা আমার বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করেন। নাসিম আহমেদ আমার সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং সংবাদ সম্মেলনের সাফল্যের পর বাংলাদেশ সম্পর্কে মানুষ ভালোভাবে জানতে পারে। মার্কিন কংগ্রেস ও মিডিয়াই এম. এম. আহমেদকে নিরুৎসাহিত করে সাংবাদিক সম্মেলন না করতে।

মার্কিন কংগ্রেসে এবং বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে আমাদের সুযোগ করে দেয় প্রেসিডেন্ট নিক্সনের উচ্চ পর্যায়ের কর্তৃপক্ষের কাছে কথা বলতে। আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে ঠিক করি যিনি অনেক বাঙালিসহ হার্ভার্ডে একটি সেমিনার করেছিলেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের ব্যাপারে তিনি ছিলেন খুব কাছের। কিন্তু আমরা আবিষ্কার করলাম যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরজা বাংলাদেশের জন্য বন্ধ হয়ে গেছে। আমি এরপর উড়ে গেলাম Cambridge-এ আমার সহকর্মী কিসিঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে যাতে আমরা একটা মঞ্চ পাই। অর্থনীতিবিদদের একটা অংশ যেমন অধ্যাপক ডরফম্যান, কিসিঞ্জারের সহকর্মী যিনি সরকারি কর্মকর্তা, অধ্যাপক স্যামুয়েল

হান্টটিংটন এবং অধ্যাপক লডজের সঙ্গে হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের এবং কিসিঞ্জার আরেক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে দেখা করলাম কিন্তু কোনো ফল হলো না।

অফিসিয়ালভাবে আমি সাক্ষাৎ করলাম এনায়েত করিমের সাথে ও গ্রেক ব্যাক্সটারের সাথে যিনি পরে বাংলাদেশের ডেস্ক অফিসার হয়েছিলেন। আমি আরো উচ্চ অফিসিয়াল লোকের সাথে দেখা করেছিলাম, যেমন—টম হেক্সনার, বিশ্বব্যাংকের কনসালটেন্ট, সঙ্গে ছিলেন Maurice Williams এর সঙ্গে যখন তিনি ইউএসএইড-এ ছিলেন। আমার মনে আছে, এই সভা Williams যোগাযোগের সূত্র ছিলেন যেন বাংলাদেশ আশা করেছিল Washington যেন আরো তৎপর হয়।

আমার অন্য একটি লক্ষ্য ছিল যে, Washington-এ বিশ্বব্যাংক তখন পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের পক্ষে ছিল এবং এর মুখপাত্র ছিলেন আন্তর্জাতিক একত্রীকরণের পক্ষে।

আমার প্রথম যোগাযোগ হয় একজন ইংলিশম্যানের সাথে যার নাম আই. পি. কারগিল। যিনি পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের প্রধান দায়িত্বে ছিলেন। তিনি এম. এম. আহমেদের ICS-এর সময়কার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এবং পাকিস্তান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। বর্তমান সময়ে প্যারিসে পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামের সভা শেষ হয়েছে, সেখানে কারগিল সাহায্য দিতে নিষেধ করেছে পশ্চিম পাকিস্তানের কথা চিন্তা করে। কারগিলের সঙ্গে অনেকক্ষণ আলাপ হয় এবং তিনি বলেন বর্তমান প্রশাসন মনে করে পশ্চিম পাকিস্তানের উচিত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ব্যবস্থা বন্ধ করা। কারগিলের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারার সঙ্গে আলাপ করার জন্য বলেন। আমি তাকে বলেছিলাম, আমার বন্ধুর অনেক প্রভাবিত করার ক্ষমতা আছে। তারপর ম্যাকনামারা আমার সাথে দেখা করতে রাজি হন। আমি ওয়াশিংটনে যারা বাংলাদেশী আছে তাদের নিয়ে একটি পেপার তৈরি করি যাতে পাকিস্তানে সাহায্য দান বন্ধ হয়।

পেপারটি ছেপে বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেই পেপারটির শিরোনাম ছিল "পাকিস্তানে সাহায্য : অতীত এবং নির্দিষ্টকরণ। ম্যাকনামারা এসব শুনে আমাকে বললেন, আরো জোরালোভাবে মতামত তুলে ধরতে এবং আমাকে এই সঙ্কটময় মুহূর্তে তার অনুভূতির কথা জানালেন। ম্যাকনামারার এসব মন্তব্যে পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামে কিছুটা নিষ্প্রভনতা সৃষ্টি হলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বব্যাংক পাকিস্তানে একটি দল পাঠায় পর্যবেক্ষণের জন্য এবং তারা রিপোর্ট করল যে, বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তান জুলুম করছে এবং সম্পূর্ণভাবে বাংলাদেশের উন্নয়নের পথ ধ্বংস করে দিয়েছে। এই রিপোর্টটি প্রকাশ করে দেন হারুন-আর-রশিদ এবং নিউইয়র্ক টাইমসে তা প্রকাশিত হয়। বিশেষ বিষয়টি হলো কংগ্রেসের Saxby,

Church স্থগিত করেছিলেন কংগ্রেসকে প্রভাবান্বিত করে এবং বিতরণ করেছিলেন প্যারিস কনসোর্টিয়াম সাহায্যদাতাদের বৈঠকে যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুন ১৯৭১ সালে।

অন্যদিকে, আমি সভা করেছিলাম কংগ্রেস, বিশ্বব্যাংক এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমের লোকবল ছাড়াও বৃহৎ অংশের সাথে, যারা বাঙালি সেখানে বসবাস করতেন। যার প্রধান ছিলেন মরহুম এফ. আর. খান যিনি সবাইকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে ফান্ড সংগ্রহের জন্য।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আমি মুখোমুখি হলাম একটি দলের সাথে যারা বাঙালিদের পক্ষে ফান্ড সংগ্রহ করেছিলেন। ওয়াশিংটনের বাঙালিরা, যারা পাকিস্তান মিশনে ছিলেন তাদের সঙ্গে নিউইয়র্কের জাতিসংঘের ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছিল। সেখানে কিছু ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল বাঙালি জনগোষ্ঠী ও মিশন কর্মকর্তাদের মধ্যে, সেখানে আমি মধ্যস্থতার চেষ্টা করি। ওয়াশিংটনে আমার প্রচেষ্টার ফলে সিদ্ধান্ত হয় মিশনের লোকেরা এ ব্যাপারে সাহায্য করবে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি অনুষ্ঠান করা হবে ফান্ডের জন্য। ওয়াশিংটন থেকে আমি নিউইয়র্কে গেলাম বাঙালি জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দেখা করতে এবং কথা বলতে এফ. আর. খানের সাথে, শিকাগোবাসীদের বাংলাদেশ মিশনের কাজ দেখার জন্য।

এই বড় ব্যাপারটির সাথে সাথে আমি ব্যক্তিগত ও দলের আলোচনা চালিয়ে যাই বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সংগ্রহের জন্য। New York Times -এর Jib Brown -এর সঙ্গেও দেখা করলাম যিনি পত্রিকায় কিছু আর্টিকেল লিখেছিলেন বাংলাদেশের পক্ষে। এরপর কিছু টিভি ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও কথা বলি। সুলতানা আলমের আমন্ত্রণে ফিলাডেলফিয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভ্রমণ করি। সেখানে তিনি একটি গ্রুপ তৈরি করেছিলেন বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়ার জন্য। অন্য আরেকটি দলে কি বাঙালি কি আমেরিকান কাজ করেছিলেন মঞ্চ পাওয়ার জন্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার শেষের দিকে আমি অটোয়ায় গিয়েছিলাম বাঙালিদের একটি অনুষ্ঠানে কিছু বলতে যাতে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন আদায় করা যায়। সেখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলন করলাম। দুপুরের খাবারের সময় সংসদের কয়েকজন সদস্যের সাথে কথা হলো। সেখানে অপরপক্ষে ছায়া সাথি সভার মতো পররাষ্ট্রমন্ত্রীরও আসন ছিল। দুপুরে আমাকে একটি ব্যক্তিগত ক্লাবে নিয়ে যাওয়া হলো। সেটা ছিল গোপন মিলনস্থল যাতে অনেক সংসদ সদস্য অংশ নিয়েছিলেন। একজন মন্ত্রী আমার সাথে দেখা করে সমবেদনা প্রকাশ করলেন। বিকেলবেলা আমি বাঙালি গোষ্ঠীর সঙ্গে কথা বললাম। আমার এক দিনের অটোয়া সফর জনমত সংগ্রহে বেশ কাজ দিয়েছিল।

মে মাসের শেষের দিকে লন্ডনে আসলাম। স্বল্প সময় অবস্থান করে আমি দেখলাম, বাংলাদেশের প্রতি মানুষের অবস্থান খুব জোরালো। Kew Garden এ আমার সাথে Judith Hart-এর দেখা হলো। এই মহিলা ছিলেন লেবার পার্টির বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে সামনের সারির মুখপাত্র এবং ভবিষ্যতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হবার সম্ভাবনা আছে লেবার পার্টির পক্ষ থেকে। আমার সাথে আলোচনার পর তিনি কমন্স সভায় জোরগলায় দাবি করলেন যে, পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত সব বৈদেশিক সাহায্য স্থগিত করে দিতে এবং বাংলাদেশে গণহত্যা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করা পর্যন্ত বৈদেশিক সাহায্য স্থগিত রাখতে।

আমি আলাপ করেছিলাম Tory ও Labour পার্টির সদস্যদের সাথে এবং আবার আমি অবহিত করলাম এর মাধ্যমে। আমি আরো কথা বললাম U.K. এর বৈদেশিক সংশ্লিষ্ট বিভাগটির সঙ্গে এবং তাদেরকে আমাদের স্মারকপত্র দিলাম।

একই বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে পাকিস্তানের প্রতি সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে সমর্থ হই যেভাবে ওয়াশিংটনে ম্যাকনামারার সঙ্গে করা হয়েছিল। U.S. এর কংগ্রেসম্যানরাই মূল উজ্জীবনী শক্তি ছিল ট.ক.র বসবাসকারী বাঙালিদের উজ্জীবিত করতে। ট. ক. তে সবচেয়ে বেশি বাঙালি বসবাস করতেন যারা অনেক সাহায্য করেছেন ফান্ড তৈরিতে এবং পাকিস্তানে সাহায্য পাঠানোর বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রধান মুখপাত্র ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থান বলার জন্য এবং সঙ্কটময় মুহূর্তগুলোর জন্য পূর্ব লন্ডনের লিভারপুলের কাছে স্টেশন রোডে একটি অফিস নেন।

লন্ডনের পরবর্তী সফরে তাসাদ্দক আহমেদ, যিনি একটি রেস্টুরেন্টের মালিক ছিলেন এবং তার স্ত্রী রোজমেরি, খুবই সহযোগিতা করেছিলেন সভা করার জন্য এবং পরে অফিস রুম হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাদের স্টোর রুমটি যেটা Gerrad Street লন্ডন অফিসের কাছেই ছিল। সেখানে অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকের দেখা পেয়েছিলাম। এদের মধ্যে একজন নাগা বিচ্ছিন্নকরণ আন্দোলনের নির্বাসিত নেতা। তার সাথে একটি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল যাতে চীনের বেইজিং-এ কোনো রাস্তা পাওয়া যায় এবং যদি চীনে কোনো অফিস করা যায় তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য অনেক ভালো হবে। কিন্তু সে ছিল অনেক দূর। Phizo তার মেয়েকে নিয়ে আসলো Ganges-এ (রেস্টুরেন্টের নাম) দেখা করার জন্য। তিনি আমার থেকে আরো চিহ্নিত নাগাদের ব্যাপারে এবং আমি যাতে এ ব্যাপারে চীনাদের সাথে আলাপ করি। সভাটি আকর্ষণীয় হলেও এর কোনো মূল্য ছিল না।

আমি যখন যুক্তরাজ্যে ছিলাম তখন সুযোগ হয়েছিল বাংলাদেশ সম্পর্কে লিখার। আমি নবজীবন লাভ করেছিলাম আমার পুরনো সেই স্পর্শ পেয়ে New Statesman-

এ লিখে এবং ফরমায়েশ পেলাম বাংলাদেশের গণহত্যা এবং ইয়াহিয়া খানের সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের বন্টন সম্পর্কে লিখতে। New Statesment-এর সম্পাদক সিদ্ধান্ত নিলেন আমার কাছ থেকে পাওয়া তথ্যের একটি সারবস্তু প্রথম প্রকাশ হবে, যাতে U.K. পাকিস্তানের প্রতি সাহায্যের বরাদ্দ স্থগিত করে। South Asian Review-এর সম্পাদক John White এর অনুরোধে তার পত্রিকায় আমি পাকিস্তান বাহিনীর নৃশংসতা শুরুর আগ পর্যন্ত আলোচনার বিষয়গুলো উল্লেখ করেছিলাম। Guardian পত্রিকায়ও একটি নিবন্ধ লিখেছিলাম।

Oxford University Union কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে আমার অংশ নেয়ার সময় দুজন সমবেদনা প্রকাশকারী পাকিস্তানির সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এরা হলেন আকবর নোমান এবং তারিক আবদুল্লাহ। সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়েছিল এবং পাকবাহিনীর অত্যাচার স্বচক্ষে দেখে এবং প্যারিসের Surbonne থেকে প্রধান মুখপাত্র হিসাবে আসা অধ্যাপক Daniel Thorner তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছিলেন। দানিয়েলেরই আরেকটি অংশে আরেক পাকিস্তানি তারিক আলী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নৃশংসতা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সমর্থন ঘোষণা করেন। যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী সম্পর্কে বলছিলেন তখন তাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করা হয় দর্শক গ্যালারি থেকে, সেখানে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার একজন অফিসার ছিলেন।

সেই সভায় ভুট্টোর পিপলস্ পার্টি থেকেও এক প্রতিনিধি বক্তব্য রাখেন। পাকিস্তানিদের সমর্থনের কারণে সহমর্মিতার বাণী শোনা গেল না। আমি ছিলাম শেষ বক্তা এবং দর্শক গ্যালারি থেকেও অত্যুৎসাহ দেখা গেল। যেমন আমাদের জনসমাগমে দেখা যায়।

লন্ডন থেকে আমি প্যারিস গেলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সভা পাকিস্তানে সাহায্যের জন্য কনসোর্টিয়াম বৈঠক, মনে হয় সেটা জুন মাসের ৭ তারিখে হবে। পাকিস্তানিরা সেখানে অনেক সাহায্য পাবে এই প্রতিশ্রুতি পেয়েছিল। তাই বর্তমান আমদানির পরিমাণ প্রচার করেছিল।

প্যারিসে আমি Daniel এবং Alice Thorner'র সঙ্গে ছিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিলেন ডঃ হাসান ইমাম যিনি PID তে ছিলেন এবং সম্প্রতি ভারত থেকে প্যারিসে এসেছেন। ডানিয়েল, হাসান ইমাম এবং আমি মিলে মোরেন্ডাম তৈরি করলাম ঠিক যেভাবে তৈরি করে ম্যাকনামারাকে দিয়েছিলাম। কনসোর্টিয়াম শুরুর আগের রাতে সব প্রতিনিধিকে দিয়েছিলাম। আমরা প্রতিনিধিদের সঙ্গে বসার চেষ্টাও করেছিলাম। কেউ-কেউ আমাদের সমর্থন করেছিলেন। আমি বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদের মধ্যে দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করেছিলাম যিনি একজন আমেরিকান। তার নাম Votaw,

মূল সভার আগের রাতে। তিনি আমাকে বলেছিলেন কনসোর্টিয়াম নতুন আর্থিক সাহায্য দিতে রাজি নয়। আমি বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিলের সঙ্গে ফোনে আলাপ করি। তিনি সবেমাত্র পাকিস্তান থেকে ফেরত এসেছেন। তিনি দ্বিতীয় কর্তাব্যক্তির কথাটি সমর্থন করলেন এবং বললেন সভার পরে দেখা করার জন্য।

একটা পার্ট হলো তিনজন কনসোর্টিয়ামের ভিতরে লবিং করেছে, আরেক পর্বে একদল বাঙালি প্যারিস থেকে এসেছেন এবং যেখানে এই সভা হচ্ছে সেই বিল্ডিংয়ের সামনে হাতে প্লেকার্ড নিয়ে দাবি তুলেছেন, পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হোক।

কনসোর্টিয়ামের সভা শেষ হওয়ার পর সকালে আমি তার সঙ্গে দেখা করলাম পাঁচতারা হোটেলে সকালে নাশতার সময়, হোটেলটির নাম 'Royal Moneau'. তিনি আমাকে শুভসংবাদটি দিলেন যে, কনসোর্টিয়াম সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশে অত্যাচার- গণহত্যা বন্ধ না করা পর্যন্ত সাহায্য দেয়া হবে না। Cargil ঢাকা ও ইসলামাবাদ ঘুরে যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতেই কনসোর্টিয়ামের সদস্যরা প্রভাবিত হয়েছে। সভায় বর্তমান পাকিস্তানে অবস্থায় বেকায়দায় পড়েছিল। অন্য সদস্যরা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সভায় কি হচ্ছে। কিন্তু সকলেই ঢাকা ও ইসলামাবাদ ভ্রমণ করে কারগিলের তৈরি রিপোর্টটি দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। সভায় পাকিস্তানের বর্তমান বিষয়টি নিয়ে তিনি নিশ্চয়তা প্রদান করেন। সভায় অন্য সদস্যরা গভীরভাবে সব পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু অধিকাংশই আচরণ ছিল পাকিস্তানের নৃশংসতার বিরুদ্ধে বিশাল মতামত প্রদর্শন। তবুও বিরাজমান পরিবেশ ছিল পাকিস্তানের প্রতি সাহায্য প্রদান করার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা পাকিস্তানকে আধুনিকীরণের জন্য সমর্থন করলেও এ ব্যাপারে কোনো সমর্থন করেননি বরং সভা থেকে তারা বাইরে চলে যান। কনসোর্টিয়াম সভাটি পাকিস্তানকে অনেক দূর ঠেলে দেয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার লড়াই-এর ব্যাপারে বিশ্বব্যাপী জনমত সংগ্রহ হয় বা সমর্থন আদায় হয়।

কনসোর্টিয়ামের আরেকটি পর্ব ছিল; দানিয়েল বাংলাদেশের ব্যাপারে আমাদের মতামত ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের কাছে তুলে ধরেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ সভা করি এবং ফ্রান্সের বুদ্ধিজীবীদের সাথে আলোচনা হয় যেমন Raymond Arom, Louis Dumont যাদের একজন ছিলেন সামাজিক নৃবিজ্ঞানী এবং একজন আরবি ভাষাবিদ ও Maxim Robinson. আমি সরবোনেও সেমিনার করেছি।

প্যারিস থেকে আমি রোমে যাই। খুব অল্প অবস্থানের সময় আমি একটি স্মারক লিপি দিয়েছিলাম বিশ্ব খাদ্য সংস্থায় পাকিস্তানে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য, আসলে তা ছিল বাংলাদেশের জন্য, যা এই সরকার সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে বিতরণ করবে। বিষয়টি নিয়ে আমি তিনটি ইতালীয় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা

বলেছি। সেই দলগুলো হলো Christian Democrats Party, Communist and Socialists পার্টি। আমি তাদের বলেছিলাম, পাকিস্তানে যেন ইতালিয়ান সাহায্য না দেয়া হয়। এর অর্থ হলো যে, বিরাজমান ধারা আছে যে ইতালিয়ান'রা বড় ধরনের কোনো সাহায্যদাতা নয় পাকিস্তানের অথবা অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে।

রোম থেকে ফিরে সব কিছুর রিপোর্ট দিলাম মুজিবনগর সরকারের কাজে। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমার অনেক বন্ধু ও সহপাঠী সেখানে আছে। আমরা অনুভব করলাম, কিছু চিন্তাধারার বিশ্লেষণ ভবিষ্যৎ বাংলাদেশের জন্য দিয়ে যাওয়া উচিত। এই চিন্তা করে আমি বাংলাদেশের ক্যাবিনেটে প্রস্তাব করলাম যে, বাংলাদেশ পরিকল্পনার বোর্ড গঠন করা উচিত। সম্ভাব্য সদস্যরা অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, অধ্যাপক সারওয়ার মোর্শেদ, ডঃ আনিসুজ্জামান, ডঃ স্বদেশ বোস এবং আমি। এই প্রস্তাব সানন্দে গৃহীত হলো কিন্তু প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করতে দেরি হলো। যখন আমি একমাস পর ইউরোপ থেকে আসার পর অধ্যাপক মোশারফের উপর আক্রমণ হওয়ার কারণে পিছিয়ে গেল। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী বোর্ডের চেয়ারম্যান মনোনীত হন। বোর্ড অফিসের জায়গা পায় এবং কিছু গবেষণা সহকারী নিয়োগ দেয়া হয়। তারা কিছু পেপার তৈরি করেন যা যুদ্ধের পরে ক্যাবিনেটের পলিসি হিসেবে ব্যবহার করা যাবে।

যখন এক অনুষ্ঠানে খালেদ মোশারফের সঙ্গে দেখা হলো তখন তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন্ডপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং একজন সেক্টর কমান্ডারও। তিনি স্বচক্ষে দেখা বিলোনিয়ার যুদ্ধ সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। এক ব্রিটিশ টেলিভিশন সাংবাদিক কিছুদিন আগে খালেদের সঙ্গে লন্ডনে দেখা হলে অনুরোধ করেছিলেন, তিনি কিছু লড়াই দেখতে চান। এ উপলক্ষে প্রথমবারের মতো মেজর জিয়াউর রহমানের সঙ্গে দেখা হলো, তিনিও একজন সেক্টর কমান্ডার ছিলেন। জিয়া-খালেদ মোশাররফের চেয়ে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ছিলেন। জিয়ার কাছ থেকে চট্টগ্রামে যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে পারলাম এবং যুদ্ধের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানতে পারলাম। আমি মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর সঙ্গেও দেখা করলাম। তার সঙ্গে ছিলেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন খোন্দকার, যিনি সর্বাধিনায়কের সহকারী ছিলেন।

আমি সব মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে মিলিত হলাম যাদের বেশিরভাগ ছিলেন তরুণ যারা প্রভাবান্বিত হয়েছিল প্রতিরোধ গড়ার লক্ষ্যে। মেজররা আমাকে বললেন গেরিলাযুদ্ধ শুরু হবে। তারা সবাই সর্বসম্মতভাবে সকল অপর্যাপ্ততা দূর করবেন এবং একমাত্র চাপ সৃষ্টি করেই প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা যাবে। পরে আমি জেনেছি, আগস্ট মাস থেকে সব পলিসি ভারতীয় সরকার গ্রহণ করেছে এবং তাদের আগ্নেয়াস্ত্রের শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

আগস্টে আমি লন্ডনে গিয়েছিলাম বাঙালিদের মধ্যে প্রচারণা চালানোর জন্য। একটি ম্যারাথন র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় ট্রাফালগর স্কোয়ারে। সংবাদ মাধ্যম ভালো সমর্থন দেয়। সকল দলের পক্ষ থেকে সংসদে পাকিস্তানে যাতে সাহায্য না দেয়া হয় সে সম্পর্কে বলা হয় এবং টরি সরকারকে বাধ্য করে প্রতিশ্রুত সাহায্য না দিতে।

লন্ডনের Chatham House G Royal Institute of International Affairs কর্তৃক আয়োজিত একটি সভাতে বক্তৃতা দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ পাই। এখানে গণ্যমান্যদের মধ্য থেকে দর্শকরা ছিলেন। আমি সঠিক সময়ে উপস্থিত হতে পারিনি, আমার স্ত্রী সালমা, যে কিছুদিন হলো লন্ডনে এসেছে আমার সন্তানসহ, সেসহ লেবার দলের এম. পি. Arthur Bottomley বক্তৃতা দেন, যিনি ব্রিটিশ সংসদের পক্ষ থেকে পাকিস্তান সফর করে রিপোর্ট দিয়েছেন। সালমা চলমান অবস্থার একটা বিবরণ দেয় এবং তার ও Bottomley এর বক্তব্য বাংলাদেশের অবস্থান মানুষের মনে আরো প্রভাবিত করে। আমি পরে অবশ্য অক্টোবরে Chatham House' এ বক্তব্য দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ পেয়েছিলাম।

যুক্তরাজ্য থেকে আমি ওয়াশিংটনে চলে গেলাম। সেপ্টেম্বরের দিকে আকস্মিকভাবে ওয়াশিংটনে বাঙালিরা দূতাবাস খোলে এবং জাতিসংঘ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে কর্তব্য করবে বলে ঘোষণা দেয়। এটা ছিল বড় একটা বিজয়। কেননা তাদের ছিল বড় একটা দল এবং তাদের ব্যাংক পাকিস্তানের বৈদেশিক ও সাধারণ প্রশাসকের মতোই ছিল।

এস. এ করিম যিনি পাকিস্তান মিশনের সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি ছিলেন জাতিসংঘে এবং জ্যেষ্ঠতা নিয়েই নিউইয়র্ক থেকে এসেছিলেন এবং এই দলের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন এবং সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে যাতে মিশনটি প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। এই সাংবাদিক সম্মেলনে এনায়েত করিম উপস্থিত ছিলেন না। কারণ, করোনারিতে অ্যাটাক হওয়ার পর তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতালের বিছানায় থেকেই তিনি সংহতি প্রকাশ করেন।

আরো আগে জুন মাসে আমরা দেখলাম বিশ্ব ব্যাংক IMF-এর পাকিস্তানের উপরে রিপোর্টটি New York Times এ প্রকাশ করে দিয়েছেন বিশ্বব্যাংকেরই কতিপয় কর্মচারী। এই রিপোর্ট যদিও তাৎপর্য বহন করে না কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লোকজন বা অধিবাসী, কংগ্রেস এবং দাতারা যারা যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে আছে সবার দৃষ্টিগোচর হয়।

এই সময় বাংলাদেশ খুব লবিং শুরু করে তার অবস্থান সম্পর্কে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্বেচ্ছাসেবক দল বাংলাদেশে সংকটময় মুহূর্তে বা পরে কাজ করবে বলে আশ্বাস দেয়। ওয়াশিংটনের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ দলটি ছিল Bangladesh

Information Centre তারা Saxby-Church এর। স্থগিত হয়ে যাওয়া মতামত দেয়ার ব্যাপারটি।

বাংলাদেশের ডিপ্লোমেটদের একত্র করা হলো এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে সমর্থনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে অধিবাসী ও কংগ্রেসের সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ওয়াশিংটনের একটি স্থায়ী মিশন খোলার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ওয়াশিংটনে নতুন মিশন খোলা হয়েছে এবং বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র হলো মূল বিষয় ওয়াশিংটনে লবি সৃষ্টির জন্য যা Saxby-Church কর্তৃক সংশোধনকৃত। এই সংশোধনীটির বলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যে সাহায্য পাকিস্তানকে দেয়ার কথা ছিল তা এখন পর্যন্ত বাংলাদেশে গণহত্যা চালানোর জন্য বন্ধ ছিল এবং বাংলাদেশে এ ব্যাপারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে পুনরায় আলোচনা শুরু করা হয়।

এই অবস্থার রাজনৈতিক বিষয়গুলো উদ্বেগমুক্ত করে সিনেটের অনেক ভোটে সংশোধনীটি পাস হওয়ার। সংশোধনীটি বেশ ভালো সমর্থনকারী অবস্থান তৈরি করে যা দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনে একটি চাপ সৃষ্টি করা যায়। তারা ইয়াহিয়া খানের সময়ে তার প্রতি সমর্থনের ব্যাপারটি যাচাই করবে এবং তারা ইয়াহিয়া সরকারের পুনরায় মূল্যায়ন করবে এবং পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করে সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেয়া হবে। এ অবস্থায় অস্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি জাহাজযোগে পাকিস্তানে পাঠাবে তার অসঙ্গতি সিনেটরদের তুলে ধরেন সিনেটর কেনেডি। অপ্রত্যাশিতভাবে কিছু আমেরিকান সমর্থক ব্যবস্থা করেন নৌকায় যাতে পূর্ব দিকের মাল খালাস করার স্থানে সমবেত হতে, যাতে কোনো অস্ত্র পাকিস্তানের জন্য খালাস না হতে পারে।

ওয়াশিংটন থেকে আসার পর থেকে আমার প্রধান কাজ হলো Saxby-Church দের সংশোধনীটি কাজে লাগানো। আমি বাংলাদেশ মিশন ও বাংলাদেশ তথ্যকেন্দ্র দুটোতেই কাজ করতে লাগলাম। তথ্যকেন্দ্রের কর্মীরা লবিং-এ কাজ করে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেক কংগ্রেসম্যানের জন্য একটি ফাইল তৈরি হয় যাতে রাজনৈতিক অবস্থান এবং যুদ্ধের আতঙ্কের অবস্থার কথা উল্লেখ্ করা হয়। সুনির্দিষ্টভাবে যোগাযোগের জন্য নির্দেশিকা তৈরি হয়। ওয়াশিংটনে বাঙালি সমবেদনা প্রকাশকারী কিছু আমেরিকান এবং দেশের অন্যান্য স্থান থেকে এসেও যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করে চাপ অব্যাহত রাখেন। এই প্রচারণা আরো সমর্থন আদায় করে। লোকজন কাজ ফেলে ওয়াশিংটনে আসে এবং কিছুদিন অতিবাহিত করে যোগাযোগের জন্য। আমেরিকানরা তাদের রাজ্যের সিনেটরদের কাছে বলে, এমনকি অনেক বাঙালিও সিনেটরদের কাছে এ ব্যাপারটি তুলে ধরেন।

যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরো যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে আমি অর্জন করেছিলাম কিছু

জটিল প্রক্রিয়া যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক মতামত প্রভাবান্বিত করবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারকে। এই উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু মার্কিন বন্ধুকে নিয়ে দল গঠন করা হয় এবং এর কর্মীদের মাঝে বাংলাদেশের ব্যাপারটি নিয়ে কাজ করবে যাতে বাংলাদেশ তার মানসিকতা নিয়ে সচল থাকে। বাংলাদেশের গ্রুপে যারা কাজ করেছেন তাদের কথা নির্দিষ্টভাবে মনে করতে পারি, যেমন Joan Dine, Tom Dine এর স্ত্রী, যিনি আমাদের একজন সব সময়কার সমর্থক, Dauc Weisbro, একজন স্নাতক ডিগ্রিধারী ছাত্র তিনি সচিব ছিলেন। তাদের সাথে যোগ করা যায় আরেকজন বাঙালির নাম কায়সুল হক, যিনি আমাদের অফিসে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছিলেন। Tom Dine, Gerry Tinker এবং Dale Diehan-এর যিনি সব সময় বাংলাদেশের সমর্থক ছিলেন, বৈদেশিক সাহায্যের বিলটির প্রণয়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন একজন। তিনি এ ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে White House প্রতি চাপ সৃষ্টি করেন। এ-সময় Mike Gestner ছিলেন ক্লান্তহীন সমর্থক এবং তথ্যাদি প্রণয়নে সহায়ক ব্যক্তি।

এই যোগাযোগের প্রতিক্রিয়ায় Saxby-Church এর প্রণয়নকৃত বিলটি নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল। সিনেটের এই বিলের পরিপ্রেক্ষিতে অদ্ভুত মিলন দেখা গেল, যেমন লিবারেলের সিনেটর Frankle Church এবং দক্ষিণ অঞ্চলের একজন কনজারভেটিভ। লিবারেলের সিনেটর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক সাহায্যের ব্যাপারে সমালোচনা করেন এবং পাকিস্তানের গণহত্যারও সমালোচনা করেন। মূলত সকল লিবারেল সিনেটর বিলটির শিরা-উপশিরা নিয়েও আলোচনা করেন। তারা কোনো কারণে কনজারভেটিভে যোগদান করেছিলেন।

১৯৭১ সালে কমিউনিস্ট চীন, তাইওয়ানকে জাতিসংঘ থেকে আলাদা করে দেয় বিদ্রোহের বিজয়ের ২২ বছর পর। সম্পূর্ণ ঘটনাটি কনজারভেটিভ কংগ্রেসম্যানরা পর্যবেক্ষণ করেন, রাজনৈতিক অকৃতজ্ঞতা হিসেবে। অনেক তৃতীয় বিশ্বের দেশ বৈদেশিক সাহায্যের উপর নির্ভর করে।

পরবর্তী সোপান এই যে, saxby-church এর নিরাপত্তাজনিত অনুচ্ছেদটি পাস হয় সিনেটে বিতর্ক হওয়ার পর। এটা অন্যান্য রাষ্ট্রের দেখানোর জন্য একটি দৃষ্টান্ত কিন্তু আমাদের এটা বিজয় এনে দেয় অল্প সময়ে বাংলাদেশের যোগাযোগের মাধ্যমে যে, সকল প্রকার প্রতিশ্রুতি যা পাকিস্তানকে সাহায্যের জন্য দেয়া হয়েছিল এবং অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষেত্রেও।

বিজয়টি আসলে পর্যাপ্ত হয়নি, কেননা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসন বা সরকারের আরো দেয়া ছিদ্র বন্ধ করা হয়নি যাতে পাকিস্তান সাহায্য পেতে পারে। Nixon-এর প্রশাসন NATO'র মাধ্যমে ইয়াহিয়া সরকারকে সমর্থন করে প্রাচীর তুলে দিয়েছে।

ওয়াশিংটনে আমাদের পাকিস্তানের জন্য সাহায্য কনসোর্টিয়ামের ব্যাপারে

যোগাযোগ অব্যাহত থাকে। IMF-এর বার্ষিক সভায়, যা অনুষ্ঠিত হয়েছিল শেরাটন হোটেল- ওয়াশিংটনে, সেখানেও আমাদের কর্মতৎপরতা ছিল। যদিও পাকিস্তানে সাহায্য দেয়ার বিষয়টি এজেন্ডায় ছিল না। আমরা আমাদের বন্ধুদের বলেছিলাম যে, পাকিস্তান চেষ্টা করবে পুনরায় বিষয়টি আনতে এবং এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করবে যেন তারা প্রতিশ্রুতি পায়। এ. এম. এ মুয়ীদ এবং আমি একই সঙ্গে একটি নথি তৈরি করলাম তাতে ছিল পাকিস্তানের বিষয়গুলো যাতে তারা কোনো রিলিফ প্রদান থেকে বিরত থাকবে। কেননা স্বাধীনতার যুদ্ধ তখন জটিল অবস্থায় মোড় নিচ্ছে।

মুয়ীদ ও আমি কনসোর্টিয়ামের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথা বললাম যারা সভায় মিলিত হয়েছিল, তখন আমরা আমাদের নথিটি দিলাম এবং কথাবার্তা বললাম। আমাদের কাজে একদিন সহায়তা করেছিলেন অধ্যাপক নুরুল ইসলাম ইয়েল থেকে উড়ে এসে। অন্যদিকে তথ্যকেন্দ্রের গ্রুপ অল্প আলোচনায় সভা আয়োজন করেছিল। তাদের মধ্যে আছেন Joan Dine, সঙ্গে ছিল তার মেয়ে Amy, এটি ছিল তার হাতেখড়ি। অন্য আরেকটি ঘটনায় মুয়ীদ বুঝল যে, তার সঙ্গে এসবের যোগসূত্র থাকার জন্য নিরাপত্তা কর্মীরা শেরাটন হোটেলের সামনে থেকে সরিয়ে দেয়। সেই সময়ে আমি প্রক্রিয়া চালাচ্ছিলাম এবং উদ্ধার করার জন্য এক তোড়া প্রচারপত্রসহ মুয়ীদ আমাদের তৎপরতার জন্য ছাড়া পায়।

আমাদের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত অভিজ্ঞতা হলো, প্রতিনিধিদের ঘরের দরজায় বোতাম টেপা এবং লবিতে প্রেস করা আমাদের লক্ষ্য ছিল। কেউ-কেউ আমাদের কথা শুনলেন, অন্যরা আমাদের এড়িয়ে গেলেন। একবার তো ১৮ বছর পরে দেখা Cambridge-এর সহপাঠী Shahpour Shirazi'i দিকে দৌড়ে গেলাম যে, সে পরে ইরানের মারকাজী ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিল। তাকে প্রশ্ন করলাম পাকিস্তানে সাহায্যের ব্যাপারে শাহের মনোভাব কি? বলল যে, শাহের সঙ্গে ইয়াহিয়ার ভালো সম্পর্ক আছে এবং বঙ্গবন্ধুকে সরিয়ে দেয়ার প্রতি সমর্থনও আছে।

অন্য দিকে আমরা দেখা করেছিলাম অন্য বন্ধু Lal, Jay Wordene'র সঙ্গে। সেও Cambridge এ ছিল, সে শ্রীলংকা সরকারের অর্থনীতি বিভাগের সচিব ছিল। একটি সভার আয়োজন করেছিল অধ্যাপক ইসলাম ও আমার মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন Troskyite, শ্রীলংকার অর্থমন্ত্রী এন. এম, পেরেরা। আমরা শ্রীলংকায় PIA'র অবতরণ এবং সেখানে বিমান বাহিনীর নাম ও গোলাবারুদ রাখার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলেন। তিনি এটা অস্বীকার করলেন এবং প্রতিজ্ঞা করলেন তিনি দেখবেন অবতরণ ঠিক আছে কিনা বা কতটুকু আইনসম্মত হয়েছে। আবারও আমি তার প্রতি বিশ্বাস বা আস্থা রাখতে পারলাম না প্রতিজ্ঞার মতো সাফল্যের ক্ষেত্রে। অন্য আরেকটি মূল কাজ আমি করেছিলাম, তা হলো জাতিসংঘে প্রচারণা চালানো।

বাংলাদেশ সরকার অক্টোবর, ১৯৭১ সালের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় একটি প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছিল। সেই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। ম্যানিলার প্রতিনিধি কে. কে. পন্নি, ইরাক থেকে আসা এ ফতেহের মতো আমিও প্রতিনিধিদলের একজন সদস্য ছিলাম। আরো প্রতিনিধি ছিলেন যেমন ড. এ. আর. মল্লিক, পরে এসে প্রতিনিধিদলে যোগ দেন। আমাদের প্রচেষ্টা হতাশাজনক ছিল যেখানে হতে পারতো গণহত্যা সম্পর্কে জোরালো আবেদন। এই বিষয়টিতে এসেম্বলি আমাদের পক্ষেই আসার কথা ছিল, এবং কিছু কমিটিতেও আলোচনা করার কথা কিন্তু খুব বেশি একটা অবস্থান লক্ষ্য করা গেল না। কেননা জাতিসংঘের সব সদস্যই একটি দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করতে রাজি হলো না। এই অবস্থায় কেউ ভেটো করল না যাতে বাংলাদেশের জনগণের স্বার্থ থাকে, এই লবিং-এর প্রভাব ছিল ভিত্তিহীনভাবে বিরোধিতা না করা।

এই সময়ে আমি আমার পক্ষ থেকে জড়িয়ে পড়ি। বিভিন্ন ধরনের আলাপচারিতার বিষয় হলো বাংলাদেশ। এসবের মধ্যে ছিল University of Philadelphia, University of Syracuse এ বক্তৃতা MIT কোম্পানি'তে বিচারপতি আবু সাঈদের এবং ডঃ মহিউদ্দিন আলমগীরের সঙ্গে এবং Williams College'-এর অধ্যাপক আনিসুর রহমানের সঙ্গে এবং Yale সংগঠনটির আলোচনায় অধ্যাপক নুরুল ইসলামের সঙ্গে আমি আলাপচারিতায় মিলিত হই। প্রায়ই অনুষ্ঠানে পাকিস্তানের কিছু গ্রুপ থাকতো। তারা আমাকে বক্তব্য থামিয়ে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করতো, এমন অনেক প্রশ্ন আসতো তাতে রাগের বদলে দুঃখই হতো।

এরপরেও আমি কিছু কাজ অব্যাহত রাখি এবং কিছু প্রবন্ধ রচনা করি। আমার অবস্থানে শেষ দিকে দুটি TV অনুষ্ঠান করি। প্রথম টিভি অনুষ্ঠানটি করি বেসরকারি টেলিভিশন স্টেশনে। এই অনুষ্ঠানটি আয়োজন করেছিলেন কোর্টের আদলে জনগণের অতি উৎসাহে এবং প্রয়োজনের খাতিরে। আয়োজকদের মধ্যে একজন ছিলেন আইনজীবী অন্যজন বাদী পক্ষ।

প্রত্যেকের অনুমোদন ছিল তিনজন করে প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য দেয়ার জন্য। আমি ভালোভাবেই তিনজন সংগ্রহ করেছি, আসলে এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব সম্পর্কে। আমার মনে নেই কে আমাদের আইনজীবী ছিলেন। কিন্তু বিপরীত দিকের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন William Rusher যিনি National Review এর সাপ্তাহিকীর মালিক, যা ছিল জনপ্রিয় কনজারভেটিভদের মুখপত্র। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন পরিচিত William f. Buelely Jr. Rusher was well to the right of Buelely and possibly to right of Gengis Khan as well. তার বক্তব্য ছিল একেবারে ফ্রিজের মতো ঠাণ্ডা John Foster Dulles' মতো। তিনি

জানতেন অনেক কিছু, কেননা ১৯৫০ সালে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর বাবার সাথে আলাপ করেছিলেন। তিনি এখনো মনে করেন Krishan Menon ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

অবশ্য এই অনুষ্ঠানে বেশি কোনো দর্শক ছিল না কিন্তু তা ছিল চিত্তাকর্ষক। কারণ এর মাধ্যমে অনেক কিছু প্রাপ্তি ও প্রত্যাহারও ঘটেছে। Rusher পাকিস্তানের নেতা ভুট্টোর সাক্ষাৎকার নিতে পাঠিয়ে দিলেন। এটি প্রচারিত হয়েছিল আমাদের অনুষ্ঠান প্রচারিত হবার আগে। Rusher এক কংগ্রেসম্যান Freyinghausen এর সঙ্গে আলাপ করেন, তিনি New Jersy-র সিনেটর এবং সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও Pepsi Cola কোম্পানির মালিক, যিনি নিক্সনকে নির্বাচনে টাকা দিয়েছিলেন।

বাংলাদেশের দিকে আমাদের আইনজীবী ছিলেন John Stone House, লেবার দলের এম. পি., যিনি ইংল্যান্ডে থাকতেন, তিনি লন্ডন থেকে এসেছিলেন। আরো যোগ দিয়েছিলেন M.K. Rasgotra, L.K. ঔষধ ভারতীয় দূতাবাসের ব্যক্তি, ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন এবং বর্তমানে বৈদেশিক দিকটার পরিচালক। অবশেষে দেখা গেল আমিই একমাত্র বাংলাদেশী। সেখানে প্রচুর দর্শক ছিল এবং অত্যুৎসাহী কিছু টিভি দর্শক ছিল।

আমার দ্বিতীয় পর্যায়ে TV অনুষ্ঠান ইতিহাস হয়ে গেছে। এর আগে আমাদের সবার জন্য খবর ছিল যে, জাতিসংঘ প্রতিনিধিরা এখন আরো তৎপর বাংলাদেশ সম্পর্কে এবং শেষ পর্যন্ত মহাসচিব পর্যন্ত গড়ায়। তাছাড়া সাধারণ সভায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে এ ব্যাপারে মতদ্বৈধতা শুরু হয়েছে। The escalion in the liberation war এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর জন্য সীমান্তে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বোমা আক্রমণ শুরু হয়েছে ভারতের উত্তর দিক থেকে বিভিন্ন টার্গেট লক্ষ্য করে। পাকিস্তান পুরোপুরিভাবে প্রত্যয়ী ছিল বাংলাদেশের বিষয়টি যেন এজেন্ডাভুক্ত হয়, এখন তৎপর হয়েছে ভারত পাকিস্তান কর্তৃক হুমকি থেকে শান্তির দিকে, স্বাধীনতার সংগ্রামের চাইতে বেশি। ভারতীয় বাহিনীর অগ্রসরমানতা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোরেশোরে চলছিল এবং পাকিস্তান বাহিনী বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক সমর্থন আশা করেছিল ভারতীয় সেনাবাহিনী যেনো সীমান্তে চলে যায়। এসব ব্যাপারে তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সমর্থন পেয়েছিল। কিছু পরে জাতিসংঘ এ ব্যাপারে সাড়া দিয়েছিল। আগ্নেয়াস্ত্রের দিক এবং সামরিক বাহিনীর তৎপরতা বেআইনি হিসাবে অবহিত করে জাতিসংঘ এবং সাধারণ সভা। হঠাৎ করে প্রায় সকল সদস্য একটি সমাধানের প্রচেষ্টায় ব্রতী হন যাতে যুদ্ধের সমাধান হয়। ফলাফলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং চীন যৌথভাবে কর্মসূচি দিলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোতে তা বাতিল হয়ে যায়।

ভেটো দেয়া বা সমাধানের পাশ কাটিয়ে যাওয়া যা আগে সাধারণ সভায়

হয়েছিল, যারা এখন যুদ্ধ থামানোর জন্য অনেক তৎপর। সমাধান হতে পারে যদি সবাই এ ব্যাপারে স্থিত হয়। আমি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করে দেখলাম তাতে যত বিতর্ক সাধারণ সভায় (নিরাপত্তা পরিষদে) হয়েছে তাতে কিছু দেশ পাকিস্তানের পক্ষে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সমর্থন করে একটি শান্তিময় অবস্থান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে হয়।

আমরা বাংলাদেশীরা এসব নাটকের দৃশ্যের দর্শক ছিলাম দর্শকের গ্যালারিতে থেকে। আমরা আশা করেছিলাম জাতিসংঘ আমাদের আরো গভীর সমবেদনা জানাবে, কিন্তু তা অল্পই নিরাপত্তা পরিষদ থেকে পাওয়া গেল। বক্তারা ভুলে গেলেন ৯ মাসের অত্যাচার সম্পর্কে এবং গণহত্যা সম্পর্কে যা পাকিস্তানিরা অবিচারে করছিল মানুষ ও জমির উপর এবং যেখানে এই পরিস্থিতিতে পাক-ভারত যুদ্ধও হতে পারে।

নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধিরা বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানায় NewYork এ ব্যক্তিগত টেলিভিশন চ্যানেলে, এ চ্যানেলে আমাদের অনুষ্ঠানটি সাজানো হয়েছিল সাধারণ পরিষদের বিতর্ক ব্যবস্থার মতো করে। সেখানে দুটি চ্যানেল ছিল, যার একটি ছিল আমেরিকানদের দ্বারা। যতদূর মনে পড়ে ঐ দলে ছিলেন Tom Dine, Arnold de Borchgrave, যিনি ছিলেন News Weell Magazine থেকে এবং অন্যজন ছিলেন সুপরিচিত। এখানে তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হলো পাকিস্তানের নিউইয়র্কের কনসাল জেনারেলের প্রতিনিধির, নাজমুস সাকিব খান, কনসল জেনারেল ভারতের পক্ষে এবং আমি বাংলাদেশের পক্ষে। পাকিস্তানের কনসাল জেনারেল আমার একই প্লাটফর্মে আলাপ করেছিলেন এবং ভারতের প্রতিনিধি আমার আগে বক্তব্য দিয়ে তার বিরুদ্ধে বলেন। আমার দিকে স্ক্রিন এলে ধীর পারফরমেন্স শুরু হয়। আমার বক্তব্য তখন ছিল সাধারণ পরিষদে আমাদের ব্যাপারে ভোটের অবস্থান সম্পর্কে। যখন আমি আমার বক্তব্যে আসবো তখন ক্যামেরার অবস্থান স্টুডিও থেকে সরে জাতিসংঘের ব্যাপারটি দেখতে থাকে। ক্যামেরায় আবার আমি ফিরে আসি এবং সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী আমাকে বললেন, আমার প্রতিক্রিয়া জানানোর জন্য। তখন আমি বেশ কিছু বললাম এবং তা হলো 'বাংলাদেশ' যা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী গণহত্যার, তার জন্যই তারা সাধারণ পরিষদে যেতে পারেনি। জনগণ এবং বাংলাদেশের সরকার কোনো দল নয়। এই সংকটময় মুহূর্ত অতিক্রম করবে এবং পাকিস্তানের সামরিক জান্তার প্রতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। আমার বিবরণ এবং সম্ভাব্য পর্যবেক্ষণ এই পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে জাতিসংঘের বিতর্কে এবং পরিস্থিতি বাংলাদেশের তা ভালোই হয়। কিছুদিন পর New York এর রাস্তায় এক অজ্ঞাত ব্যক্তি আমার বক্তব্যের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দেয়।

টিভিতে কোনো তারকার বক্তব্য স্বল্পস্থায়ী হয়। আসল ঘটনা আরো মর্মান্তিক

এবং জাতিসংঘ থেকে আরো ন্যক্কারজনক। আমরা জানতে পারলাম মি. জুলফিকার আলী ভুট্টো, এগারো ঘণ্টা ধরে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনা করেছেন কি করবেন। এবার এসেছেন New York এ পাকিস্তানের ব্যাপারে সাধারণ পরিষদকে রাজি করাতে। ভুট্টোর বিমান New York এ অবতরণ করে। ভারতীয় এবং বাংলাদেশের সৈন্যদের অভাবনীয় অগ্রসরতা এবং পাকিস্তানের সৈন্যদের দাপট বন্ধ হওয়ার পথে যেখানে জাতিসংঘ বসেছিল পুরোনো আলাপ করতে সেখানের থেকে গুরুত্বপূর্ণ একজন কারণিক আমাকে জানাল, যিনি পাকিস্তান মিশন থেকে এরকমই শুনেছেন। আমরা আরো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির থেকে শুনলাম যে, জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করতে রাজি হয়েছেন অগ্রসর বাহিনীর বিপক্ষে। আমরা আরো জানতে পারলাম যে, Paul Mare Henry ঢাকায় প্রতিনিধি, তিনি রাও ফরমান আলী সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে নিশ্চয়তা চাচ্ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করলে প্রত্যাহারকৃত সৈন্যরা যেন ভালোভাবে পাকিস্তানে ফেরত আসতে পারে।

ভুট্টো এ-কথায় বিস্ময় প্রকাশ করেন। তার কাছে এটা বিপদের আশঙ্কার মতো মনে হলো। তিনি জাতিসংঘের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, বর্তমান অবস্থা আরো উন্নতির দিকে যাবে। বর্তমান পরিস্থিতির কারণে অপ্রস্তুত ভুট্টো মাঠে নামালেন এবং এর পরের কিছুদিন কাটালেন কিছু জাতিসংঘের প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করে, যেন George Bush, বর্তমানে Reagan প্রশাসনে তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং China'র প্রতিনিধি Huan Heang এটা আসলে পরিষ্কার নয়, তারা কি নিয়ে আলাপ করল। কিন্তু এর পর আত্মসমর্পণের আর কিছু শুনলাম না। নিয়াজি এবং ফরমান আলী ইসলামাবাদ শাসন করতে থাকলেন এবং তাদের জানানো হলো সাহায্য সামনে আসছে। চায়না উত্তর দিক থেকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমুদ্রের দিক থেকে। ইয়াহিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং ভুট্টো যে-কোনো সময়ে তা হস্তক্ষেপ করতো।

পুনরায় বাংলাদেশের জাতিসংঘের প্রতিনিধিরা গ্যালারিতে নিরাপত্তা অধিবেশন চলার সময় ভুট্টোকে দেখে উদ্ভট আচরণ করেছিলেন। আমরা সময় অতিবাহিত করছিলাম নিরাপত্তাপরিষদের অন্যান্য পেশার লোকদের সঙ্গে আলোচনা করি, তাদের যুদ্ধের সময় মনোভাব প্রসঙ্গে। লবির সকলেই স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশ একটি বিষয়। সবচেয়ে ভালো সমাধান হলো পাকিস্তান সৈন্যদের তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করা। তারা বলে জাতিসংঘ আসলে আমেরিকানদের দ্বারা এবং চীনারা এমন মনোভাব তৈরি করে তারা তাদের বন্ধু ইয়াহিয়াকে সমর্থন করছে। এই সভাতে Oxford' এর সমসাময়িক সহপাঠী জাপানের প্রতিনিধি আমার সাথে প্রায়ই দেখা করতেন এবং আমাদের তাদের অবস্থান ও উন্নতি সম্পর্কে নিরাপত্তাপরিষদে জানাতেন।

অক্টোবরের দিকে আমি আগে থেকে ঠিক করা গোপন বৈঠক করি প্যারিসে

K.M. Kaner'র সঙ্গে যিনি বেইজিং-এ পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। তিনি খুবই গোপনীয়ভাবে আসেন জেনেভা থেকে পাকিস্তান এম্বাসেডরদের সঙ্গে আলাপ করতে। যেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রভাবিত হয়। সেখানে তার সঙ্গে আলাপ হয় এবং তিনি আলোচনা করে চীনের যে সাহায্য দেয়ার কথা ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে সেটা বাতিল করা হয়। চীনের অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়েছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করার জন্য। আমি বাংলাদেশ সরকারকে সবকিছু জানার জন্য বলি। আমি ভালোভাবেই করেছি। কোনো জনসমাবেশে আমিই একমাত্র সংবাদদাতা ছিলাম না, বেইজিং-এ পাকিস্তান এমবেসিতে কাজ করতো কিছু বাঙালি তারা ভারতীয় দূতাবাস থেকে খবর নিতো। সমস্ত সম্ভাব্য সামরিক সীমা কোনো সামরিক বিশেষজ্ঞ গ্রহণ করেছিল তা বলতে পারি না।

এই কৌশল গ্রহণ করে এবং নিরাপত্তা পরিষদ ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চায়না এবং পাকিস্তানের খবর জানতে চাইতে আমরা আত্মসমর্পণের ব্যাপারে খুব উৎসুক ছিলাম। সেটা ১০ ডিসেম্বরের কাছাকাছি, শেষ মিনিটতক ইসলামাবাদের আদেশ আর কাজে লাগছে না। যখন আমি নিউইয়র্ক ছেড়ে যাই লন্ডন হয়ে আমার বাড়ির উদ্দেশ্যে। পরিস্থিতিটা ছিল থমথমে। যুদ্ধে নতুন মাত্রা আনলো এই সংবাদ যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর সপ্তম নৌবহর পাঠাচ্ছে না। যখন আমি অক্সফোর্ডে তখন আমি শুনলাম পাকিস্তান সেনাবাহিনী আত্মসমর্পণ করছে এবং টেলিভিশনে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে বলা হচ্ছে যে, জেনারেল নিয়াজি অস্ত্র নামিয়ে রাখছেন। এর আগে জগজিৎ সিং অরোরা ঢাকায় রেসকোর্সে আসেন। নিয়াজির কাছে বড় ব্যাপার হতো সপ্তম নৌবহর যদি আসতো অথবা প্রেসিডেন্ট নিক্সনের বন্ধু বলে গণ্য হতো। হঠাৎ করে চারদিকে অনেক রাজনৈতিক সমর্থন আসলো তাতে। অনেক কিছু প্রকাশ হয়ে গেল। পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর কিছু বলল না। এবং এরই মধ্যে প্রকাশ করেছেন যে, নিরাপত্তা পরিষদের সেই গোপন কথা যা হেনরি কিসিঞ্জার রিপোর্ট দিয়েছিলেন, নিক্সনের কথা অনুযায়ী, জাতিসংঘের স্বরাষ্ট্র বিভাগে, যে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার বক্তব্য ছিল কষ্টকর। কংগ্রেস সদস্যদের নেতৃত্বে ছিলেন Church, Kennedy এবং অন্যান্য বন্ধু ছিলেন বাংলাদেশের। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও কংগ্রেসের সদস্যবৃন্দ নিক্সনকে বলেন, যাতে পাকিস্তানকে সাহায্য না করে।

আমরা যোগাযোগের ব্যাপারটি শেষ করে এনেছি যেন নতুন করে পাকিস্তানের সাহায্য না জোটে। প্যারিসের আমার শেষ বৈঠক নভেম্বর মাসের শুরুতে। পাকিস্তান কনসোর্টিয়ামে সকালের আরেকটি সভা করেছি (কারগিলের) Cargill সাথে। নিশ্চিত হলাম যে, প্যারিস কনসোর্টিয়ামে চাপ প্রয়োগ করা হবে। উন্নত বিশ্ব ইদানীং জাপানের ক্ষেত্রে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অর্থ সাহায্য কেটে দেয়ার প্রস্তাব হয় কেননা

তাদের প্রতি অভিযোগ ছিল। বিশ্বব্যাংক এ সময় মনে করে যে, বিষয়টি অনেক দূর চলে গেছে। তবুও বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে দহরমমহরম চলছিল।

আমাদের এই বিষয় ছিল পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক বিজয় এবং তাদের তৎপরতার উপর মানসিক বিজয়। কিন্তু তারা সব অর্থনৈতিক বিষয়টি কুক্ষিগত করে দিনকে দিন নতুন সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করে। স্বাধীনতার যুদ্ধ আবার চলার প্রেক্ষিতে পাকিস্তান মুখোমুখি হয় অর্থনৈতিক সংকটের।

প্যারিসে শেষ সফরে, সেটা নভেম্বর মাসের কথা, চূড়ান্ত কনসোর্টিয়াম সভায় পাকিস্তান সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়। বিশেষ করে বলা হয়, ফ্রান্সের নোবেল বিজয়ী ঔপন্যাসিক আন্দ্রে মালরো, এর আগে আমরা মালরোর লেখা পড়েছিলাম বাংলাদেশকে সমর্থন করে এবং সাহায্য দেয়ার জন্য তিনি কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিলেন। যেমন হয়েছিল ফ্রান্সের সাথে জার্মানির যুদ্ধের সময়। তিনি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মারলো ছিলেন ৭০ বছর বয়স্ক এবং স্বাস্থ্য ভালো ছিল না, তাই শারীরিক কোনো পরিশ্রম তাকে দিয়ে করানো সম্ভব ছিল না। কিন্তু Deniel Thorner বুঝতে পারলেন যে, বাংলাদেশ সরকারের একজন প্রতিনিধিকে দিয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে কর্ম প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলা ও সঙ্গে নিতে বলা উচিত।

Daniel নিয়ে গেল মালরোর বাড়িতে প্যারিসে যেখানে ঐ মহৎ ব্যক্তির সঙ্গে প্রথম বারের মতো আলাপ করি। মালরো কথা বললেন আনন্দের সঙ্গে। তিন স্পেনিশ যুদ্ধের কথা, যেখানে তিনি পাইলট ছিলেন, সেভাবেই প্রজাতন্ত্রের সেবা করেছেন, যদিও সেভাবে দেশের জন্য করতে পারেননি, যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকু করেছেন। তিনি বাংলাদেশের পক্ষে ন্যায় আশা করতেন, নিজের কর্তৃকর্মে উৎসাহ পেতেন এবং খারাপ স্বাস্থ্য নিয়ে অন্যান্য সহযোদ্ধা নিয়ে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বলেন যে, সকল প্রকার আবশ্যকীয় উপাদান ও কৌশল গেরিলা যুদ্ধের জন্য তা তিনি জানেন। তিনি একটি দল বানাতে চেয়েছিলেন যাদের থাকবে গোলাবারুদ এবং যোগাযোগের সরঞ্জাম, যা তিনি মুক্তিবাহিনীকে সরবরাহ করতে পারবেন। তিনি তারপর জড়িত করতে চান আমাকে, কৌশলগত ব্যাপারে আলোচনা করতে মুক্তিবাহিনীদের এলাকা সম্পর্কে এবং যুদ্ধের মূল সমস্যাগুলো কি কি? যেভাবেই হোক এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি অপারগ এবং তবে প্রতিজ্ঞা করলাম, তার শুভেচ্ছা আমি বাংলাদেশ সরকারকে পৌঁছে দেবো। আরেক পর্বে তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন তার বন্ধুদের বলবেন যেন পাকিস্তানে আর অস্ত্র না যায়। This had indeed been suspended because of Pakistan failure to service its debt. প্যারিস থেকে অস্ত্র কেনা হতো তা আরো চাপের মধ্যে পড়ল রাজনৈতিক অঙ্গন

থেকেও।

পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পণ করে তখন আমি Oxford-এ। কিছুদিন আগে রানি এলিজাবেথের থেকে বৃত্তি পেয়েছিলাম যা Oxford-এ আমার পরিবারকে দেখাশোনা করতে সহজ হয়েছিল। আমার বৃত্তির জন্য কিছু একাডেমিক কাজ ছিল, বাদবাকি অংশ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে গেলাম। আমি এরপর Oxford-এ থাকা অবস্থায় আমার কিছু চিন্তাভাবনা প্রয়োগ করলাম। আমার পরিবারের থাকা প্রসঙ্গে এবং বৃত্তি গ্রহণের সাফল্যের সময় একটি বই লেখব, তাতে থাকবে স্বাধীনতার অতীত ইতিহাস। যাই হোক, পূর্বাভাস অনুসারে আমাকে বালাদেশে আবার বসবাসের যোগ্য করে তুলল। বাংলাদেশের উদ্দেশে কলকাতা হয়ে যেতে হলো। কারণ, সরাসরি ঢাকায় কোনো বিমন চলাচল করতো না। কলকাতায় থাকার সময় আমার সাথে দেখা হয় অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন, ডঃ স্বদেশ বোস এবং ডঃ আনিসুজ্জামান আগের চাইতে আরো ব্যস্ত হয়েছেন পেপার তৈরিতে, উদ্বাস্তু ও কাঠামোগত উন্নয়ন প্রসঙ্গে, কেননা যুদ্ধে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ঢাকায় গিয়ে মোশাররফ বাংলাদেশ ক্যাবিনেটে যোগদান করেছে এবং তার পরিবারে ফিরে এসেছে। ৩১ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে মোশাররফ এবং আমি ও আমাদের সঙ্গী মোঃ কামরুজ্জামান এবং বেগম জোহরা তাজউদ্দীন DC-3 ভারতীয় বিমানে ফিরে এলাম। আমরা তাজউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে বিমানবন্দরে মিলিত হলাম, তিনি প্রথম প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের। শেষবার আমি তাকে দেখি এপ্রিলে, সেই সংকটময় মুহূর্তে আমি ঐতিহাসিক দিনগুলোর কথা লিখছি। একদিন শীতের বেলা কিন্তু সূর্য উঠেছিল। এই পর্যায়ে আমার কাছে মনে হলো নতুন বছরের আগমন ঘটেছে নতুন বিশ্বকে আশার ও সুযোগের বাণী শোনাতে। হতাশায় ডুবে যাওয়া ও যুদ্ধে বিধ্বস্ত একটি দেশ বাংলাদেশকে।

(এই প্রবন্ধটি History of War of Independence: Documents, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে নেয়া হয়েছে)।

পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি

জুলফিকার আলী ভুট্টো

আওয়ামী লীগের কঠোর অবস্থান

২ মার্চ ঢাকায় এবং তারপর সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবুর রহমান সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন। তার ডাকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ রাস্তায় নেমে এলো এবং প্রশাসন স্থবির হয়ে গেল আর গুণ্ডারা অবাঙালিদের জবাই করল। আওয়ামী লীগ নেতা বাংলাদেশের নামে নির্দেশনা প্রদান শুরু করলেন। সিভিল সার্ভেন্টদের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সহযোগিতা না করার নির্দেশ দিলেন। ব্যাংকগুলোকে আওয়ামী লীগের নির্দেশে পরিচালিত হতে বলা হলো। আওয়ামী লীগ পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ দিতে লাগল। হাইকোর্টের বিচারকগণকে তাঁদের বাসায় অবস্থান করতে বলা হলো। শেখ মুজিবুর রহমান একটি নব্য স্বাধীন দেশের একনায়ক হিসেবে আচরণ শুরু করলেন।

সৈন্যরা প্রথম দিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে কিছু পদক্ষেপ নিল। কিন্তু পরবর্তী দিনই পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের নির্দেশে তা উঠিয়ে নেয় এবং কার্যকরভাবে বিশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য পুনরায় হস্তক্ষেপ করা হয় নি। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর, যিনি সর্বদাই আওয়ামী লীগের কাছে নমনীয় ছিলেন, তাঁকে সরিয়ে জেনারেল টিক্কা খানকে বসানো হলো।

আওয়ামী লীগের নির্দেশে পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নতুন গভর্নরকে শপথবাক্য পাঠ করাতে অসম্মতি জানালেন। সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে আওয়ামী লীগের লোকেরা এবং গুণ্ডারা জনসাধারণের মাঝে সন্ত্রাস ছড়াতে লাগল। ঠাণ্ডা মাথায় অনেক অবাঙালিকে হত্যা করা হলো। অপরাধীদের বলপূর্বক জেল থেকে মুক্তি দেয়া হলো। কলকারখানা জ্বালিয়ে দেয়া হলো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হলো। দোকানপাট লুট করা হলো এবং বাড়িঘর পুড়িয়ে দেয়া হলো। সকল নিয়মিত কার্যাবলী স্তব্ধ হয়ে গেল। অর্থনীতি স্থবির হয়ে গেল। জনসাধারণকে নির্দেশ দেয়া হলো তারা যেন কেন্দ্রীয় সরকারকে ট্যাক্স না দেয়।

বাংলাদেশের নামে আওয়ামী লীগ ট্যাক্স নেয়া শুরু করল। ১৯৪৭ সালে যে সব শরণার্থী হিন্দুস্থান থেকে পালিয়ে এসেছিল, ১৯৭১ সালে পুনরায় উৎপাটিত হলো, এবার তাদের প্রতিশ্রুত ভূখণ্ডে। তারা জাহাজ ঘাটে, বিমানবন্দরে রেলস্টেশনে দলেদলে হাজির হলো পশ্চিমাঞ্চলে চলে যাবার জন্য। মাত্র কয়েক দিনের মধ্যে ভীতি প্রদর্শন ও প্রচারণার মাধ্যমে এবং প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষের উদাসীনতায় সাহসী হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের কার্যত শাসক হয়ে গেলেন। অসহযোগ আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ ত্রাসের রাজত্ব শুরু করল এবং পূর্ব পাকিস্তানে একটি সমান্তরাল সরকার চালু করল।

এই অবস্থার অবসান জরুরি হয়ে পড়েছিল। সামরিক জান্তা এসব ভীতিকর অবনতিকে দমনের জন্য এবং কর্তৃত্ব বজায় রাখতে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছিল। এই উদ্দেশ্যের অংশ হিসেবে ৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করার জন্য এবং জাতীয় সংসদ সভার তারিখ নির্ধারণের জন্য রাজনৈতিক নেতাদের ১০ মার্চ বৈঠকের আহ্বান জানান। পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবন করে আমি প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণ গ্রহণ করালাম। পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাও বৈঠকে অংশগ্রহণে সম্মত হলো। কিন্তু মুজিবুর রহমান তৎক্ষণাৎ অবজ্ঞাভরে এই আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন। সুতরাং এই সভা অনুষ্ঠিত হলো না। অন্যদিকে আওয়ামী লীগ নেতারা পূর্ব পাকিস্তানকে অধিক নিয়ন্ত্রণে পাওয়ার জন্য আরও ব্যবস্থা নিতে থাকল। ক্রমান্বয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে লাগল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ স্থবির হয়ে গেল।

৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আমাকে রাওয়ালপিন্ডিতে আমন্ত্রণ জানালেন। আমরা ৫ তারিখ প্রেসিডেন্টের সাথে মিটিং করলাম যে চরম সংকট থেকে উত্তরণের জন্য আমাদের সাধ্যের সম্ভব সবকিছু করব। তিনি আমাদের বললেন ১৫ ফেব্রুয়ারিতে নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা যেন পীড়াপীড়ি না করি। কারণ, তাঁর গৃহীত 'Legal Framework Order' এ পর্যন্ত নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা আছে। আমরা তাঁকে বললাম যে, আমাদের মতে ঐ অর্ডার অকার্যকর হয়ে যাবে। কারণ, সংসদ অধিবেশন ডাকার পর স্পিকার নির্বাচন হয়ে গেলে সংসদই হবে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। নির্বাচনের প্রাক্কালে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি এই অর্ডারটি জনসাধারণের সার্বভৌমত্বের জন্য ক্ষতিকর বলে এর বিপক্ষে প্রচারণা চালিয়েছিল। কিন্তু তখন সংসদের সার্বভৌমত্ব এক জিনিস কিন্তু এটাকে কৌশল হিসাবে ব্যবহার করে অপসারণের চেষ্টা করা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। এটা আন্তর্জাতিক অবস্থানকেও স্বীকৃতির প্রশ্নে জটিল করে তুলবে। আমরা তুলে ধরলাম যে সংসদে একবার পাস হয়ে যাওয়া "সংসদীয় বিলকে" অনুমোদন না

করে "Legal Frame Work Order" এর বাস্তবায়ন প্রেসিডেন্টের জন্য কঠিন হবে। আমরা তাঁকে (প্রেসিডেন্টক) বললাম যে আমাদের মতে নির্দেশটা একটা বাতিল চিঠিতে পরিণত হয়েছে কিন্তু মহাসংকটের কথা ভেবে আমরা তাঁর আশ্বাস গ্রহণে সম্মত হলাম যদি তিনি তা জাতির কাছে পুনর্ব্যক্ত করেন।

৬ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া রেডিওতে জাতির উদ্দেশে ঘোষণা করলেন যে ২৫ মার্চ জাতীয় সংসদের অধিবেশন বসবে। তিনি বললেন, সশস্ত্র বাহিনী প্রধান হিসাবে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতা বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর এবং তাঁর 'Legal Frame Work Order' তাঁদের জন্য একটা নিশ্চয়তা যাঁরা শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে শঙ্কিত যে, এটা পাকিস্তানের অখণ্ডত্বকে বিপজ্জনক করতে পারে।

৭ মার্চ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এক জনসভায় ভাষণ দিলেন। সেই মিটিং-এ তিনি সশস্ত্র বাহিনীর তীব্র সমালোচনা করলেন। তাঁর জনগণ 'স্বাধীন দেশের স্বাধীন জনগণ' না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। তবে তিনি একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করলেন না। ৬ মার্চ রাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মুজিবুর রহমানকে কঠিন কোনো পদক্ষেপ নেয়া থেকে বিরত থাকার জন্য বার্তা পাঠালেন এইজন্য যে তিনি নিকট ভবিষ্যতে আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে পুনরায় আলোচনা শুরু করবেন। সম্ভবত এই বার্তাটি মুজিবুর রহমানকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা থেকে বিরত রেখেছিল। তবে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় নতুন করে চার দফা পেশ করলেন। তিনি অতি সত্বর সামরিক আইন উঠিয়ে নিয়ে জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি জানালেন। তার পরিবর্তে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর গুলিবর্ষণের তদন্ত এবং সেনাবাহিনীকে ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার দাবি জানালেন। তিনি বললেন যে যখন তাঁর চার দফা দাবি মেনে নেয়া হবে তখনই কেবল তিনি ২৫ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদানের কথা বিবেচনা করবেন।

চরম অচলাবস্থা দেখা দিল এবং এই অচলাবস্থা নিরসনের জন্য ১০ মার্চ আমি নিম্নলিখিত টেলিগ্রামটা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে পাঠালাম।

"সম্প্রতি আমাদের দেশে ঘটে যাওয়া ঘটনা প্রবাহে আমি গভীরভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন। আমি সেই দেশবাসীর জন্য ব্যথিত যাঁরা এই সংকটে জীবন হারিয়েছেন। আমি শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের জন্য সমবেদনা জানাচ্ছি। আমরা পাকিস্তানের জন্য একটি নতুন আইনের অন্বেষণ করছি যেখানে এক মানুষের উপর অন্য মানুষের কিংবা এক অঞ্চলের উপর অন্য অঞ্চলের শোষণের অবসান হবে। এই ধরনের নতুন আইন শুধু শাসনতন্ত্রে নয় বরং সকল পাকিস্তানির হৃদয়ে ধ্বনিত করার জন্য; আসুন সকলে কঠোর চেষ্টা করি। আমরা চরম সংকটের

মুখোমুখি।

আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ পরীক্ষার সম্মুখীন। আমাদের উভয়েরই কঠোর দায়িত্ব আছে এবং পাকিস্তানকে ভয়াবহ দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষার জন্য মানুষের সাধ্যের মধ্যে সম্ভাব্য সকল কিছু করা হবে। আমাদের সকলের একই উদ্দেশ্য থাকতে হবে যাতে পাকিস্তান রক্ষা পায় এবং শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে যেখানে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চল তাদের পূর্ণ অংশগ্রহণ করতে পারে।

যে দুঃখজনক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে তাতে আমার বিশ্বাস যে, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলকে অবশ্যই অনতিবিলম্বে একটি ঐকমত্যে পৌঁছাতে হবে এবং যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তানকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে।

বর্তমান সমস্যা নিরসনের জন্য পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জনগণকে একমতে আনার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। বিগত ২৩ বছরের সৃষ্ট সকল তিক্ততা ও অবিশ্বাস দূর করার জন্য সকল পদক্ষেপ নেয়া হবে। প্রতিটি প্রচেষ্টা হবে যাতে পাকিস্তানের জনগণ ভাইয়ের মতো হাতে হাত মিলিয়ে ও সৌহার্দ্য বজায় রেখে এগিয়ে যেতে পারে। আমি পুনরায় অনতিবিলম্বে আপনার সাথে আলাপের জন্য ঢাকা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। এর মাধ্যমে একটি সাধারণ সমাধানের পন্থা বের করতে হবে যাতে করে দেশের সংকট সমাধান করা যায় এবং যাতে করে জাতীয় সংসদ শাসনতন্ত্রের অবকাঠামোতে এগিয়ে যেতে পারে। ভবিষ্যতে যেন জনগণ কিংবা ইতিহাস না বলে সে, আমরা ব্যর্থ হয়েছি।"

দুই দিন পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ সরাসরি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন এবং বললেন, আওয়ামী লীগ টেলিগ্রামকে বিবেচনায় আনতে চায় না।

আওয়ামী লীগ বিদ্রোহের পথে অবিচল থাকল। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলীতে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ হতবাক হলো। মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের নামে নির্দেশাবলী প্রদান অব্যাহত রাখলেন, যার কিছু ইন্ডিয়ার সাথে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃচালু সম্পর্কিত। বহুস্থানে কায়েদে আজমের ছবি পুড়িয়ে ফেলা হলো এবং জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হলো। রবীন্দ্রনাথের "আমার সোনার বাংলা"কে বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের বিষয় বিবেচনাধীন ছিল। রাষ্ট্র পরিচালিত রেডিও এবং টেলিভিশন আওয়ামী লীগের নির্দেশে পরিচালিত হতে লাগল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হলকে রবীন্দ্র হল নামে পুনঃ নামকরণ করা হলো। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলের কাছে বিশ্ব দরবারে

বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য আবেদন পাঠানো হলো। বাঙালি চরমপন্থিরা লন্ডনে বাংলাদেশের পক্ষে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দফতরের বাইরে পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়ে দেয়া হলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাঙালি ছাত্ররা ওয়াশিংটনে পাকিস্তানি দূতাবাস ও নিউইয়র্কে স্থায়ী মিশন অফিস দখলের চেষ্টা করে। যেদিন থেকে আওয়ামী লীগ বিদ্রোহ ঘোষণা করে সেদিন থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে বাঙালি চরমপন্থিরা তিরস্কার, গালাগালি ও অপদস্থ করে।

পশ্চিম পাকিস্তানের পরাজিত নেতারা পরিস্থিতিকে পুঁজি করার চেষ্টা করল। তাঁরা সকল কিছুর জন্য "পিপলস্ পার্টি"কে দায়ী করল। সংবাদপত্র যা বড় বড় ব্যবসায়ীদের হাতে ছিল, জনমতকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খল করার জন্য এসব আক্রমণে যোগদান করল। পিপলস্ পার্টির উপর দোষারোপের কোনো পন্থাই বাদ দেয়া হলো না। পশ্চিম পাকিস্তানের সর্ববৃহৎ পার্টির দুর্নাম করার জন্য তাদের নেশাগ্রস্ত প্রচেষ্টা পাকিস্তানের ভাগ্যের কথা তাদেরকে ভুলিয়ে রাখল। তাদের মিথ্যা ও বিদ্বেষপরায়ণ প্রচারণা পিপলস্ পার্টি ও এর চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রচার করা হলো। বলা হলো যে, পিপলস্ পার্টির ক্ষমতা ভাগাভাগির একগুঁয়েমিতে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। স্বার্থান্বেষী মহল ঘৃণ্য মিথ্যা প্রচার করল যে, মুজিবুর রহমান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যানকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দিতে অস্বীকার করায় আওয়ামী লীগের সাথে আমাদের আলোচনা ভেঙে গিয়েছে। এটা যদি শুধু দফতরের বিষয়ে প্রশ্ন হতো, মুজিবুর রহমান অবশ্যই তাঁর ছয় দফার স্বীকৃতির বিনিময়ে পিপলস্ পার্টিকে যে-কোনো প্রস্তাব দিত। উপরন্তু যিনি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের গণতান্ত্রিক ভোটে নির্বাচিত অবিসংবাদিত নেতা এবং যিনি তাঁর দেশের স্বার্থরক্ষার্থে ১৯৬৬ সালে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ছেড়ে এসেছেন, পাঁচ বছর পরে রাষ্ট্রের বিনিময়ে সেই একই পদ দখলের চেষ্টা করা সেই ব্যক্তির জন্য কোনোই অর্থ বহন করে না।

পশ্চিমাঞ্চলের অনেক রাজনৈতিক নেতা দাবি করলেন যে অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের জাতীয় এবং প্রাদেশিক উভয় অঞ্চলের সর্বময় ক্ষমতা আওয়ামী লীগের হাতে হস্তান্তর করা উচিত। মুজিবুর রহমান দুই অঞ্চলের মধ্যে শেষ সম্পর্কের ডাক দিলেন। এই সময়ব্যাপী এই দাবি অব্যাহত থাকল। এই মুহূর্তে আওয়ামী লীগের হাতে সর্বময় ক্ষমতা হস্তান্তরের অন্তর্নিহিত অর্থ ছিল ছয় দফার পূর্ণ স্বীকৃতি। পশ্চিমাঞ্চলের একাধিক রাজনৈতিক নেতা প্রকাশ্যে ছয় দফা মেনে নিয়েছিলেন। এসব রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসাহিত করার জন্য ততটুকুই দায়ী যতটুকু তিনি নিজে এটার জন্য দায়ী ছিলেন। যে গণহত্যা

হয়েছিল তার জন্য সমভাবে তারা দায়ী। একই রাজনৈতিক নেতারা এখন শুধু তাদের নিকট অতীতকে অস্বীকারই করে না বরং এক পাকিস্তানের পতাকাতলে আওয়ামী লীগের সাথে একটা সমঝোতায় পৌছানোর জন্য পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির সর্বাত্মক চেষ্টার বিরুদ্ধে গোপন অভিযান পরিচালনা ও সম্পাদন করছে।

১২ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ঢাকার পথে করাচি এসে পৌছলেন এবং আমি তাঁর সাথে ১৪ তারিখ দেখা করলাম। আমি তাঁকে আমার পার্টির অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলাম এবং সর্বশেষ ঘটনাবলীর উপর আমাদের সমঝোতার বিবরণ দিলাম। আমি তাঁকে বললাম যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ৭ মার্চের দেয়া চার দফা আমরা নীতিগতভাবে সমর্থন করেছি। কিন্তু অন্তর্বর্তীকালীন বা ফাইনাল যে-কোনো বাস্তবায়ন আমাদের সম্মতির মাধ্যমে হতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের এবং মোটের উপর সমগ্র পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা আমাদের একটা দায়িত্ব ছিল। রাষ্ট্রপতিকে জানানো হলো যে, গুলিবর্ষণ ঘটনার তদন্ত এবং সৈন্যদের ছাউনিতে ফিরে যাওয়ার দাবি অবিলম্বে মেনে নেয়া যেতে পারে। সামরিক আইন প্রত্যাহার এবং জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর-এই দুই দাবিও আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য ছিল। তবে সামরিক আইন প্রত্যাহার ও ক্ষমতা হস্তান্তর পদ্ধতি সাধারণ সমঝোতার মাধ্যমে নির্ণীত হওয়া উচিত ছিল। এই কারণে আমাদের অংশগ্রহণ না করার দরুন আলোচনা সফল হয় নি। তাঁকে জানানো হয়েছিল যে, আমরা ঢাকা ভ্রমণে প্রস্তুত যদি মুজিবুর রহমান আমাদের সাথে যুক্তিযুক্ত আলোচনা করেন।

ঐদিন দুপুরে আমি করাচিতে একটি জনসভায় আমাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করি। আমি বলেছিলাম যে, ক্ষমতা দুই বৃহৎ পার্টির নিকট হস্তান্তর করা উচিত এবং আমরা একটা সমঝোতায় আসার ব্যাপারে সম্মত ছিলাম কিন্তু সেটা পাকিস্তানের অস্তিত্বের বিনিময়ে নয়। জনগণ এই বক্তৃতাকে স্বাগত জানিয়েছিল কিন্তু বিরুদ্ধ সংবাদপত্র এবং আমাদের বিরোধীরা এটাকে বিকৃতভাবে প্রচার করল যে, আমি দুই পাকিস্তান চেয়েছি; শুধু সংবাদপত্র নয় বরং সকল স্বার্থান্বেষী মহল একত্রিত হয়ে জনমনে বিভ্রান্তি প্রচার করতে লাগল। এই সকল কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল পিপলস্ পার্টিকে কোণঠাসা করা, একে অবজ্ঞা করা এবং সংকটের জন্য একে দায়ী করা। নিন্দনীয় রাজনীতিবিদরা এবং পরাজিত দলগুলো পিপলস্ পার্টির বিরুদ্ধে জোট বাঁধলো। পরবর্তী দিন অপরাহ্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জোরালো প্রতিবাদ জানালাম এবং আমাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলাম। ক্ষমতা দুই অঞ্চলের বৃহত্তম পার্টির নিকট এবং প্রদেশগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট হস্তান্তর করা উচিত।

যে-কোনো বিবেচনায় যুক্তিসঙ্গত কারণে জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার দাবি কোনো তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি যা ১ মার্চের ঘোষণার সৃষ্টি করেছিল।

মুজিবুর রহমানের তীব্র প্রতিক্রিয়ার কারণ ছিল অন্য। জাতীয় সংসদের মাধ্যমে সাংবিধানিকভাবে তার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে অনুধাবণ করে, তিনি তাঁর কৌশল পরিবর্তন করে সংঘাতের পথ বেছে নিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ পরাজিত দল তাঁকে উৎসাহিত করল। কারণ, সেনাবাহিনী কার্যকরভাবে কোনো হস্তক্ষেপ করেনি এবং তিনি মনে করলেন যে তাঁর দাবির প্রতি তাদের সমর্থন আছে। অবস্থার এত অবনতি ঘটলো যে প্রেসিডেন্টের পূর্ব পাকিস্তান সফরের ঘোষণা হলে, মুজিবুর রহমান দম্ভের সাথে ঘোষণা করলেন, প্রেসিডেন্টকে ঢাকায় 'বাংলাদেশের অতিথি' হিসাবে স্বাগত জানানো হবে। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৫ মার্চ ঢাকার উদ্দেশে করাচি ত্যাগ করলেন।

১৬ মার্চের রাতে প্রেসিডেন্ট আমাকে ১৯ মার্চ ঢাকা যাওয়ার জন্য বার্তা পাঠালেন। পরের দিন আমি উত্তর পাঠালাম। আমি তাঁকে ১৯ মার্চ ঢাকা ভ্রমণের আমার সদিচ্ছার আশ্বাস দিলাম যদি সেই আলোচনায় মুজিবুর রহমান অংশগ্রহণ করেন। যেহেতু প্রেসিডেন্ট আমাদের ইচ্ছার কথা জানেন, সুতরাং আমরা মনে করলাম শুধুমাত্র তাঁর সাথে দ্বিতীয় দফা আলোচনার জন্য ঢাকা যাওয়ার কোনো যৌক্তিক কারণ নেই। যেটা প্রয়োজন ছিল, তাহলো পিপলস্ পার্টি। আওয়ামী লীগের মধ্যে আলোচনা এবং আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে এই আলোচনা হবে কিনা। এই বিষয়ে আমি ব্যাখ্যা চাইলাম ১৮ মার্চ, করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই ব্যাখ্যা আমি তুলে ধরলাম। ইতিমধ্যে ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্টের 'প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার' আরও একটি বার্তা পাঠালেন যে, প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপের জন্য আমার ঢাকা যাওয়া প্রয়োজন। তাঁর এই বার্তা মোতাবেক মুজিবুর রহমানের সাথে প্রেসিডেন্টের আলোচনার ফলে আমার সাথে আলাপ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে। যখন জানতে পারলাম যে আমাকে ঢাকা যেতে হচ্ছে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনার জন্য; মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার জন্য নয়, তখন আমরা তা বিনয়ের সাথে প্রত্যাখ্যান করলাম।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের একাধিক মিটিং এবং ঢাকায় পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু রাজনীতিবিদের কার্যাবলী অনেক জল্পনা-কল্পনার সৃষ্টি করল। সংবাদপত্রগুলো মিথ্যা গুজবে ভরে গেল, মুহূর্তের মধ্যে

চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ল। কোনো কোনো সংবাদে প্রকাশ পেল যে, আলোচনা সন্তোষজনকভাবে এগুচ্ছে না। অন্য সংবাদে প্রকাশ পেল যে আলোচনা সফলভাবে সমাপ্তির পথে এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিকে বাদ দিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। এসব গুজব গুরুত্ব পেল যখন প্রেসিডেন্টের লিগ্যাল এডভাইজারকে ঢাকায় ডেকে পাঠানো হলো। ঢাকায় তাঁদের উপস্থিতি দেখে মনে করা হলো একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। এই অনিশ্চয়তায় এবং স্বার্থান্বেষী মহলের জোরদার ষড়যন্ত্রের কারণে ১৮ মার্চ প্রেসিডেন্টকে আমি একটি বার্তা পাঠালাম। বার্তায় আমি জানালাম যে, ঢাকায় যে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হচ্ছে তা আমরা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করছি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দল হিসাবে জনগণের প্রতি আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে, তারা সঠিকভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারছে কিনা এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টিকে বাদ দিয়ে যে-কোনো অন্তর্বর্তীকালীন বা স্থায়ী সমাধান আমরা প্রতিহত করব। সর্বজনবিদিত আমাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলাম যে, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নিকট অগ্রহণযোগ্য যে-কোনো ব্যবস্থা ব্যর্থ হবে। যেহেতু সেটা পাকিস্তানি জনগণের নিকট অগ্রহণযোগ্য হবে।

১৯ তারিখ সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের নিকট থেকে বার্তা পেলাম আমার উপদেষ্টাদের নিয়ে আমি যেন অতি সত্বর ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হই। বার্তায় বলা হলো যে, শেখ মুজিবুর রহমান আমার ও প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনায় সম্মত হয়েছেন। আমাদের দাবি মেনে নেয়ায় আমরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। ২০ মার্চ সকালে করাচিতে পিপলস্ পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির শীর্ষ নেতাদের এক জরুরি মিটিং তলব করে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য এবং ঢাকা সফরের জন্য একটি খসড়া তৈরি করতে বললাম। ২১ মার্চ আরো কয়েকজন সহকর্মী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞসহ ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমাদের যাত্রার সাথে সাথে জড়িত উদগ্রীব দৃষ্টি ঢাকার পানে রইল। এমনকি রাস্তার পথচারীও জানাল যে, পরিস্থিতি একটি সিদ্ধান্তের দিকে এগুচ্ছে। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যেই ঢাকাকে পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ণয় করতে হবে।

ঢাকা: সর্বশেষ সমাপ্তি

ঐদিন বিকাল ৪টা ৩০ এ আমরা ঢাকা পৌঁছলাম। আমাদের বিমানের চারটি ইঞ্জিনের মধ্যে দুইটি বিকল হয়ে যাওয়ায় সেটা ছিল জরুরি অবতরণ। যখন পূর্ব পাকিস্তানের উপর উড়ছিলাম এবং বিমান ঢাকায় অবতরণের সময় সেখানকার সবুজ ভূমি দেখে অবর্ণনীয় অনুভূতিতে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, আমাদের এই ভূমি এবং আমাদের এই জনগণ যাঁরা পাকিস্তান সৃষ্টিতে বিপ্লবী ভূমিকা রেখেছিল, তারা আজ ভেঙে আলাদা হয়ে যেতে বসেছে। আমি কল্পনা করতে পারছিলাম না আমাদের সাত কোটি বিশ লক্ষ লোক পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে বিগত কয়েকবছর এত বিদ্বেষের সৃষ্টি হয়েছে যাতে আমাদের ভাই-বোনরা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে, যে রাষ্ট্রের জন্য অনেকেই জীবন দিয়েছে। দেশবিভাগের সময় পাকিস্তান পূর্ব পাঞ্জাব, পশ্চিমবাংলা ও আসামকে হারিয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর প্রদেশ ইন্ডিয়ার হাতে রয়ে গেছে। এখন দুই যুগ পরে আমাদের দেশের সবচাইতে জনবহুল অংশের ভাগ্য অনিশ্চিত।

বিমান থেকে নামার সাথে সাথে সেনাবাহিনীর লোকেরা আমাদের ঘিরে ধরল এবং বিমানবন্দরের দায়িত্বে নিয়োজিত সৈন্যরা এবং সেনা ছাউনির ভিতরের ও আশপাশের শরণার্থীরা করতালির মাধ্যমে আমাদের স্বাগত জানাল। এসব উদ্বাস্তুর অবস্থা ও হৃদয়বিদারক কাহিনী ভোলার নয়। বিশেষ অতিথিরূপে যাওয়ার পর ব্রিগেডিয়ার আরবাব খানের কাছ থেকে জানতে পারলাম শেখ মুজিবুর রহমান পীড়াপীড়ি করছেন যে, তাঁর দলের লোকজন আমাদের দেখাশোনা করবেন। ফলে সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে আমাদের ঢাকায় অবস্থানের ব্যবস্থা অওয়ামী লীগের হাতে চলে গেছে।

আওয়ামী লীগের লোকজন বিমানবন্দরে কয়েকটি ট্যাক্সি নিয়ে এসেছেন। আমার কয়েকজন সহকর্মী এতে বিচলিত হলেন। তবে আমি এর প্রকাশ্য গুরুত্ব দেয়ার কারণে এটা গ্রহণ করতে সম্মত ছিলাম। তবে একজন কর্নেল পরামর্শ দিলেন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হোটেল পর্যন্ত আমাদের সেনাবাহিনী প্রহরায় যাওয়া নিরাপদ হবে। শীঘ্রই আমরা বুঝলাম এটা ভালো পরামর্শ। হোটেলের পথে আমরা হঠকারী অভ্যর্থনার সম্মুখীন হলাম যা পূর্ব পরিকল্পিত মনে হয়েছিল। হোটেল লবীতে আওয়ামী লীগের লোকজন চিৎকার করে গালাগালি করল এবং গুণ্ডামি আচরণ করল। কিছু সময়ের জন্য আমাদের রুমে যাওয়ার জন্য লিফ্‌ট বন্ধ রাখা হলো। যখন আমরা রুমে পৌঁছলাম তখন ব্রিগেডিয়ার আরবাব খান তাঁর হেড কোয়ার্টারকে আওয়ামী লীগের লোকজনের দ্বারা আমাদের অভ্যর্থনার বিবরণ জানালেন। তারপর মুজিবুর রহমানকে জানানো হলো যে, তাঁর লোকজন পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় সেনাবাহিনী পুনরায় আমাদের ঢাকায় অবস্থানকালীন দায়িত্ব গ্রহণ করেছে।

ঐ দিন সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ এ আমি রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করলাম। প্রেসিডেন্ট আমাকে ১৬ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে

অনুষ্ঠিত শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কয়েকটি মিটিং এর ব্যাপারে অবহিত করলেন। মিটিং-এ অগ্রগতির ফলে ১৮ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান একটি সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন, যেখানে তিনি উল্লেখ করেন আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। ফলে আওয়ামী লীগের বিশেষজ্ঞরা এবং প্রেসিডেন্ট প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করেছেন। প্রেসিডেন্ট আমাকে আওয়ামী লীগের প্রস্তাব অবহিত করলেন।

প্রস্তাবের প্রধান বিষয় ছিল অতি সত্বর সামরিক আইন তুলে নিতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাঁচটি প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এই প্রস্তাব অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করতে থাকবেন, যেভাবে এটা চালু আছে অথবা উনি যদি মনে করেন তবে উপদেষ্টাদের (যারা জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা নির্বাচিত নন) সাহায্য নিতে পারেন।

এটাও প্রস্তাব করা হয় যে প্রথম থেকেই জাতীয় সংসদকে দুটি কমিটিতে ভাগ করা হবে। একটি গঠিত হবে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যম এবং অপরটি গঠিত হবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিদিধের মাধ্যমে। পশ্চিম পাকিস্তানের কমিটি বসবে ইসলামাবাদে এবং পূর্ব পাকিস্তানের কমিটি বসবে ঢাকায়। কমিটিগুলো নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাদের রিপোর্ট তৈরি করবে এবং জাতীয় সংসদে তাদের প্রস্তাব জমা দেবে। তারপর জাতীয় সংসদের দায়িত্ব হবে উভয় কমিটির প্রস্তাবগুলোর উপর আলোচনা ও বিতর্কের মাধ্যমে একসাথে বসবাসের পন্থা ও উপায় উদ্ভাবন করা। একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার মাধ্যমে যেটা হবে ১৯৬২ সালের শাসনতন্ত্রের একটি সংশোধিত রূপ, ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্ষমতা প্রদান করা হবে। কিন্তু প্রেসিডেন্টের অনুমোদন সাপেক্ষে গ্রহণযোগ্য সমঝোতার মাধ্যমে এর পরিমাণ নির্ধারিত হবে। প্রেসিডেন্টের ঘোষণা আকারে পুরো নকশাটি প্রকাশ করা হবে।

প্রস্তাবটি বর্ণনা করে প্রেসিডেন্ট আমাকে জানালেন তিনি মুজিবুর রহমানকে পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন যে, প্রস্তাবের সাথে তাঁর একাত্মতা থাকবে আমার সম্মতির উপর। তবে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতারাও সম্মত হন তাহলে এটা বেশি সন্তোষজনক হবে। প্রেসিডেন্ট আমাকে আরো জানালেন প্রস্তাবের প্রতি সম্মতি জানিয়ে তিনি নেতাদের নিকট থেকে চিঠি পেতে চান। তাঁর মতে এই চিঠিগুলো তাকে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ নিতে অধিক ক্ষমতা প্রদান করবে। প্রস্তাবে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য ছিল কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তখন এমন অবস্থা ছিল

যেখান থেকে ফিরে আসার রাস্তা ছিল না। যে-কোনো প্রস্তাব যা অচলাবস্থা দূর করতে পারে তাকে সর্বাত্মক বিবেচনায় আনতে হতো। এই প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে প্রাথমিক আলোচনা হলো এবং আমি তাঁকে আমার বিবেচিত মতামত জানাবো। আমার প্রস্থানের পূর্বে প্রেসিডেন্ট ভবনে শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার সাথে তাঁর আলোচনা হবে।

পরিকল্পনা বিপদসংকুল ছিল। আমি ঢাকা পৌঁছামাত্র প্রথমেই রাষ্ট্রীয় কার্যাবলো দেখলাম। পর্যালোচনা জন্য আমি অল্প সময় চেয়েছিলাম। হোটেলে ফিরে আমি আমার সহকর্মীদের দুই কমিটি প্রস্তাব এর ব্যাপারে অবহিত করলাম। তাঁরা তাঁদের আশঙ্কা প্রকাশ করলেন যে, এই প্রস্তাবে দুই পাকিস্তানের বীজ বহন করছে এবং আমাকে তাতে সম্মতি না দেয়ার জন্য পরামর্শ দিলেন। আমার নিজের প্রতিক্রিয়ার অনুরূপ তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে আমি স্বস্তি বোধ করলাম। আমরা আরও সম্মত হলাম যে, এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত আলোচনায় কিংবা চিঠি বিনিময়ের মাধ্যমে সমাধান হতে পারে না। এটা সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিকট জাতীয় সংসদে পেশ করা উচিত এবং জনগণের পূর্ণ অবহতির মাধ্যমে সমর্থিত হওয়া উচিত। দুই বা অধিক রাজনৈতিক নেতা সমগ্র সংসদের উপর অর্পিত সংসদীয় ও বিধান সম্বন্ধীয় ক্ষমতা অবজ্ঞা করতে পারে না।

২২ তারিখ সকালে নির্ধারিত সময়ের কয়েক মিনিট পূর্বে আমি প্রেসিডেন্ট ভবনে উপস্থিত হলাম। মুজিবুর রহমান ঠিক ১১টায় উপস্থিত হলেন। আমরা একে অপরকে সম্বোধন করে কিছু গতানুগতিক কথা বললাম। তারপর আমাদেরকে প্রেসিডেন্টের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। আরও একবার গতানুগতিক আলাপ বিনিময় হলো। বিমানবন্দর থেকে হোটেল পর্যন্ত এবং হোটেলের অভ্যন্তরে ঘটে যাওয়া ঘটনার জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং বললেন জনগণের অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তিনি চেষ্টা করেছেন, কিন্তু যেহেতু তীব্র অনুভূতি ছিল সেহেতু প্রতিটি লোকের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা খুব কঠিন ছিল। আমি বললাম এইসব ঘটনাবলো আমাকে বিব্রত করেনি যেহেতু আমার উদ্দেশ্য একটি সন্তোষজনক সমাধানে উপনীত হওয়া এবং এসব কোনো কিছুই আমার নিকট কোনো ব্যাপার নয়। তারপর মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের প্রতি দৃষ্টি দিলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন তিনি আওয়ামী লীগের প্রস্তাবের প্রতি তাঁর চূড়ান্ত সম্মতি দিয়েছেন কিনা।

প্রেসিডেন্ট তাঁতে মনে করিয়ে দিলেন যে, এই ব্যাপারে আমার সম্মতিরও প্রয়োজন আছে এবং এই কারণে এই আলোচনায় আমি উপস্থিত হয়েছি। এর

উপর মুজিবুর রহমান বললেন যে প্রেসিডেন্টের নিকট প্রস্তাব রাখা হয়েছে। প্রেসিডেন্টের উচিত মিঃ ভুট্টোকে রাজি করানো। তিনি আরও বললেন যে, মিঃ ভুট্টো নীতিগতভাবে প্রস্তাবে রাজি হলেই তখন তাঁর সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তা না হওয়া পর্যন্ত এ আলোচনা হবে অনানুষ্ঠানিক এবং এই আলোচনা শেষে তিনি সংবাদিকদের বলবেন প্রেসিডেন্টের সাথে তিনি দেখা করেছেন এবং ঘটনাক্রমে মি. ভুট্টো তখন উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট বললেন এটা ভালো নয় কিন্তু মুজিবুর রহমান অনড় রইলেন। আলোচনায় সব সময় মুজিবুর রহমান কিন্তু উত্তেজিত ছিলেন। উত্তেজনা নিরসনের জন্য প্রেসিডেন্ট নাশতা ও কফির নির্দেশ দিলেন। কফি খাওয়ার পরপরই মুজিবুর রহমান জানালেন তাঁর এক সহকর্মী খুব সকালে মারা গেছেন এবং তার জন্য তিনি তাড়ায় আছেন। এই বলে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে প্রেসিডেন্টের নিকট বিদায় নিলেন এবং গাড়িতে ওঠা পর্যন্ত আমি তাঁর সাথে থাকলাম।

আমাদের বের হওয়ার পথে আমরা মিলিটারি সচিবের রুমে পৌঁছালাম। শেখ মুজিবুর রহমান আমার সাথে কথা বলার জন্য জেনারেল মোহাম্মদ ওমার, জেনারেল ইসহাক, প্রেসিডেন্টের মিলিটারি সচিব এবং নৌবাহিনী প্রধানের সহকারী যাঁরা সেখানে বসে ছিলেন তাঁদেরকে সেখান থেকে যেতে বললেন। এইভাবে হঠাৎ তাঁর আচরণের পরিবর্তনে আমি আশ্চর্য হলাম। তিনি তাঁর হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে তাঁর পাশে বসালেন। তিনি বললেন যে পরিস্থিতি ভয়ানক এবং তা মোকাবিলা করার জন্য আমার সাহায্য তাঁর প্রয়োজন। এই মুহূর্তে আমরা রুমে ছারপোকার কথা ভেবে বাড়ির বারান্দায় এগিয়ে গেলাম এবং প্রেসিডেন্টের অতিথি কক্ষের পেছনের বারান্দায় বসলাম।

মিলিটারি সেক্রেটারির রুমে যা বলেছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান তার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং আরও বললেন, অবস্থা এখন অনেক দূর গড়িয়ে গেছে সেখান থেকে ফেরার পথ নেই। তাঁর মতে সবচেয়ে উত্তম পন্থা ছিল তাঁর প্রস্তাবে আমার সম্মতি দেয়া। তিনি জোর দিয়ে বললেন, এর আর কোনো বিকল্প নেই। তিনি আমাকে আরও বললেন, এখন তিনি বুঝতে পেরেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে পিপলস্ পার্টি একমাত্র শক্তি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতা তাঁর সময় নষ্ট করছেন। তিনি নিজেই আরও বললেন যে, যখন তাঁরা তার সাথে দেখা করেছেন তখন কেবলমাত্র খান আবদুল ওয়ালী খান ছাড়াও তিনি অন্তত একটি প্রদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন, সকলকে তিনি বকাবকি করেছেন। তিনি বললেন যে, এখন তিনি বুঝতে পারছেন আমাদের

দুইজনের সম্মত হওয়া অতি জরুরি। তিনি বললেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানে আমরা যা ইচ্ছা তা আমি করতে পারি। এই ব্যাপারে তিনি আমাকে সমর্থন দেবেন। বিনিময়ে পূর্ব পাকিস্তানকে আমার একা ছেড়ে দেয়া উচিত এবং তাকে সাহায্য করা যাতে আওয়ামী লীগের প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়। তিনি প্রস্তাব করলেন যে, আমি পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী হবো এবং তিনি হবেন পূর্ব পাকিস্তানের। তার মতে সংকট থেকে বের হয়ে আসার এই একমাত্র উপায়। তিনি সেনাবাহিনীর ব্যাপারে আমাকে সতর্ক করে দিলেন এবং তাদেরকে বিশ্বাস করতে নিষেধ করলেন, যদি তারা তাকে ধ্বংস করে তবে প্রথমে তারা আমাকেও ধ্বংস করবে। আমি বললাম ইতিহাস দ্বারা আমার ধ্বংস হওয়ার চাইতে মিলিটারি দিয়ে ধ্বংস হওয়া ভালো। তিনি তাঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়ার জন্য আমাকে চাপ দিলেন এবং প্রথম থেকেই দুই কমিটি স্থাপনে সম্মত হতে বললেন। তিনি আরও বললেন, বর্তমান পরিস্থিতিতে এককভাবে জাতীয় সংসদ বসা অসম্ভব। অনির্দিষ্টকালের জন্য এটা স্থগিত হওয়া উচিত। তিনি আরও বললেন তিনি আবার আমার সাথে দেখা করতে চান এবং তিনি আমাদের মাঝে একটি গোপন বৈঠকের ব্যবস্থা করবেন। ইতিমধ্যে তিনি মি. গোলাম মোস্তফা সাহেবকে তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতে বললেন। পরের দিন তিনি তাঁর একজন লোককে আমার কাছে পাঠাবেন মি. খানকে তাঁর বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য।

আমি মুজিবুর রহমানের নিকট ব্যাখ্যা করলাম যে জাতীয় সংসদ অধিবেশন বাতিল করার আমার অনুরোধ ছিল সরল বিশ্বাসের উপর এবং তাঁর প্রতিক্রিয়া বিনা কারণে উগ্র ছিল।

এর মাত্র কয়েক দিন পরে, তিনি মোটেই চান না যে সংসদ বসুক। তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে যে যোগাযোগ করেছেন এবং আমার সাথে তাঁর কথাবার্তা সংসদ অধিবেশনের আগে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা নিশ্চিত করছে। আমি তাঁকে বললাম, এই বিশেষ কারণে দুই বৃহত্তম দলের মধ্যে পূর্ব আলোচনার ব্যাপারে আমি জোর দিচ্ছি কিন্তু এই ব্যাপারে তিনি আমাদের প্রতিটি উদ্যোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। এইভাবে যদিও তিনি আমার যুক্তিসঙ্গত কারণে সংসদ অধিবেশন স্থগিতের দাবিকে ভুল বুঝেছেন এবং ভুল ব্যাখ্যা করেছেন, তথাপি ঘটনাপ্রবাহ আমার আগের অবস্থান সমর্থন করছে। আমি তাঁকে বললাম, তাঁর প্রস্তাবের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই আমি আমার সর্বাধিক সতর্ক বিবেচনা করব এবং একটি গ্রহণযোগ্য সমাধানে পৌঁছানোর জন্য সম্ভাব্য সব চেষ্টা করব। তবে প্রস্তাবের চূড়ান্ত আকৃতি যাই হোক না কেন এটা জাতীয় সংসদ দ্বারা পাস হওয়া

উচিত এবং প্রয়োজনবোধে প্রেসিডেন্টকে অধ্যাদেশ ঘোষণার ক্ষমতায়নের মাধ্যমে। আমি আরও জানালাম, সংসদের বাইরে এই প্রস্তাবের ব্যাপারে কোনো চিঠি দিতে আমি প্রস্তুত নই। আমি ব্যক্তিগতভাবে কিংবা আমার পার্টির পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব নিতে পারি না যখন রীতিমতো সংসদে জনপ্রতিনিধিগণ নির্ধারিত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনের অপেক্ষা করছেন।

মুজিবুর রহমান তৎক্ষণাৎ বিষয়টি মাথায় নিলেন। তিনি বললেন, "আপনি ঠিক বলেছেন, আমিও কোনো চিঠি দিব না। কিন্তু প্রথমে আপনি এটাকে প্রত্যাখ্যান করুন তখন আমি আপনাকে অনুরোধ করব।"

মুজিবর রহমান সংসদ অধিবেশনের ধারণা প্রত্যাহ্যার করলেন। এমনকি সংক্ষিপ্ত আকারেও এসব আর না বর্ণনা করে তিনি প্রস্থানের জন্য উঠে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে গেলাম এবং একে অপরকে বিদায়সম্ভাষণ জানালাম। আওয়ামী লীগ নেতার সাথে সেটা ছিল আমার শেষ সাক্ষাৎ।

প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে মুজিবুর রহমান সাংবাদিকদের জানালেন যে, তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেছেন এবং ঘটনাস্থলে আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁর উদ্যোগে আমাদের আলাদা আলাপের ব্যাপারে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নি। পরবর্তীতে আমি যখন হোটেলে ফিরি তখন সাংবাদিকরা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন শেখ মুজিব এবং আমার মধ্যে কোনো আলাদা আলাপ হয়েছে কিনা। উত্তরে আমি বলেছিলাম প্রেসিডেন্ট ভবন থেকে বের হয়ে শেখ মুজিব সাংবাদিকদের যে সাক্ষাৎ দিয়েছিলেন তার সাথে আমি কোনো দ্বিমত পোষণ করতে চাই না।

শেখ মুজিবকে বিদায়সম্ভাষণ জানিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে ফিরে গেলাম যিনি তাঁর অভ্যর্থনা কক্ষ থেকে বাহ্যত আমাদের লক্ষ্য করেছিলেন। প্রেসিডেন্ট যখন তাঁর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, "আপনাদের দু'জনের মধ্যে মধুচন্দ্রিমা"-তখন আমি উত্তরে বললাম যে, এই ধরনের আলাপ রাজনীতির একটা অংশ। আমি প্রেসিডেন্টকে ঐ আলাপের একটা ফিরিস্তি দিলাম যেগুলো সংকটের সাথে সম্পর্কিত ছিল, কিন্তু যেগুলো গোপন কথা ছিল সেগুলো এড়িয়ে গেলাম। আওয়ামী লীগ নেতার প্রস্তাবের ব্যাপারে আমার বিবেচিত মন্তব্যও আমি অবহিত করলাম।

আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বললাম প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় আমি কোনো দল হতে পারিনি যেহেতু এটা কার্যত দুই পাকিস্তানকে বোঝায়। এটাই

ছিল পরিকল্পনার ব্যাপারে আমার প্রধান আপত্তি কিন্তু এ ছাড়াও এটাতে আরো মারাত্মক ত্রুটি ছিল। একটা ব্যাপারে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন মাত্রায় স্বায়ত্তশাসনের বিষয় অগ্রহণযোগ্য, এটা বাদ দিলেও জাতীয় সংসদের অনুমোদন ছাড়া কার্যকী করা কঠিন হবে। তখন পুনরায় প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার ভিত্তি হবে সামরিক আইনের উৎস, সামরিক আইন প্রত্যাহারের ঘোষণায় প্রেসিডেন্ট ও কেন্দ্রীয় সরকার তাদের আইনগত অধিকার ও ক্ষমতা হারাবে। যদি জাতীয় সংসদ ডেকে জাতীয় ভিত্তিতে সর্বময় ক্ষমতার শেষ নতুন উৎসের সৃষ্টি না করা হয় তবে এইভাবে একটি শূন্যতার সৃষ্টি হবে। এইভাবে কোনো জাতীয় উৎসের অবর্তমানে যদি প্রদেশগুলোতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়, তবে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার আইনত এবং কার্যত সর্বময় ক্ষমতার মর্যাদা অর্জন করতে পারে।

এটা শুধুমাত্র আইনগত সমস্যা নয় বরং বাস্তব সমস্যাও। শেখ মুজিবের উদ্দেশ্য ছিল বাস্তবে এবং আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ নেয়া এবং এই পরিস্থিতিতে কোনো কিছুই পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়া রোধ করতে পারে না। ঐ কারণে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলো ও তাদের স্বাধীনতা ঘোষণার অবস্থায় যাবে। প্রথম থেকেই দুই কমিটির আলাদা সভা দুই অঞ্চলের মধ্যে মেরুকরণের কাজকে ত্বরান্বিত করবে।

তবে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে একটা সমঝোতায় আসার আশু প্রয়োজনে প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশের মাধ্যমে একটি অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবো বলে আমি জানালাম, যদি সেটা জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। আমরা আরো অনুভব করলাম যে প্রথমে জাতীয় সংসদের একক সত্তা হিসাবে সভা হওয়া উচিত যাতে কেন্দ্রের বিষয়গুলো নির্ণীত হবে। যার ফলে এটা পরবর্তীতে তার পক্ষে কাজ শুরু করবে। একবার কেন্দ্রীয় বিষয়গুলো নির্ধারিত হলে, এই জাতীয় নীতির অধীনে আসা বিষয়গুলোর ব্যাপারে কমিটিগুলো তাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত রাখবে। প্রথম থেকেই যদি দুই কমিটি আলাদাভাবে সভা করে তবে এই ধরনের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না।

আমি প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিলাম যে তিনি যেন শেখ মুজিবকে এই ধরনের সমঝোতায় সম্মত হওয়ার জন্য তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব কাজে লাগান। কয়েক দিনের মধ্যে জাতীয় সংসদ বসতে পারে এবং এক সপ্তাহের মধ্যে এইসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এটা আশা করা নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত ছিল যে, শেখ মুজিবুর রহমান কিছু গ্রহণযোগ্য আপস মীমাংসা করবেন যা জাতীয়

অখণ্ডত্ব রক্ষা করবে এবং একই সাথে তাঁর দাবির সারাংশ দেবে।

প্রেসিডেন্ট এসব প্রশ্নে তাঁর বিশেষজ্ঞদের সাথে বিকাল ৪টা ৩০ মিনিট টায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। সেই অনুযায়ী আমার সংসদীয় ও রাজনৈতিক উপদেষ্টাদের সহযোগে আমরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। এই সভায় কিছু সময় আমরা আওয়ামী লীগের প্রস্তাবের ভাবার্থ নিয়ে আলোচনা করলাম এবং সমঝোতার ধরনের বিষয়ে আমাদের মতামতও পুনরুল্লেখ করলাম।

২৩ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে দেখা করলেন। আমাকে জানানো হলো যে এসব আলোচনা সভায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে প্রেসিডেন্ট আমার মতামত তুলে ধরলেন যে, পারস্পরিক বিষয়ের সিদ্ধান্ত নিতে এবং প্রেসিডেন্টের অধ্যাদেশকে বাস্তবায়নের জন্য সংসদ অধিবেশনের প্রয়োজন আছে। পরে আমাকে জনানো হয়েছিল বেলুচিস্তানের এক নেতা প্রশ্ন রেখেছিলেন যদি দুটি কমিটি হতে পারে তবে পাঁচটি কমিটি হতে পারে না কেন? কিন্তু তাঁরা সকলেই আমার আপত্তি গ্রহণ করেছিলেন এবং জাতীয় সংসদের সভা ছাড়া কোনো স্থায়ী সমাধান সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। প্রস্তাবিত পরিকল্পনার ব্যাপারে আমাদের সিদ্ধান্ত জানানোর জন্য যখন ২৩ মার্চ আমি জনাব মাহমুদ আলী কাসুরীসহ অন্য সহকর্মীদের তাঁদের নিকট পাঠালাম তখন তাঁরা জোরে জোরে একই মনোভাব ব্যক্ত করলেন।

২৩ ও ২৪ মার্চ আওয়ামী লীগ নেতারা এবং প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণ অনেক দীর্ঘস্থায়ী সভা করলেন। এই মিটিং-এ আওয়ামী লীগ তার আসল প্রস্তাবের সংশোধন করল। এখন তারা দুই কমিটির বদলে দুটি শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধি সভার দাবি করল। তারা চাইল দুই সংসদ দুই শাসনতন্ত্র জমা দেবে, রিপোর্টে শুধুমাত্র জাতীয় সংসদের কাছে প্রস্তাব থাকবে না, তা পরবর্তীতে বসে দুই শাসনতন্ত্রকে "পাকিস্তান মৈত্রী সংঘ" হিসাবে রূপ দেবে। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের জন্য একটি "মৈত্রী সংঘ" এর প্রস্তাব করল। নতুন পরিকল্পনায় প্রদেশগুলোর উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না এমনকি জরুরি পরিস্থিতিতেও। প্রকৃতপক্ষে তারা একটি স্বতন্ত্র দেশ চাইল।

২৪ মার্চ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মি. তাজউদ্দীন আহমেদ সংবাদপত্রে জানালেন যে, আওয়ামী লীগ তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে জানিয়ে দিয়েছে এবং আর যোগাযোগের কোনো সুযোগ নেই।

২৩ মার্চ ছিল পাকিস্তান দিবস। ৩১ বছর আগে এই দিন উপমহাদেশের

মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা আবাসভূমির দাবিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সার্বভৌম পাকিস্তান রাষ্ট্রের দাবির প্রশ্নে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়। ৩১ বছর পর আজ আমরা ঐ স্বপ্ন ভঙ্গের এবং তদস্থলে নতুন স্থাপনা দেখার সাক্ষী হতে চলেছি। এই ঐতিহাসিক দিনে জাতীয় অনুভূতি প্রদর্শনের পরিবর্তে আমরা দেখছি পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তানিদের ঘৃণা। জাতীয় উদ্দীপনার বদলে দেখছি মহা দুশ্চিন্তা এবং সব চাইতে পীড়াদায়ক যে, প্রতিটি বাড়ির ছাদে পাকিস্তানি পতাকা পৎপৎ করে উড্ডয়নের পরিবর্তে প্রথমবারের মতো আমরা দেখছি সব সরকারি অফিস ও স্থাপনাসহ সর্বত্র বাংলাদেশের নতুন পতাকা ওড়ানো হচ্ছে। এই দিন অধাসামরিক বাহিনীর লোকজন ও পাকিস্তানি বাঙালি যুবকদের পাকিস্তানের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য কুচকাওয়াজ করার পরিবর্তে বাংলাদেশের সৈনিক হিসাবে স্থানীয় যুবকরা এবং নবগঠিত আধাসরকারি সামরিক বাহিনীর লোকেরা অস্ত্র হাতে তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য কুচকাওয়াজ করছে। শেখ মুজিবুর রহমান নিজে তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছেন।

এটা আমাদের জন্য পীড়াদায়ক দৃশ্য ছিল, যারা যুবক বয়স থেকেই পাকিস্তানের ধারণায় উজ্জীবিত ছিলাম এবং দেশে ও বিদেশে পাকিস্তানের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছিলাম। প্রকৃতপক্ষে সময়কে হার মানিয়ে দ্রুত ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল। এইভাবে না অন্যভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া জরুরি হয়ে গিয়েছিল। আমরা পাহাড়ের একেবারে ধারে চলে এসেছিলাম। হয় আমাদের পিছনে ফিরে আসতে হতো অথবা সামনের দিকে এগিয়ে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে হতো। এটা ছিল বাস্তবতার মুহূর্ত, শেষ হিসাবের মুহূর্ত। দেশের জনগণের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ ছিল ভীতিকর।

২৪ তারিখ সকালে আমি পুনরায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লেঃ জেনারেল পীরজাদার সাথে দেখা করলাম। আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম যে মনে হচ্ছে সমঝোতার সময় পার হয়ে যাচ্ছে এবং অনতিবিলম্বে একটি সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। প্রেসিডেন্টকে আরও জানালাম, আমি আমার কিছু দলীয় নেতাকে পাঠিয়ে দিয়েছি। কারণ, আমি মনে করছি এই মহাসংকটে পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁদের উপস্থিতি বেশি জরুরি। ঐ বিষয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের অনমনীয় এবং দৃঢ় মনোভাবের কারণে আমি মনে করছিলাম আমার দলের বাকি নেতাদের ঢাকায় থাকার আর কোনো যুক্তি ছিল না। তবে আমরা অবস্থান করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই কারণে মি. গোলাম মুস্তফা খার-এর নিকট দ্রুত পাঠানো হয়েছিল ঐ রাতে, তাঁকে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের জন্য হোটেল থেকে নিয়ে যাওয়া হবে।

২৪ মার্চ রাতে মি. খার মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিচলিত দেখলেন। তিনি মি. খারকে জানালেন চট্টগ্রামে ভয়ানক গণ্ডগোল হচ্ছে এবং কিছু আর্মি অফিসার পালিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু পরিস্থিতি ভেঙে পড়তে বসেছে, তিনি মি. খারকে জানালেন যে আমি যেন তাঁর প্রস্তাব মেনে নিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হই এবং পূর্ব পাকিস্তান তাঁর ও তাঁর জনগণের নিকট যেন ছেড়ে দেয়া হয়। মি. খাঁর শেখ মুজিবুর রহমানকে জানালেন তিনি আমাকে এই প্রস্তাবের কথা জানানো এবং সন্দেহ প্রকাশ করলেন যে আমি পাকিস্তান বিভাগের প্রস্তাবে রাজি হবো কিনা। বিদায় নেয়ার আগে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন তিনি সংযোগ রক্ষা করে চলবেন এবং পুনরায় ২৫ মার্চ রাতে মিটিং-এর জন্য তাঁর কাছে দূত পাঠাবেন।

২৫ মার্চ সকালে আমাদের পার্টির মহাসচিব মি. জে. এ. রহিম এবং মি. খারকে সাথে নিয়ে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং লে: জে: পীরজাদার সাথে প্রস্তাবের উপর এবং মি. তাজউদ্দীনের চরমপত্র ও সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য দেখা করলাম। ২৫ মার্চ অপরাহ্নে প্রেসিডেন্টের সহকারী আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত প্রস্তাব আমাদের উপদেষ্টাদের অবহিত করলেন।

মি. খারকে নেয়ার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের দূত রাত ৮টায় আসলেন। যেহেতু নতুন কোনো অগ্রগতি হয়নি, মিঃ খার দূতকে জানালেন তাঁর নেতাকে জানানোর মতো নতুন কিছু নেই। কাজেই মিটিং স্থগিত করাই উত্তম। ২৬ মার্চ সকালে করাচির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে আমরা আবার প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করতে পারি যদি সেখানে কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয় তবে আমরা অবস্থান করতে পারি এবং তখন তিনি আওয়ামী লীগ নেতার সাথে সন্ধ্যায় দেখা করবেন। তবে দূত মিঃ খারকে জানালেন প্রেসিডেন্ট ইতিমধ্যেই সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা ত্যাগ করেছেন। আমরা প্রেসিডেন্ট ভবনে ফোন করে এই সংবাদের নিশ্চয়তা পাওয়ার চেষ্টা করলাম কিন্তু নিশ্চয়তা পেলাম না।

ঐদিন সন্ধ্যায় শেখ মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে এবং অন্যান্য কিছু স্থানে সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ২৭ মার্চ সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিলেন। আমার সহকর্মীদের সাথে আলোচনার কথা আমার স্মরণ হচ্ছে যে এই দুর্যোগপূর্ণ সন্ধিক্ষণে এ ধরনের ডাক অত্যন্ত দুর্বল ছিল অথবা এটাকে ভালোভাবে চিন্তাভাবনা করে করা হয়েছিল?

রাত স্যাড়ে ১০টায় আমাদের খাওয়া শেষ করে নিজ-নিজ কক্ষে ঘুমাতে গেলাম। এক ঘণ্টা পর গুলির শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে গেল। আমার কয়েকজন বন্ধু আমার কক্ষে এলেন এবং আমরা দেখলাম সেনাবাহিনী তাদের

আক্রমণ শুরু করেছে। আমাদের হোটেল কক্ষ থেকে আমরা প্রায় তিন ঘণ্টা সেনাবাহিনীর অভিযান দেখলাম। অনেক জায়গা জালিয়ে দেয়া হলো এবং দেখলাম "দি পিপল" সংবাদপত্র অফিস গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে। এই ইংরেজি পত্রিকাটি সেনাবাহিনী ও পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারে অসত্য এবং লাগামহীন প্রচারণার সাথে জড়িত ছিল। চারদিকের আগুন দেখে আমার চিন্তাধারা অতীত ও ভবিষ্যতের দিকে প্রসারিত হলো। আমি উদ্বিগ্ন হলাম আমাদের ভাগ্যে কি জমা আছে। এখানে আমার চোখের সামনে আমাদের নিজের লোকের মৃত্যু এবং ধ্বংস দেখলাম। স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করা কঠিন ছিল। অনেক চিন্তা আমার মনে ভিড় জমালো। আমরা কি শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিলাম অথবা সময় কি ক্ষতের আরোগ্য দেবে এবং পাকিস্তানের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের শুরু করবে? এই উত্তরগুলো যদি আমার জানা থাকতো।

২৬ তারিখ সকাল ৮টায় কর্নেল সাইদ আমাদের এয়ারপোর্টে নেয়ার জন্য আসলেন। যখন আমরা হোটেল ত্যাগ করছিলাম, বিদেশী সাংবাদিকরা আমাকে ঘিরে দাঁড়াল এবং কতকগুলো প্রশ্ন রাখল। আমি তাদের উত্তর দিতে অস্বীকৃতি জানাই। বিমানবন্দর যাওয়ার পথে কর্নেল সাইদ জানালেন যে রাত ১:৩০ এ শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর বাসা থেকে বন্দি করা হয়েছে এবং এখন তাঁকে সেনা ছাউনির একটি স্কুলে রাখা হয়েছে। আমি কর্নেল সাইদকে তাঁর সাথে ভালো আচরণ করতে বললাম। স্মরণ রাখতে বললাম, যা কিছু ঘটছে এবং শেখ মুজিবুর রহমান যেভাবেই বুঝে থাকুন না কেন তিনি জনগণের নেতা এবং সম্মান তাঁর প্রাপ্য। এটা লোকদেখানো মনে হতে পারে কিন্তু আমি এটা আন্তরিকতার সাথে বোঝাতে চেয়েছিলাম। কর্নেল সাইদ নিশ্চয়তা দিলেন যে, আওয়ামী লীগ নেতাকে যথাযোগ্য মর্যাদায় রাখা হবে। বিমানবন্দরে পথে আমরা দেখলাম বাংলাদেশের পতাকা বাড়ির ছাদ থেকে নামিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং রাস্তায় অবরোধ দেখলাম যেহেতু আমি ঢাকা ত্যাগ করছিলাম ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। আমি প্রার্থনা করলাম এসব ঘটনাবলী যেন পরস্পর বিধ্বংসী দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতে পরিণত না হয়। আমি আশা করলাম সাধারণ জনগণের দেশপ্রেম শীঘ্রই জাগ্রত হবে এবং ফ্যাসিবাদের দুঃস্বপ্ন দূরীভূত হবে।

করাচিতে প্রত্যাবর্তন

পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্বেগ ছিল। সন্ধ্যা ৬:৩০ এ আমরা করাচি বিমানবন্দরে পৌঁছলে উৎকণ্ঠিত জনতা আমাদের অভ্যর্থনা জানাল এবং তারা দাবি জানাল আমি যেন একটা বক্তৃতা করি। কিন্তু আমার

বক্তৃতার মেজাজ ছিল না। তথাপি আমি কোনো রকমে সামলিয়ে বললাম "আল্লাহর রহমতে অবশেষে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে। আমার অন্তরে আমি আশা করছিলাম এবং প্রার্থনা করছিলাম। আমি ঠিক বলছিলাম। ভবিষ্যৎ বলবে পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে, না ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে প্রশাসন যদি ২৫ মার্চের রাতে সক্রিয় না হতো, পরের দিন আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করতো।"

এর জন্য প্রস্তুত ছিল তাদের সশস্ত্র প্রস্তুতি, তাদের লোকবলের একাগ্রতা, রাস্তায় অবরোধ এই সবকিছুই দর্শনীয় প্রমাণ। ২৭ তারিখের আহূত সাধারণ ধর্মঘট প্রশাসনকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশে ছিল। উদ্দেশ্য ছিল, ২৬ মার্চ শুক্রবার জুমার নামাজের পর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা।

(আগস্ট ১৯৭১-এর 'The Great Tragedy" থেকে উদ্ধৃত)

আবদুল হাফিজ কারদার

১৬ মার্চ শেখ মুজিবের সাথে আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সময় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের কলকাতা যাত্রা বন্ধ করার জন্য একটা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালান। এই ধরনের যাত্রা একশত বছর পূর্বে মীর জাফর করেছিলেন। আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য ঢাকা আসার মি. ভুট্টোর আগ্রহের প্রতি কোনো সাড়া দেননি। এই শিষ্টাচারহীনতায় মি. ভুট্টো বুঝতে পারলেন যে, তার ঢাকা যাওয়া উচিত কিন্তু বিপদসংকুল আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতি এবং শেখ মুজিবের আপসহীন মনোভাব অবগত হয়ে ১৯ মার্চে ঢাকা আমার আমন্ত্রণ গ্রহণের পূর্বে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার নিকট থেকে নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা চান। করাচিতে ১৮ মার্চে তার সংবাদ সম্মেলনে মিঃ ভুট্টো বলেন, "আমরা বিশ্বাস করি ২৫ মার্চের পূর্বে আমার উপস্থিতিতে একটা কার্যকর উদ্দেশ্য হাসিল করা হবে।"

চেয়ারম্যান ভুট্টো কর্তৃক কাঙ্ক্ষিত নিশ্চয়তা সম্ভবত ১৮ মার্চ তাকে দেয়া হয়। যে-কোনোভাবে তিনি ১৯ মার্চের সকালে একটা সংসদ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং ২২ মার্চের দিকে তার দলের প্রতিনিধি নিয়ে ঢাকা আসার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

২০ মার্চ প্রতিনিধিদলের নাম ঘোষণা করা হয়। প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে ১৯ মার্চের মধ্যরাতে পরের দিন করাচি পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়ে এ বিষয়ে আমাকে জানানো হয়।

নিম্নের দলের সদস্য নিয়ে মি. ভুট্টো ২১ মার্চ ঢাকার উদ্দেশে করাচি ত্যাগ করেন।

১। মি. জেড এ ভুট্টো, (দলনেতা)
২। মি. জে এ রহিম, সেক্রেটারি জেনারেল
৩। মিঃ মাহমুদ মোহাম্মদ জামান, ভাইস-চেয়ারম্যান
৪। মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, ভাইস-চেয়ারম্যান
৫। ডঃ মোবাশ্বের হাসান
৬। মিঃ গোলাম মোস্তফা খান

৭। মিঃ হায়াত মোহাম্মদ খান শেরপাও

৮। মিঃ গোলাম মোস্তফা জাতোই

৯। মিঃ আবদুল হাফিজ পীরজাদা

১০। মিঃ মোমতাজ আলী ভুট্টো

১১। মিঃ রফি রাজা

১২। মিঃ আলী আহ্‌মদ খান তালপুর

১৩। মিঃ বিচারপতি (অবসরপ্রাপ্ত) ফয়জুল্লাহ কুন্দি

১৪। মিঃ আবদুল খালিক এবং

১৫। মিঃ আবদুল হাফিজ কার্দার

মিঃ ভুট্টোর নিরাপত্তার জন্য হোটেলে নিয়োজিত পুলিশ সৈন্যবাহিনীর লোকদের মধ্যেও আমি অধিকাংশ হোটেল কর্মীদের ইউনিফর্মে বাংলাদেশের ছোট পতাকা দেখতে পেলাম। যুবকদের একটা ছোট দল হোটেলের লবির ভিতরে ভুট্টোবিরোধী প্লাকার্ড বহন করে। তবে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে কোনো কিছু অপ্রীতিকর না ঘটার প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য বলা হয়।

একই দিন সন্ধ্যায় ভুট্টো প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। ইতোমধ্যেই হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের লবিতে খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফরমুলা গৃহীত হয়েছে। ফরমুলায় জনসংখ্যা ও প্রদেশগুলোতে দলের শক্তির ভিত্তিতে ১১ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিয়ে কেন্দ্রের উল্লেখ করা হয়। আওয়ামী লীগ পাঁচ পোর্টফোলিও নিম্নোক্তভাবে প্রদেশগুলোর মধ্যে ভাগ করে দেয়া হবে।

ফান্টিয়ার : ১

বেলুচিস্তান : ১

সিন্ধু : ১

পাঞ্জাব : ৩

এই শর্তে যে পিপিপি ২ জন মন্ত্রীর নিয়োগ দেবে, তৃতীয় পোর্টফোলিও কাউন্সিল মুসলিম লীগ পাবে।

লবিতে অনেকসংখ্যক বিদেশী সংবাদদাতা, টিভি ক্যামেরাম্যান, পাকিস্তানি জার্নালিস্ট এবং আওয়ামী লীগ কর্মী ছিল। এই জনারণ্যে আমি কিছু অবাঙালি লোকের সাক্ষাৎ পাই, যারা নৃশংস হত্যা, লুট, দুষ্কর্ম, ধর্ষণ, সন্ত্রাসের বর্ণনা দেয়। আমি আমার বাঙালি বন্ধুদের নিকট থেকে এসব ঘটনা নিশ্চিত হই। তারা বলে, আপনারা ঢাকা ত্যাগ করার পূর্বে আমাদের জন্য ব্যবস্থা করুন। মুজিবের গুণ্ডাদের

নিকট আমাদের ছেড়ে দেবেন না। এই রকম বার্তা জানিয়ে খুলনা, চট্টগ্রাম ও প্রদেশের অন্যান্য জায়গা থেকে বহু টেলিফোনেও আমি পরিস্থিতি নিশ্চিত হই।

মি. ভুট্টো প্রায় রাত ৯.১৫-এর দিকে প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে ফিরে আসেন এবং আমাদের তা নিম্নরূপভাবে বর্ণনা করেন:-

নীতিগতভাবে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সম্মত মুজিবের ফরমুলায় নিম্নোক্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রপতির ঘোষণার উল্লেখ করা হয়।

১। পৃথক ২টি আঞ্চলিক কমিটির জন্য পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের এম, এন, এ, দ্বারা ২টি সাংবিধানিক খসড়া প্রস্তুত করতে হবে।

২। জাতীয় সংসদে খসড়া ২টি উপস্থাপন করতে হবে। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের খসড়া প্রস্তুত করতে আওয়ামী লীগ প্রস্তুত। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে পশ্চিম পাকিস্তান পিপিপি নির্দেশ দিতে পারে সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করতে কত সময় লাগবে।

৩। প্রদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।

৪। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পরামর্শ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রাদেশিক গভর্নর মনোনীত হবেন।

৫। প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রাদেশিক সরকারের জন্য বিষয়ের তালিকা, বৈদেশিক সাহায্য এবং বাণিজ্যসহ ৬ দফার ভিত্তিতে প্রস্তুত করতে হবে।

পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ছাড়াও বৈদেশিক সাহায্য ও বাণিজ্য কেন্দ্রের হাতে থাকবে।

এই ফরমুলা তখনো আলোচিত হচ্ছিল যে ঘোষণার খসড়া প্রেসিডেন্ট হাউস থেকে একজন দূতের মাধ্যমে মি. ভুট্টোর নিকট প্রেরণ করা হয়।

আওয়ামী লীগ নিম্নোক্ত খসড়া ঘোষণা তৈরি করে:-

আওয়ামী লীগের খসড়া ঘোষণাপত্র : ঢাকা, মার্চ ২৪, ১৯৭১

১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ সামরিক আইন জারির মাধ্যমে সব ক্ষমতা প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার হিসাবে আমি জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের উপর ন্যস্ত করা হয় এবং আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করি।

এবং জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার লক্ষ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এবং নির্বাচিত হয়েছে দেশে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে, পাকিস্তানের জন্য সংবিধান দ্রুত প্রস্তুত করতে, জনগণের প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর

প্রয়োজন হয়ে পড়ায় এবং সামরিক আইনের কার্যক্রম প্রত্যাহার করা প্রয়োজন হয়ে পড়ায়।

এখন আমি, জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, এইচপিকে এইচ জে এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, পাকিস্তানে আর সামরিক শাসন বলবৎ থাকবে না এবং ১৯৬৯ সালের ২৪ মার্চ তারিখের ঘোষণাপত্র যে তারিখে প্রাদেশিক গভর্নর অফিসে শপথ গ্রহণ করবেন, সে বাতিল বলে গণ্য হবে এবং যে-কোনো ক্ষেত্রে এই ঘোষণার তারিখ হতে ৭ দিন পরে সমগ্র পাকিস্তানে বাতিল বলে গণ্য হবে।

১। সময়ে সময়ে কার্যকর অন্যান্য আইনের পরিপন্থী হোক না কেন ঘোষণা এবং তাতে উল্লিখিত যে আদেশের কার্যকারিতা থাকবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না হলে, এই ঘোষণায়—

ক) 'কেন্দ্র' বলতে প্রজাতন্ত্রকে বোঝাবে।

খ) 'কেন্দ্রীয় সরকার' বলতে প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী সরকারকে বোঝাবে ।

গ) 'কেন্দ্রীয়ভাবে শাসিত এলাকা' বলতে পশ্চিম পাকিস্তান আদেশ, ১৯৭০-এর প্রদেশে বর্ণিত ভূখণ্ডকে বোঝাবে।

ঘ) 'আরম্ভের তারিখ' বলতে সে দিনকে বোঝাবে যে দিনে এ আদেশ কার্যকর হয়।

ঙ) 'অন্তর্বর্তী মেয়াদ' বলতে জাতীয় সংসদ কর্তৃক প্রণীতব্য শাসনতন্ত্রের আরম্ভের তারিখ হতে শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদকে বোঝাবে।

চ) 'ইসলামাবাদ রাজধানী ভূখণ্ড' বলতে পশ্চিম পাকিস্তান আদেশ ১৯৭০-এর আদেশ বর্ণিত ভূখণ্ডকে বোঝাবে।

ছ) 'বিকল্প সংবিধান' বলতে পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধান, ১৯৬৯ কে বোঝাবে।

জ) 'সামরিক শাসন'-এর অর্থ ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ তারিখে ঘোষণার দ্বারা আরোপিত সামরিক শাসন।

ঞ) 'সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ' বলতে কোনো কার্য সম্পাদন বা রেগুলেশন বা আদেশের অধীনে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগ করার নিমিত্তে কোনো সামরিক আইন রেগুলেশন সামরিক আইন আদেশ দ্বারা বা অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে-কোনো ব্যক্তি-গোষ্ঠী বা কোনো আদালতকে বোঝাবে।

ট) 'সামরিক আইন মেয়াদ' ১৯৬৯ সালে ২৫ মার্চ তারিখে আরম্ভ, আরম্ভের তারিখের পূর্বে শেষ মেয়াদকে বোঝাবে।

ঠ) 'জাতীয় সংসদ' বলতে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২, ১৯৭০ অনুসারে নির্বাচিত

জাতীয় সংসদকে বোঝাবে।

ড) 'প্রেসিডেন্ট' বলতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে বোঝাবে।

ঢ) 'প্রজাতন্ত্র' এর অর্থ পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র।

ণ) 'তফশিল' বলতে এই ঘোষণাপত্রের তফশিল বোঝাবে।

ত) 'বাংলাদেশ রাষ্ট্র' বলতে আরম্ভের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশ নামে অভিহিত ভূখণ্ডকে বোঝাবে।

থ) 'পশ্চিম পাকিস্তান রাষ্ট্র' বলতে আরম্ভের অব্যবহিত পূর্বে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ নামে পরিচিত স্ব-স্ব ভূখণ্ডকে বোঝাবে।

দ) 'রাষ্ট্রীয় সংসদ' বলতে রাষ্ট্রের সংসদকে বোঝাবে।

ধ) 'রাষ্ট্রীয় সরকার' বলতে রাষ্ট্রের নির্বাহী সরকারকে বোঝাবে।

ন) "রাষ্ট্রীয় বিধান সভা' বলতে রাষ্ট্রের বিধান সভাবে বোঝাবে।

৩। ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রণীত এ সামরিক শাসন ঘোষণার পর ঘোষণাপত্র থেকে বা অনুসারে কর্তৃত্ব অর্জনকারী যাবতীয় আদালত ও ব্যক্তিবর্গসহ সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বাতিল হয়ে অস্তিত্ব ও কার্যকর থাকবে না।

৪। ১) সব সামরিক শাসন বিধান ও সামরিক আদেশ এবং সামরিক সাংবিধানিক আদেশ বাতিল করা হলো।

২) উপর্যুক্ত বিধানসভা কর্তৃক সংশোধিত বা বাতিল না হওয়া পর্যন্ত, যাবতীয় আইন এই ঘোষণা সাপেক্ষে, যতটুকু প্রযোজ্য এবং প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ কার্যকর থাকবে।

৩) এই ঘোষণাপত্রের বিধানসমূহের সাথে কোনো বিদ্যমান আইন বিধানকে সঙ্গতিপূর্ণ করার উদ্দেশ্যে, কেন্দ্রীয় আইন বিষয়ে প্রেসিডেন্ট এবং প্রাদেশিক আইন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের গভর্নর, আদেশ বলে পরিবর্তন বা পরিবর্ধন বা বিয়োজন করতে পারেন এবং এরূপে প্রণীত আইন অন্যভাবে এই আইনে বর্ণিত না হলে, আরম্ভের তারিখে কার্যকর হবে বা কার্যকর হয়েছে বলে গণ্য করা হবে।

৪) কোনো বিদ্যমান আইন করার প্রয়োজনে বা কার্যকর করার ক্ষমতা প্রদানে যে-কোনো আদালত বা ট্রাইবুনাল বা কর্তৃপক্ষ, তথাপি যে উপ অনুচ্ছেদ (৩) অনুসারে প্রণীত কোনো আদেশ দ্বারা অনুরূপ আইনে প্রকৃত প্রতিবেদন না করা হয়, এই ঘোষণাপত্রের অনুসারে

অনুরূপ আইনকে সঙ্গতিপূর্ণ করতে প্রয়োজনীয় প্রতিযোজনসহ আইন প্রণয়ন করতে পারে।

৫) এ অনুচ্ছেদে 'প্রচলিত আইন' বলতে যে-কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ, নিয়ম, নীতি, উপ-আইন, প্রতিস্থাপন বা অন্যান্য আইনগত দলিল বোঝাবে যা আরম্ভের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্তান বা পাকিস্তানের কোনো অংশে কার্যকর ছিল।

৫। ১) বিশেষ সামরিক আদালত বা সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে আরম্ভের তারিখের পূর্বে প্রতিটি স্থগিত মামলা ফৌজদারি অদালতে স্থানান্তর করা হবে, যে আদালতের সাধারণ আইন অনুসারে উক্ত মামলার কার্যাবলী দ্বারা গঠিত অপরাধের বিচার করার এখতিয়ার রয়েছে।

২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে ফৌজদারি আদালতে স্থানান্তরিত যে-কোনো মামলা সাধারণ আইন অনুসারে উক্ত মামলার বিচারে প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হবে।

৩) প্রতিটি মামলা, যা বিশেষ সামরিক আদালত কর্তৃক রায় দেয়ার পর চূড়ান্ত রায়ের জন্য কার্যকরী তারিখের পূর্বে স্থগিত থাকে এবং উক্ত তারিখে স্থগিত রিভিউর জন্য আরজি বা আবেদন কার্যকর তারিখের পরে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো প্রদেশে সংশ্লিষ্ট মামলা হয় তবে কমান্ডার-ইন-চীফ, পাকিস্তান আর্মি বা যদি বাংলাদেশের প্রদেশ সংশ্লিষ্ট মামলা হয়, তবে জেনারেল অফিসার কমান্ডার পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড, পাকিস্তান আর্মি কর্তৃক রায় প্রদান করা হবে।

৪) যে-কোনো ব্যক্তি, যিনি কোনো সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের রায়ে নিজেকে ক্ষুব্ধ মনে করেন, যদি উক্ত রায়ের বিরুদ্ধে কোনো আরজি পেশ করা না হয়। যদি মামলাটি পশ্চিম পাকিস্তানের যে-কোনো প্রদেশের সংশ্লিষ্ট হয়, পাকিস্তান আর্মির কমান্ডার-ইন-চীফ বা যদি মামলাটি বাংলাদেশের প্রদেশ সংশ্লিষ্ট হয় পাকিস্তান আর্মির পূর্বাঞ্চল কমান্ডার জেনারেল অফিসার কমান্ডারের নিকট আরজি পেশ করতে পারেন। উক্ত আরজি পেশের পর উক্ত কর্তৃপক্ষ কোনো শর্ত সাপেক্ষে বা শর্ত ছাড়া ক্ষমা করতে পারেন অথবা দণ্ডাদেশ হ্রাস, বাতিল বা স্থগিত করতে পারেন।

৫) এই ঘোষণাপত্রের বিধান সাপেক্ষে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামরিক শাসনের আমলে অনুমোদিত সব দণ্ডাদেশ আইনত অনুমোদিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং তার দণ্ডভোগকালে সম্পাদন করা হবে।

৬) সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামরিক শাসনের আমলে মঞ্জুরিকৃত প্রত্যেক দণ্ডাদেশ, যা সামরিক শাসনের আমলে সম্পাদন করা হয়নি, জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কার্যকর হবে, যাতে দণ্ডাদেশ অধীন ব্যক্তি উপস্থিত থাকবে এবং অনুরূপ প্রত্যেকটি দণ্ডাদেশ যে তারিখে দণ্ডাদেশ অধীন ব্যক্তিকে জেলে নেয়া হয়, সেই তারিখে আরম্ভ হবে।

৭) সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সামরিক শাসনামলে মঞ্জুরিকৃত প্রত্যেক জরিমানার দণ্ডাদেশ, যা সামরিক শাসনামলে কার্যকর করা হয়নি, জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক কার্যকর করা হবে। যে জেলায় দণ্ডাদেশাধীন ব্যক্তি বসবাস করে, যদি এটা দণ্ডবিধি আইন, ১৮৯৮ (আইন ৫/১৮৯৮) এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আরোপিত জরিমানার দণ্ডাদেশ হয়। তবে শর্ত থাকে, উক্ত দণ্ডবিধি আইনের অধ্যায় XXIX এর বিধানসমূহ অনুরূপ কোনো দণ্ডাদেশে প্রয়োগ করা হবে না।

৮) কোনো আদালত এবং এই ঘোষণাপত্র দ্বারা বর্ণিত কোনো কর্তৃপক্ষ, সামরিক শাসনামলে সামরিক শাসন কর্তৃপক্ষের পক্ষে কোনো সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বা যে-কোনো ব্যক্তি দ্বারা সামরিক শাসনের প্রশাসনের ব্যাপারে কৃত কোনো কিছুর যথাযথতার বৈধতা, অখণ্ডনীয়তা বা গৃহীত কার্যপ্রণালীর উপর প্রশ্ন করতে পারবে না।

৯) কোনো আদালত বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ শাসনামলে কোনো সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বা সামরিক আইন প্রশাসনের বিষয়ে সম্পাদিত কোনো কিছু ব্যাপারে কোনো মামলা বা কার্যপ্রণালী দায়ের করতে পারবে না।

৬। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে, প্রাদেশিক সংবিধান আদেশ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২, ১৯৬৯) বাতিল হোক না কেন, পাকিস্তান এই আদেশ এবং তফশিল দ্বারা প্রণীত ঘোষণাপত্রের বিধান বর্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন সাপেক্ষে যাবতীয় সংবিধানের বিধান অনুসারে পরিচালিত হবে।

৭। কার্যকর তারিখ থেকে কার্যকর তারিখের অব্যবহিত পূর্বে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসাবে পদ ধারণকারী ব্যক্তি পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ প্রণীত সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রের প্রধান, যে নামেই হোক না কেন, কার্যসভার গ্রহণ করবেন।

৮। ১) অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে :

ক) প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হবে এবং এই ঘোষণাপত্রের বিধান অনুসারে যাবতীয় ক্ষমতা প্রয়োগ এবং কার্যাবলী সম্পাদন করবেন, যা সময়ে সময়ে কার্যকর আইন যা পরবর্তী আইন দ্বারা বা আইন অনুসারে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। প্রেসিডেন্ট তার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয়সংখ্যক উপদেষ্টা নিয়োগ দেবেন।

খ) এ ঘোষণাপত্রের বিধান অনুসারে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

২) প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদ বা কোনো প্রদেশের সংসদ স্থগিত বা ভেঙে দিতে পারবেন না।

৩) অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রেসিডেন্ট কেন্দ্রীয় বিধান সভার আওতায় যে-কোনো বিষয়ে অধ্যাদেশ জারি করে আইন তৈরি করতে পারবেন।

৯। ১) কার্যকর তারিখ থেকে রাষ্ট্রপতি আদেশের নং ২, ১৯৭০ অনুসারে নির্বাচিত প্রাদেশিক সংসদ রাষ্ট্রীয় সংসদ হিসাবে কার্য সম্পাদন করবে।

২) অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে প্রাদেশিক সরকার সংসদ এই ঘোষণাপত্রের বিধান অনুসারে কার্য-সম্পাদন করবে।

১০। ১) কেন্দ্রীয় বিধানসভা তফশিলে বর্ণিত যে-কোনো বিষয়ের ব্যাপারে সমগ্র পাকিস্তান বা তার কিছু অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করার একক ক্ষমতার অধিকারী এবং ঘোষণাপত্রের অনুচ্ছেদ ১৪ অনুসারে যে-কোনো বিষয়ের ব্যাপারে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তান বা তার কোনো অংশের জন্যও আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

২) কেন্দ্রীয় বিধানসভা পরবর্তী সংবিধানের তৃতীয় তফশিল বা এই ঘোষণাপত্রের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত নয়, যে-কোনো বিষয়ের ব্যাপারে ইসলামাবাদ রাজধানী ভূখণ্ড এবং ঢাকা রাজধানী ভূখণ্ডের জন্য আইন প্রণয়ন (এককভাবে নয়) করতে পারবে।

১১। বাংলাদেশের বিধানসভা এই ঘোষণাপত্রের ১৪ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয় ব্যতীত যে-কোনো বিষয়ের ব্যাপারে বাংলাদেশের যে-কোনো

অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বিধানসভা পুরনো সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে বর্ণিত বিষয় ব্যতীত যে-কোনো বিষয়ে রাজ্য বা তার যে-কোনো অংশের জন্য আইন প্রণয়ন করতে পারবে।

১২। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদীয় দলের নেতৃবৃন্দের পরামর্শে প্রেসিডেন্ট রাজ্যের গভর্নর নিয়োগ দেবেন এবং গভর্নর অন্তর্বর্তীকালীন সময় দায়িত্ব পালন করবেন।

১৩। ১) বাংলাদেশ রাজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় বিধানসভা কেবল নিম্নোক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন করতে পারবেঃ-

ক) পাকিস্তান প্রতিরক্ষা

খ) বৈদেশিক বাণিজ্য এবং সাহায্য ব্যতীত পররাষ্ট্র বিষয়

গ) পাকিস্তানে প্রবেশ ও পাকিস্তান হতে বহির্গমনসহ নাগরিকত্ব, ন্যাচারালাইজেশন।

ঘ) মুদ্রা, মুদ্রাপ্রস্তুতকরণ, লিগ্যাল টেন্ডার এর ঘোষণাপত্রের ১৬ নং অনুচ্ছেদ সাপেক্ষে স্টেটব্যাংক অব পাকিস্তান

ঙ) কেন্দ্রের সরকারি ঋণ

চ) মান, ওজন ও পরিমাণ

ছ) কেন্দ্রের সম্পত্তি এবং উক্ত সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত রাজস্ব

জ) আন্তর্জাতিক এবং আন্তঃ শাখা যোগাযোগের সমন্বয়তা

ঝ) রাষ্ট্রপতি, জাতীয় সংসদ, রাজ্য সংসদের নির্বাচন অনুষ্ঠান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার, নির্বাচন কমিশনার, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, জাতীয় সংসদের অন্যান্য সদস্যের পারিতোষিক, জাতীয় সংসদের ক্ষমতা, সুবিধা, বাধ্যবাধকতা

ঞ) পাকিস্তান সুপ্রীমকোর্ট

ট) প্রদেশের বাইরে সার্ভিস ও সম্পাদনা বা রায় ইত্যাদি

ঠ) উপরে বর্ণিত যে-কোনো বিষয়ের ব্যাপারে আইনের বিরুদ্ধে অপরাধ

২) পশ্চিম পাকিস্তান রাজ্যের বিষয়ে কেন্দ্রীয় বিধান সভার বিগত সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে বর্ণিত বিষয়ে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে কিন্তু এই ঘোষণা অনুসারে স্থাপনযোগ্য পশ্চিম পাকিস্তানের Constituent

Conventions এর সদস্যদের মধ্যে এই ব্যাপারে আবদ্ধ চুক্তিপত্র অনুসারে এই বিধানসমূহ পরিবর্তনযোগ্য।

১৪। ১) কেন্দ্রীয় বিধান সভার কর্তৃপক্ষ এ ধারা অনুসারে বাংলাদেশের মধ্যে কার্যকর তারিখে পূর্বে সংগৃহীত যাবতীয় কর ও খাজনা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আদায় করা হবে এবং ১৯৭০-৭১ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে বাংলাদেশকে বরাদ্দকৃত যাবতীয় কেন্দ্রীয় সরকারি আর্থিক বরাদ্দ এবং প্রত্যক্ষ ব্যয়ের বিপরীতে সমন্বয়ের পর কোনো অর্থ বাংলাদেশ রাজ্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাপ্য হয়, তবে উক্ত অর্থ কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশরকে প্রদান করবে।

২) বাংলাদেশ রাজ্যের যাবতীয় বৈদেশিক মুদ্রা আয় বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাংক- এর নিয়ন্ত্রণে পৃথক হিসাবে পরিচালিত হবে এবং বাংলাদেশ রিজার্ভ ব্যাংক কর্তৃক প্রদান করা হবে।

৩) প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশ সরকারের সাথে আলোচনা করে, যে ভিত্তিতে বাংলাদেশ সরকার বাজেট বছর ১৯৭০-৭১-এর বাকি অংশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজনীয়তা মেটাবে, তার ভিত্তিতে বিধান তৈরি করবে।

১৫। ১) ঢাকায় স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে এবং বাংলাদেশে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের যাবতীয় শাখা রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশের শাখা হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে।

২) রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ এবং এর শাখাসমূহ বাংলাদেশের বিধান সভার নিয়ন্ত্রণে থাকবে।

৩) রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশ ৪ নং দফায় বর্ণিত ক্ষমতা সাপেক্ষে যা পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে, বাংলাদেশ সরকারের যাবতীয় ক্ষমতা, কার্যাবলী ও দায়িত্ব প্রয়োগ করবে, যা পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক কার্যকর তারিখের অব্যবহিত পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানের ব্যাপারে প্রয়োগ করত।

৪) ব্যাংক অব পাকিস্তান স্টেট ব্যাংক অব বাংলাদেশের ব্যাপারে নিম্নোক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করবে।

ক) কেন্দ্রীয় ব্যাংক রূপীর বিনিময় হার নির্ধারণ করবে।

খ) স্টেট ব্যাংক অব বাংলাদেশের অনুরোধে কারেনসি নোট ও মুদ্রা ছাপাবে।

গ) টাকশাল ও সিকিউরিটি প্রেস পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবে।

ঘ) স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান সাধারণত যে সব কার্যাবলী করে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে সে সব কার্যাবলী সম্পাদন করবে। তবে শর্ত থাকবে যে, সে সব কার্যাবলী রিজার্ভ ব্যাংক অব বাংলাদেশের নির্দেশ অনুসারে সম্পাদন করতে হবে।

১৭। ১) ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিলে:

(ক) বাংলাদেশ থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যগণ ঢাকায় সংসদ ভবনে বিকেল ৪.০০ টার সময় Constituent Convention এ অধিবেশনে বসবেন এবং উক্ত অধিবেশনের তারিখ হতে ৪৫ দিনের মধ্যে বাংলাদেশের জন্য সংবিধান তৈরি করবেন।

(খ) পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যগণ ইসলামাবাদে স্টেট ব্যাংক ভবনে ১৯৭১ সালের ৯ এপ্রিল বিকেল ৪.০০ টার সময় Constituent Convention এ অধিবেশনে বসবেন এবং উক্ত অধিবেশন হতে ৪৫ দিনের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য একটি সংবিধান তৈরি করবেন।

২) প্রত্যেক Constituent Convention একজন চেয়ারম্যান নির্বাচন করবে, যিনি সভার তারিখ ও সময় নির্ধারণ করবেন এবং Convention এর অধিবেশন পরিচালনার পদ্ধতি নির্ণয় করবেন। তাছাড়াও চেয়ারম্যানের নির্বাচনসহ যাবতীয় সিদ্ধান্ত সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে গৃহীত হবে।

৩) বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংবিধান উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে প্রণীত হওয়ার পর এবং যখন প্রেসিডেন্টকে স্ব-স্ব চেয়ারম্যান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অবহিত করা হয় যে উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে সংবিধান প্রণয়ন করা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট জাতীয় সংসদের একটা অধিবেশন ডাকবেন, যে অধিবেশনে সব সদস্য পাকিস্তান কনফেডারেশনের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটা নির্বাহী পরিষদ হিসাবে একত্রে মিলিত হবেন।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) অনুসারে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে অনুসৃতব্য পদ্ধতি এই ঘোষণাপত্র দ্বারা উক্ত আদেশে আনা সংশোধন সাপেক্ষে ১৯৭০ সালের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং-২ এ বর্ণিত পদ্ধতির অনুরূপ হবে।

(৫) জাতীয় সংসদের সদস্যগণ নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে উপযুক্ত Constituent

Convention এর প্রথম সভায় প্রেসিডেন্ট কর্তৃক মনোনীত প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট শপথ বা ঘোষণা দিয়ে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২, ১৯৭০-এর ১২ নং অনুচ্ছেদের বিধানসমূহ প্রণয়ন করেছে বলে গৃহীত হবে।

(৬) এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (৫) অনুসারে শপথ পাঠ করে জাতীয় সংসদের একজন সদস্য যাবতীয় অধিকার, সুবিধা, দক্ষিণা পাওয়ার যোগ্য হবেন, যা জাতীয় সংসদের একজন সদস্য আইন অনুসারে পান।

(৭) রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২, ১৯৭০-এর অনুচ্ছেদ ২৫-এর জন্য নিম্নোক্ত বাক্য প্রতিস্থাপিত হবে:

"২৫ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাসকৃত সংবিধান বিল নির্দিষ্টকরণের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করা হবে। প্রেসিডেন্ট তার নিকট সংবিধান উপস্থাপনের পর এতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। উপস্থাপনের তারিখ ৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর যে-কোনো ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে।"

১৮। ১) প্রেসিডেন্ট আদেশ বলে, তার নিকট প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হলে, অনুরূপ বিধান প্রণয়ন করবেন।

(২) বিশেষ করে এবং প্রচলিত ক্ষমতা খর্ব না করে বিধানসমূহ প্রণয়ন করা হতে পারে।

(ক) এই ঘোষণাপত্র দ্বারা কার্যকর নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থা করার জন্য নতুন প্রশাসনিক বা অন্যান্য ব্যবস্থা তৈরি।

(খ) এই ঘোষণাপত্র অনুসারে কার্যকর নতুন সাংবিধানিক ব্যবস্থাতে ক্ষমতা অর্পণ করে কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা, অধিকার, সম্পত্তি, দায়িত্ব ও দায় হস্তান্তর এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে উক্ত অধিকারসমূহ উপযোজন।

(গ) কেন্দ্রীয় সরকারের অধিকার ও দায় হস্তান্তর এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে উক্ত অধিকারসমূহ উপযোজন।

(ঘ) যে-কোনো প্রদেশের জন্য কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষ নিয়োগ ও বদলি এবং তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী প্রদেশ এবং কেন্দ্রের জন্য সার্ভিসের গঠনতন্ত্র।

(ঙ) এই ঘোষণা অনুসারে প্রণীত ঘোষণাপত্রের বিধান কার্যকর করার পূর্বে সাংবিধানিক অবস্থান হতে উত্তরণে যে-কোনো অসুবিধা দূরীকরণ।

৩। উপ-অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত বিষয় বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এবং এই ঘোষণাপত্র কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কার্য সম্পাদন করার লক্ষ্যে

১১ জন সদস্য, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মনোনীত ৬ জন সদস্য, পাঞ্জাব সরকার কর্তৃক মনোনীত ২ জন সদস্য এবং সিন্ধু, বেলুচিস্তান ও এন, ডব্লু, এফ, পি, সরকার কর্তৃক মনোনীত ১ জন করে সদস্য নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাস্তবায়ন কাউন্সিল গঠন করবেন।

তফসিল

১। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৭-এর জন্য নিম্নোক্তগুলো প্রতিস্থাপিত হবে। যথা; '৬৭। কোনো ব্যক্তি রাষ্ট্রে গভর্নর হিসাবে নিযুক্ত হবেন না, যদি না তিনি জাতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্য হন।"

২। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৮-এর জন্য নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, যথা: '৬৮। গভর্নর কার্যভার গ্রহণের পূর্বে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গভর্নর বাংলাদেশের হাইকোর্টের বিচারপতির নিকট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রত্যেকটি প্রদেশের গভর্নর সংশ্লিষ্ট প্রদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নিকট প্রথম তফশিল অনুসারে শপথ গ্রহণ করবেন।'

৩। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর জন্য নিম্নোক্তগুলো প্রতিস্থাপিত হবে, যথা: '৭০। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় বিধানসভা হিসাবে অভিহিত বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্য একটা বিধানসভা থাকবে এবং পাঞ্জাব, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান প্রদেশের জন্য স্ব-স্ব রাজ্যের প্রাদেশিক বিধানসভা হিসাবে বিধানসভা থাকবে।'

৪। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭০-এর নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে। যথা: '৮০ (১) মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধান করে মন্ত্রিপরিষদ নিয়ে গঠিত রাজ্য সরকার থাকবে। মন্ত্রীদের সবাই এই অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতিতে নিযুক্ত হবেন।"

২) রাষ্ট্রের নির্বাহী ক্ষমতা, সংবিধানের বিধান সাপেক্ষে, রাজ্য সরকারের কর্তৃপক্ষ দ্বারা বা অনুসারে প্রয়োগ করা হবে।

অনুরূপ ক্ষমতা সংবিধান বা আইন অনুসারে সরাসরি অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারের অধঃস্তন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োগ করা হবে।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ রাজ্যের বিধানসভার নিকট যৌথভাবে দায়ী থাকবে।

3) (ক) গভর্নর রাজ্যের বিধানসভার একজন সদস্যকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে

নিয়োগ দেবেন, যিনি রাজ্যের বিধানসভার সদস্যদের গরিষ্ঠতা নির্ধারণ করবেন।

(খ) মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত হয়ে গেলে রাজ্যের বিধানসভা, যদি নিয়োগের সময় অধিবেশন না চলে এবং ভেঙে দেয়া না হয়, আহ্বান করা হবে, যাতে ২ মাসের অধিবেশন বসতে পারে।

৫) গভর্নর মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে অন্যান্য মন্ত্রী এবং উপমন্ত্রী নিয়োগ দেবেন।

৬) একজন মন্ত্রী, যিনি পরপর ৬ মাস বিধানসভার সদস্যপদ অলংকৃত করেননি, মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হতে পারবেন না এবং পুনরায় বিধানসভা ভেঙে দেয়ার পূর্বে মন্ত্রী হতে পারবেন না, যদি না তিনি বিধান সভার সদস্য নির্বাচিত হন।

৭) অনুচ্ছেদে কোনো কিছুই যে-কোনো মেয়াদ বিধানসভা ভেঙে দেয়া হয়েছে, মন্ত্রিসভার সদস্য ও উপ-মন্ত্রীকে তার পদ অলঙ্কৃত করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না বা উক্ত মেয়াদে মুখ্যমন্ত্রী বা মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী হিসাবে কোনো ব্যক্তির নিয়োগ থেকে বিরত রাখতে পারবে না।

৮) সন্দেহ এড়ানোর জন্য ব্যাপকভাবে ঘোষণা দেয়া হয় যে গভর্নর তার ক্ষমতা প্রয়োগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে কাজ করবেন।

৯) মুখ্যমন্ত্রী গভর্নরের নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করে যে-কোনো মুহূর্তে পদত্যাগ করতে পারেন।

১০) অন্যান্য যে-কোনো মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রী গভর্নরের নিকট উপস্থাপনের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করে তার পদ থেকে ইস্তফা দিতে পারেন।

১১) গভর্নর মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে মুখ্যমন্ত্রী ব্যতীত যে-কোনো মন্ত্রীর পদত্যাগ গ্রহণ করবেন।

১২) মুখ্যমন্ত্রী যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো কারণে, যা তার নিকট উপযুক্ত প্রতীয়মান হয়, পদত্যাগের জন্য একজন মন্ত্রী বা উপ-মন্ত্রীকে অনুরোধ করতে পারেন। যদি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পদত্যাগে ব্যর্থ হন, তবে তার নিয়োগ মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে গভর্নর কর্তৃক বাতিল করা হবে।

১৩। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বিধান সভার সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা খর্ব করে তার পদ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে পারেন, যদি না গভর্নর মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে বিধানসভা ভেঙে দেন।

১৪) যদি মুখ্যমন্ত্রী যে-কোনো সময়ে তার পদ থেকে ইস্তফা দেন, তবে অন্যান্য মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীগণ পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য করা হবে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী, উত্তরসূরি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্য সম্পাদন

করে যাবেন।

১৫) অধিবেশন ভেঙে দেয়ার তারিখে কার্যরত মুখ্যমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী তাদের উত্তরসূরি নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত কার্য সম্পাদন করে যাবেন।

৫। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮১ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে:

"৮১(১) রাজ্য সরকারের যাবতীয় নির্বাহী কার্যাবলো গভর্নরের নামে পরিচালিত হবে।

২) রাজ্যসরকার আইন দ্বারা পদ্ধতি নির্ধারণ করবে, যে পদ্ধতিতে গভর্নরের নামে প্রণীত ও সম্পাদিত আদেশ ও অন্যান্য দলিল-দস্তাবেজ স্বাক্ষরিত হবে এবং স্বাক্ষরিত আদেশের বৈধতা এই মর্মে আদালতে প্রশ্ন তোলা যাবে না যে আদেশ গভর্নর কর্তৃক প্রণীত বা সম্পাদিত হয়নি।

৩) রাজ্য গভর্নর তার কার্যাবলী পরিচালনার জন্য আইন তৈরি করতে পারবেন।'

৬। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮২ এবং ৮৪ বাদ যাবে।

৭। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৮৬ হতে ৯০ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:

'৮৬ এই অংশে 'অর্থ বিল' বলতে নিম্নে উল্লিখিত সব বা আংশিক বিষয়গুলো সংশ্লিষ্ট বিধান সম্বলিত বিলকে বোঝায়, অর্থাৎ,

ক) যে-কোনো কর আরোপ, উচ্ছেদ, প্রত্যাহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ;

খ) রাজ্য, গভর্নর দ্বারা কাজ অর্থ বা গ্যারান্টি প্রদান বা সরকারের আর্থিক বাধ্যবাধকতার বিষয়ে আইন সংশোধন।

গ) রাজ্যের একীভূত তহবিলে তত্ত্বাবধায়ন, তহবিলে অর্থ প্রদান, উক্ত তহবিল হতে অর্থ জারি ;

ঘ) রাজ্যের একীভূত তহবিলে চার্জ আরোপ, বা উক্ত চার্জ বিলোপ বা পরিবর্তন।

ঙ) রাজ্যের একীভূত তহবিল বা রাজ্যের পাবলিক একাউন্টস্-এ অর্থপ্রাপ্তি বা তত্ত্বাবধান বা উক্ত অর্থ ইস্যু।

চ) উল্লিখিত উপধারায় বর্ণিত যে-কোনো বিষয়ে আনুষঙ্গিক বিষয়।

২) কেবল এ কারণে একটা বিল অর্থ বিল হিসাবে গণ্য হবে না যে—

ক) কোনো জরিমানা বা অন্যান্য শাস্তিমূলক জরিমানা আরোপ বা

পরিবর্তনের জন্য বা লাইসেন্স ফি দাবি বা পরিশোধ বা প্রদত্ত কোনো সেবার জন্য ফি বা চার্জ আরোপ বা পরিশোধ বিলে উল্লেখ থাকে।

খ) স্থানীয় উদ্দেশ্যে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা লোকাল বডি কর্তৃক কোনো কর আরোপ, বিলোপ, মওকুফ বা নিয়ন্ত্রণ এই বিলে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

৩) প্রত্যেক অর্থ বিলে, যখন গভর্নরের সম্মতির জন্য গভর্নরের নিকট উপস্থাপন করা হয়, স্পিকারের স্বাক্ষর একটা সার্টিফিকেট সংযুক্ত সার্টিফিকেট যাবতীয় উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তমূলক হবে এবং যে-কোনো আদালতে প্রশ্ন উত্থাপন করা যাবে না।"

"৮৭। কোনো বিল বা সংশোধনী যা অনুচ্ছেদ ৪৬-এর ধারা (১) এ বর্ণিত যে-কোনো বিষয়ের বিধান তৈরি করে বা যদি আইন করা হয় এবং অপারেশনে আনা হয়, রাষ্ট্রের রাজস্ব হতে ব্যয় সংশ্লিষ্ট থাকে, রাজ্য সরকারের সুপারিশ ব্যতীত রাজ্যে বিধান সভায় উত্থাপন করা যাবে না।"

"৮৮। রাজ্য বিধানসভার কোনো আইনের ক্ষমতা ব্যতীত রাজ্যের উদ্দেশ্যে কোনো কর আরোপ করা যাবে না।"

"৮৯(১)। রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত সব রাজস্ব যে-কোনো ঋণ পরিশোধে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহীত যাবতীয় ঋণ নিয়ে একটা একীভূত তহবিলের অংশ গঠিত হবে, যা রাজ্য একীভূত তহবিল নামে পরিচিত হবে।"

"৯১(১)। রাজ্য একীভূত তহবিলের তত্ত্বাবধায়ক, উক্ত তহবিলে অর্থ পরিশোধ, উক্ত তহবিল হতে অর্থ উত্তোলন, রাজ্য সরকার দ্বারা বা অনুকূলে প্রাপ্ত উক্ত তহবিলে জমাকৃত অর্থ ব্যতীত সরকারি অর্থের তত্ত্বাবধান, রাজ্যের পাবলিক একাউন্টে পরিশোধ, উক্ত একাউন্ট হতে অর্থ উত্তোলন, উক্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বা সহায়ক যাবতীয় বিষয়সমূহ বিধানসভার আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত এ উদ্দেশ্যে বিধান প্রণীত না হয়, গভর্নর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

(২) প্রাপ্ত বা জমাকৃত সব অর্থ—

ক) রাজ্যের বিষয়ের নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা, রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রাপ্ত রাজস্ব বা সরকারি অর্থ ব্যতীত।

খ) যে-কোনো রাষ্ট্রের যে-কোনো বিষয়ে কোর্ট ফি রাষ্ট্রের পাবলিক একাউন্টস্- এ জমা করতে হবে।"

৪.১. নিম্নলিখিত নতুন অনুচ্ছেদ ৯০ এ হতে ৯০(এক) বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯০-এর পর যোগ করা হবে, যথা:

৯০-এ(১) রাজ্য সরকার প্রতি আর্থিক বছর, রাজ্য সরকারের প্রাক্কলিত প্রাপ্তি ও খরচের একটা প্রতিবেদন বিধানসভায় পেশ করবে। এই অংশে বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন হিসাবে উল্লিখিত।

২) বাৎসরিক আর্থিক প্রতিবেদন পৃথকভাবে দেখানো হবে:-

ক) রাজ্য একীভূত তহবিলে ধার্যকৃত ব্যয় হিসাবে সংবিধান দ্বারা বর্ণিত ব্যয় মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ।

খ) রাজ্য একীভূত তহবিলের জন্য প্রস্তাবিত অন্যান্য ব্যয় মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং অন্যান্য ব্যয় হতে রাজস্ব হিসাবে পার্থক্য করা হবে।

৯০-বি. নিম্নোক্ত ব্যয়সমূহ রাজ্য একীভূত তহবিলে ধার্য করা হবে:-

ক) গভর্নরকে প্রদেয় পারিতোষিক এবং গভর্নরের অফিস সংশ্লিষ্ট ব্যয় এবং

খ) হাইকোর্টের জজকে প্রদেয় পারিতোষিক, অনুদান এবং তাতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থ হ্রাস সাপেক্ষে কোনো দাবিতে মত পোষণের ক্ষমতা বিধানসভার থাকবে।

৩) রাজ্য সরকারের সুপারিশ ব্যতীত অনুদানের জন্য দাবি করা যাবে না।

৯০-ডি.(১) প্রাদেশিক সংসদ কর্তৃক সর্বশেষ পর্বের অনুচ্ছেদ অনুসারে অনুদানের ব্যবস্থা করার পর নিম্নোক্ত বিষয় পূরণের উদ্দেশ্যে যাবতীয় অর্থের সরকারি একত্রীভূত তহবিল থেকে উপযোজন করার জন্য সংসদে একটা বিল উত্থাপন করা হবে।

ক) প্রাদেশিক বিধানসভা কর্তৃক প্রদত্ত অনদান

খ) সরকারি একীভূত তহবিলে ধার্যকৃত কিন্তু পূর্বে বিধানসভায় পেশকৃত স্টেটমেন্টে প্রদর্শিত পরিমাণ অতিরিক্ত নয়।

২) উক্ত বিলের উপর বিধানসভায় কোনো সংশোধনের প্রস্তাব করা হবে না।

৩) সংবিধানের বিধানাবলী সাপেক্ষে এই অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে অনুমোদিত আইনের অধীনে উপযোজন ব্যতীত কোনো অর্থ সরকারি একীভূত তহবিল হতে উত্তোলন করা যাবে না।

"৯০-ই. যে-কোনো অর্থ বছরের ব্যাপারে যদি দেখা যায়—

প্রাদেশিক সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্যগণ;

প্রাদেশিক বিধান সভার স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার;

খ) হাইকোর্টে, প্রাদেশিক সরকারি কর্মকমিশন এবং প্রদেশের বিধানসভার সচিবালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রদেয় পারিতোষিকসহ প্রশাসনিক খরচ;

গ) যাবতীয় ঋণের উপর চার্জ, সুদ, সিকিং ফান্ড, চার্জ, মূলধন পরিশোধ ও অন্যান্য ব্যয়।

ঘ) কোনো আদালত বা ট্রাইবুনাল কর্তৃক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ব্যয়, ডিক্রি বা ঘোষণার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য যে-কোনো পরিমাণ অর্থ।

৯০-সি(১) সরকারি একীভূত তহবিলের উপর ধার্যকৃত ব্যয়সংক্রান্ত বার্ষিক ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হতে পারে কিন্তু বিধানসভায় পেশ করা হবে না।

২) অন্যান্য ব্যয়ের বিষয়ে বার্ষিক ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বর্ণিত অর্থ চাহিদার আকারে প্রাদেশিক বিধানসভায় পেশ করা হবে।

ক) চলতি বছরে কোনো নির্দিষ্ট সার্ভিসের জন্য ব্যয়যোগ্য অনুমোদিত পরিমাণ অপর্যাপ্ত হলে বা ঐ বছরের জন্য বার্ষিক ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে অন্তর্ভুক্ত নয়, নতুন সার্ভিসের জন্য ব্যয়ের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি হয়।

খ) কোনো বছরের জন্য কোনো সার্ভিসের উদ্দেশ্যে অনুমোদিত পরিমাণের অতিরিক্ত যে-কোনো অর্থ কোনো অর্থবছরে যে-কোনো সার্ভিসের জন্য খরচ হয়েছে।

৯০-এফ (১) এই অধ্যায়ের চলতি বিধানে যাই থাক না কেন, প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতা রয়েছে:-

ক) অনুদানের অনুমোদনের জন্য ৯০-এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে যে-কোনো অর্থ বছরের একটা অংশের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ব্যাপারে অগ্রিম কোনো অনুদান প্রদান করা।

খ) রাষ্ট্রের সম্পদের উপর অপ্রত্যাশিত দাবি পূরণের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা করা।

গ) ব্যতিক্রমধর্মী অনুদানের ব্যবস্থা করা যা চলতি অর্থবছর এবং বিধানসভার কোনো অংশ হিসাবে গৃহীত হবে না।

২) ধারা অনুসারে কোনো অনুদানের ব্যবস্থা করতে অনুচ্ছেদ ৯০-সি ও ৯০-ডি- এর বিধানাবলীর কার্যকারিতা থাকবে না।

১) এবং বার্ষিক ফিন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে উল্লিখিত কোনো ব্যয়ের বিষয়ে অনুদানের ব্যবস্থাকরণে উক্ত ধারার অধীনে প্রণীতব্য আইনের কার্যকারিতা থাকবে না।

৮-(১) অনুচ্ছেদ ৯১-এর ধারা ১ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:

৯১। বাংলাদেশ রাজ্যের একটা হাইকোর্ট থাকবে এবং পাকিস্তানে প্রতিটি প্রদেশের জন্য হাইকোর্ট থাকবে।

৯(১) সংবিধান এর অনুচ্ছেদ ৯২-এর ধারা-২-এর বিলুপ্তি ঘটবে।

(২) ধারা-২-এর উপ-ধারা (সি) কে উপ-ধারা (বি) আখ্যায়িত হবে।

(৩) সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯২-এর ধারা ৩ বাদ যাবে।

১০। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৯, ১০৩, ১০৫:৪, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪ এবং অনুচ্ছেদ ১৩১-এর ধারা ২ বাদ দেয়া হবে।

১১। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৪ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

"১৩৪। আইন প্রণয়নের ক্ষমতার আওতাধীন নয় এমন কোনো সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিধানসভা কর্তক যে-কোনো আইন প্রণয়ন বাতিল হবে।"

১২। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৭ বাদ যাবে।

১৩। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩৮ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে। যথা:-

"১৩৮। সম্ভাব্য সংক্ষিপ্ত সময়ে পাকিস্তানের সমগ্র অঞ্চল হতে প্রতিরক্ষা সার্ভিসসহ সব ফেডারেল সার্ভিসে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করাই হবে কেন্দ্রীয় সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্ব।"

১৪। বিগত সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৪০ নিম্নোক্তভাবে প্রতিস্থাপিত হবে, যথা:-

"১৪০। রাজ্যের নির্বাহী ক্ষমতা তার এখতিয়ারে রাজ্যের বিধানসভার আইন দ্বারা নিরূপিত রাজ্যের একীভূত তহবিলের নিরাপত্তার জন্য ধার্য করতে পারে এবং গ্যারান্টি প্রদান করতে পারে।"

১৮৭০ সালের ২৩ মার্চ তারিখে দরকষাকষি চূড়ান্ত উপায়ে উল্লেখ করে পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রে বলা হয়:

দুপুর ১১.৪৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্টের লোক ও আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডঃ কামাল আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তার নিজের তৈরি একটা খসড়া ঘোষণাপত্র উপস্থাপন করেন (পরিশিষ্ট-ই দেখুন)। আওয়ামী লীগ এই পরামর্শ গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত ছিল না, উত্তেজনাকর পরিস্থিতি ও চাপ পিপিপি ও অন্যান্য জাতীয় সংসদের দলের সাথে আলোচনার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বের খসড়া ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে আলোচনা চলবে। আওয়ামী লীগ এই পরামর্শে সম্মত নয় যে তারা যদি ইচ্ছা করে তবে মূল খসড়ায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতে পারে।

এ অবস্থায় আওয়ামী লীগের খসড়া যাচাই বাছাই আরম্ভ হয়ে যায় এবং বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত আলোচনা স্থগিত রাখা হয়। তখন একটা সান্ধ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ নিম্নোক্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

(১) আইনগত বিষয় ছিল যে এ ধরনের কোনো ঘোষণাপত্র সম্পূর্ণভাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহারের পূর্বে জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংশোধিত হবে।

(২) আওয়ামী লীগের খসড়ায় যে তারিখে প্রাদেশিক গভর্নর (যিনি অপসারণযোগ্য নন) শপথ গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানব্যাপী ঘোষণাপত্র আরম্ভের তারিখ ৭ দিন শেষে, সেই তারিখে প্রদেশে সামরিক শাসক প্রত্যাহারের উল্লেখ করা হয়।

উল্লেখ করা হয় যে, এতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এবং সামরিক শাসন, যদি প্রত্যাহার করতে হয়, যে তারিখে সব প্রদেশের প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ শপথ করা হবে।

(৩) ২টা অঞ্চল থেকে জাতীয় সংসদের সদস্যের কমিটি গঠনের ব্যাপারে পূর্বের বিধান এই মর্মে কার্যকর করার জন্য আওয়ামী লীগের খসড়ায় পরিবর্তন করা হয় বাংলাদেশ রাজ্য ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজ্যসমূহ হতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য পৃথক সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পৃথক Constituent Convention

প্রতিষ্ঠা করবে। উল্লেখ করা হয় যে এটা পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ এবং পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ভেঙে কার্যত অধিবেশনের জন্য সাংবিধানিক ফরমুলা সৃষ্টি করে।

(৪) আওয়ামী লীগের নিকট উল্লেখ করা হয় যে জাতীয় সংসদের সদস্য কর্তৃক গৃহীতব্য শপথ তাদের খসড়ায় পরিবর্তন করা হয়। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিবেশন আহ্বান করা হবে, ১২ নং অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত শপথের উল্লেখ করা হয়।

আমি .... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে) ঘোষণা করছি যে পাকিস্তানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব। আমি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ১৯৭০-এর বিধানাবলী এবং উক্ত আদেশে বর্ণিত সংসদের আইন অনুসারে এবং পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব, সংহতি, কল্যাণ ও অগ্রগতির স্বার্থে সততার সাথে এবং আমার ক্ষমতাবলে দায়িত্ব পালন করব।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭(৫) নং অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত শপথের উল্লেখ করা হয়:-

আমি............ সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে) ঘোষণা করছি যে প্রণীত আইন অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব।

৫) প্রেসিডেন্টের দল আওয়ামী লীগের সাথে তাদের খসড়ায় বিধানের গুরুত্ব ও প্রভাব নিয়ে আলোচনা করে যে সংসদ পাকিস্তান কনফেডারেশনের জন্য সংবিধান পেশ করবে। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে, কনফেডারেশনের অর্থ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ইউনিয়ন, যা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্কে আদেশ ও আওয়ামী লীগের ৬ দফা বিরোধী, যার প্রতিটিতে বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়েছে যে পাকিস্তান একটা ফেডারেল প্রজাতন্ত্র হবে।

৬) আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭(৭) নং অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে প্রেসিডেন্ট তার নিকট সংবিধান বিল উপস্থাপন করা হলে, তা স্বাক্ষর করবেন এবং যে-কোনো ক্ষেত্রে উপস্থাপনের তারিখ হতে ৭ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তা স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। আওয়ামী লীগ দলের নিকট উল্লেখ করা হয় যে, এর বিধান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশের পরিপন্থী এবং লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশে উল্লিখিতভাবে মৌলিক সাংবিধানিক নীতির সাথে বিরোধ সংবিধানের জন্য একটা পথ খুলে দিবে।

আওয়ামী লীগের খসড়াতেও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলো হচ্ছে:-

১) আওয়ামী লীগের খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেবল ১২টি দফা নিয়ে ১৯৬২ সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে ৪৯টি দফা এই নির্দেশ দিয়ে সংশোধিত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ঐ ১২টি দফা নিয়ে কেন্দ্রীয় বিষয় গঠিত হবে এবং বাকি দফা প্রাদেশিক বিষয় হবে।

২) এমনকি তৃতীয় তফশিলের ১২টি দফার বিষয়ে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধন করে। এভাবে আওয়ামী লীগের খসড়ায় তৃতীয় তফশিলেই শুধু পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা উল্লেখ করা হয়। ১৯৬২ সালের সংবিধানে এই দফা ৫ উপ-দফা নিয়ে গঠিত এবং উল্লেখ করা হয় যে এতে সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর কাজ সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা অস্ত্র তৈরি সংশ্লিষ্ট শিল্প সেনানিবাস এলাকার অধিক্ষেত্র হতে অন্তর্ভুক্ত।

৩) পররাষ্ট্র বিষয়ের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ ফরমুলা দিল বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুদানসহ পররাষ্ট্র বিষয় ১৯৬২ সালের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত। ৭টি উপ-দফাও আওয়ামী লীগের খসড়ায় অন্তর্ভুক্ত।

৪) উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ পররাষ্ট্র বিষয় থেকে বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুদানকে আলাদা করার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে উল্লেখ অবস্থান থেকে অনুধাবন করতে পারে।

আওয়ামী লীগ বিদেশে পৃথক বাণিজ্য মিশন স্থাপনের প্রস্তাব উল্লেখ করে।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৪(১) নং অনুচ্ছেদে, যাতে কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে, নিম্নোক্তসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

(১) সেন্ট্রাল পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা সার্ভিস-এর কেন্দ্রের বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট পদসমূহের ব্যাপারে কোনো উল্লেখ নেই।

(২) জাতীয় শুমারী পরিচালনার জন্য কোনো সংস্থার উল্লেখ নেই। এক ব্যক্তি এক ভোট নীতিতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি।

(৩) আওয়ামী লীগ এসব বিষয়ে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে অনীহা প্রকাশ করে।

করারোপ বিষয়ে আওয়ামী লীগের খসড়ায় তাদের নিজের খসড়ায় উল্লিখিত কেন্দ্রীয় বিষয়সমূহের ব্যাপারে কেন্দ্র কর্তৃক বাধ্যবাধকতা প্রতিপাদনে করারোপে বিধান নেই। আরো ২টি বিধানও আওয়ামী লীগের খসড়া অন্তর্ভুক্ত :

(১) পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় কর সংগ্রহ না করেও ধারণা করা হয় যে, ১৯৭০-৭১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত অংকের নিচে প্রাদেশিক সম্পদের পুরো ঘাটতি কেন্দ্র কর্তৃক পূরণ করা হবে।

(২) নির্দেশ থাকে যে কেন্দ্রকে প্রদেশের একটা নির্দিষ্ট হারে প্রদান নীতিও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ১৯৭১, ৩০ জুনের বেশি সময় স্থায়ী হয়।

প্রেসিডেন্টের দল উল্লেখ করে যে, স্বীকৃত ফেডারেল প্যাটার্ন এই ছিল যে, তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কর আরোপ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকবে।

আওয়ামী লীগের খসড়ায় যে প্রাদেশিক বিধান সভার নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের উল্লেখ করা হয়। ফেডারেল স্টেট ব্যাংকের নিকট শুধু নিম্নোক্ত কার্যাবলী ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১) রূপীর বিনিময় হার নির্ধারণের সুপারিশ

২) স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের অনুরোধে মুদ্রা ছাপানো।

৩) টাকশাল ও সিকিউরিটি প্রেস ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৪) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কার্য সম্পাদন করা, তবে শর্ত থাকে যে উক্ত কার্যাবলী স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের নির্দেশনা অনুসারে সম্পাদন করতে হবে।

৫) আওয়ামী লীগের অনুচ্ছেদ ১৭(১১) এর সাথে গঠিত অনুচ্ছেদে ১৬ কেবলমাত্র ২ সপ্তাহ ৯ এপ্রিলের মধ্যে স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তান স্থাপনের কথা বলা হয়।

আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাব পরিবর্তন করার আগ্রহী ছিল না।

আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে তাদের তফশিলের মাধ্যমে ১৯৬২ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪, যথা: অনুচ্ছেদ ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২ ও ১৩১-এর ধারা ২ বাদ দেয়া হয়। ১৯৬২ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮১, ৮৪, ১৯২-এর সংশোধন করা হয় এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে দুর্বল করার জন্য তাতে নতুন অনুচ্ছেদ ৯০ এ ৯০ এফ সংযোজন করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১৩১-এর ধারা ২-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয় যে কেন্দ্রীয় বিধানসভা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে।

ক) পাকিস্তানের অর্থনেতিক ও আর্থিক অস্তিত্বসহ পাকিস্তানের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে-

খ) পরিকল্পনার ও সমন্বয়তার জন্য

গ) পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে যে-কোনো বিষয়ে সমতা অর্জনের জন্য।

উপরোল্লিখিত (ক) এর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রেসিডেন্টের দল উল্লেখ করে যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের উদ্দেশ্য মেটাবার জন্য ঘোষণাটি তৈরি করা হয়। সেহেতু আওয়ামী লীগের সব দাবি অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই। জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এর উপর বললেন যে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণাপত্র বের করতে হবে। তিনি আরো বললেন যে, এই মেয়াদ শেষে ঘোষণাপত্রে খুব দেরি হয়ে যাবে। তাকে উল্লেখ করা হয় যে, অন্যান্য অংশের সংসদীয় দলগুলো আওয়ামী লীগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ২০ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে আওয়ামী লীগ নেতাদের ইতিমধ্যে বলেছেন যে সব দলের সমঝোতার প্রয়োজন আছে।

পাকিস্তান সরকার

পূর্ব পাকিস্তানের ওপর শ্বেতপত্র

পূর্ব পাকিস্তানের ১৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে পরিস্থিতি ছিল :

১। আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কার্যকলাপের কারণে আইনশৃঙ্খলা সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়ে।

২। ব্যাপক অগ্নিসংযোগ, লুট পাট ছাড়াও আওয়ামী লীগের সহিংসতায় ৩ মার্চ চট্টগ্রামে, ৫ মার্চে খুলনায় শত শত লোক আহত করে, অবিশ্বাসীদের উপর আক্রমণ করে একটা সংকটময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

৩। শেখ মুজিবুর রহমান প্রশাসন, যোগাযোগ, বাণিজ্যিক লেনদেন ইত্যাদির ব্যাঘাত সৃষ্টি করে আনুষ্ঠানিক ঘোষণাপত্রের নির্দেশ দ্বারা কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক উভয় সরকারের ক্ষমতাকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেন।

৪। পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর চলাচল।

ঘটনা এই শ্বেতপত্রে পর্যায়ক্রমিকভাবে বর্ণিত হয়।

৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ইচ্ছার স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ সত্ত্বেও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আরেক দফা সাংবিধানিক আলোচনার জন্য ১৫ মার্চ ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করেন। ৭ মার্চ, ১৯৭১ শেখ মুজিব কর্তৃক পেশকৃত ৪ দফা দাবি নিম্নরূপ:

১। অবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার

২। অনতিবিলম্বে সব মিলিটারিকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়া

৩। হত্যাকাণ্ডের তদন্ত

৪। অনতিবিলম্বে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর (জাতীয় সংসদ অধিবেশনের পূর্বে)

উল্লেখ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কোনো নিশ্চয়তা দেননি যে, ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট কর্তৃক আহ্বানকৃত জাতীয় সংসদের অধিবেশনে তিনি যোগদান করবেন। এমনকি যদিও এসব শর্ত গৃহীত হয়। প্রকাশ্য বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ- যদি এসব শর্ত গ্রহণ করা হয়, আমরা বিবেচনা করব অধিবেশনে যোগ দেব কিনা।

১৬ মার্চ ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার ৪ দফা দাবি পেশ করেন। অতঃপর তিনি আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের সাথে মিলিত হন। একই দিন তিনি পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যেকটা বাড়িকে দুর্গে পরিণত করার জন্য জনগণকে আহ্বান জানিয়ে একটা স্টেটমেন্ট দেন।

১৭ মার্চ ১৯৭১

প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তার দ্বিতীয় দফায় আলোচনায় বসেন এবং বলেন যে, যত দ্রুত সম্ভব জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরের নীতিতে অটল রয়েছেন।

একই দিন সন্ধ্যায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মি. তাজউদ্দীন আহ্মেদ এবং ডঃ কামাল হোসেনকে নিয়ে গঠিত আওয়ামী লীগ প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্টের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে। যে প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে তা আলোচিত হয়। সরকারের কার্যাবলীতে প্রাদেশিক গভর্নরকে সাহায্য ও পরামর্শ প্রদানের লক্ষ্যে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে একটা সাময়িক ঘোষণাপত্রের খসড়া প্রণয়ন করা হয়। খসড়ায় সামরিক আইন ঘোষণাপত্রে পিছিয়ে ফিরে আসার জন্য সামরিক আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত।

একই সময়ে সামরিক আইন প্রশাসক একটা আদেশ জারি করেন, যার দ্বারা তদন্ত কমিশন পরিস্থিতি তদন্ত করার জন্য গঠিত হয়। উক্ত আদেশ বলে ১ মার্চ ১৯৭১ তারিখে বেসামরিক ক্ষমতার সাহায্যে সৈন্যবাহিনী তলব করা হয়।

প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত পূর্ব পাকিস্তানের হাইকোর্টের জজের নেতৃত্বে কমিশন গঠিত হয়। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিস, পুলিশ সার্ভিস, পাকিস্তান আর্মি ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেল থেকে নির্বাচিত ৪ জন সদস্য নিয়ে কমিশন গঠিত হয়। •

১৮ মার্চ, ১৯৭১

তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান করে শেখ মুজিব একটা বিবৃতি দেন, যাতে ৭ মার্চের তার চার দফা দাবির ৩ নং দফার উল্লেখ থাকে। তিনি বলেন, "আমরা এমন কমিশন গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশের জনগণ এই কমিশনের সদস্যদের সার্ভিস প্রদানে এইরূপ কমিশনকে সাহায্য করবে না। তিনি আরো বলেন, সামরিক আইনের আদেশ জারি এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের নিকট কমিশনের রিপোর্ট পেশের বিধান আপত্তিকর।

১৯ মার্চ, ১৯৭১

শেখ মুজিবুর রহমান সকাল ১১.০০ টার সময় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, খসড়া সামরিক আইন ঘোষণাপত্র প্রণয়নে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের উপর আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ করা হবে এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশে পুরোদমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার থাকবে। তিনি সম্পূর্ণ সামরিক আইন প্রত্যাহারের কথাও বলেন।

সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্টের লোক ও শেখ মুজিবুর রহমান আরো একটা সভার আয়োজন করেন। আওয়ামী লীগকে উল্লেখ করা হয় যে, যদি ২৫ মার্চ ১৯৬৯ তারিখে সামরিক আইনের ঘোষণা বাতিল করা হয়, তবে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার প্রতিষ্ঠাকারী দলিলের কোনো আইনগত বৈধতা থাকবে না। দেশে সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে। আরো বলা হয় যে জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান প্রধান সামিরক আইন প্রশাসক হওয়ার কারণে প্রেসিডেন্টের পদ অলংকৃত করবেন। জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ বলেন, এগুলো রাজনৈতিক ইস্যু এবং রাজনৈতিক পদ্ধতিতে মীমাংসা হবে। ডঃ কামাল হোসেন পরামর্শ দেন যে, জেনারেল এ, এস, ইয়াহিয়া খান নিজে সি এম এল এ-এর পদ থেকে ইস্তফা দেবেন এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদ ও ক্ষমতা ধারণ করবেন।

এই সভার পর প্রেসিডেন্টের দল আওয়ামী লীগ দলের দাবি মেটানোর জন্য আরো একটা সামরিক আইনের ঘোষণার খসড়া তৈরি করে। এই সামরিক আইনের ঘোষণায় উল্লেখ করা হয় :

১। কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ গঠন।

২। ১৯৬২ সংবিধান অনুসারে জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ।

৩। সামরিক আইন প্রশাসকের অফিস ও মিলিটারি কোর্ট ইত্যাদির বিলোপ সাধন, কিন্তু আইনগত শূন্যতা রোধে সি. এম. এল. এ-এর অফিস যথাযথ থাকবে।

একই দিন তিন পাকিস্তানি নেতা কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিয়া মমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ও সর্দার শাখাওয়াত হায়াৎ খান এবং জমিয়াতুল উলেমা-এ-ইসলামের মাওলানা মুফতী মাহমুদ সাংবিধানিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য প্রেসিডেন্ট ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করার উদ্দেশে ঢাকায় উপস্থিত হন।

২০ মার্চ ১৯৭১

জয়দেবপুরে কনভয় কর্তৃক আর্মিদের সাপ্লাই-এর এবং চট্টগ্রামে পাকিস্তানি জাহাজ এমভি শওকত সামরিক সরঞ্জামের স্বাভাবিক চলাচলে আওয়ামী লীগের

জোরালো প্রতিরোধ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট দলের সাথে রাজনৈতিক আলোচনা অব্যাহত রাখেন। সকাল ১০.০০ টার সময় প্রেসিডেন্ট ও তার লোক এবং শেখ মুজিবসহ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খোন্দকার মোশতাক আহ্‌মেদ, ক্যাপটেন মনসুর আলী, মি. তাজউদ্দীন আহ্‌মেদ, মি এ. এইচ. এম. কামরুজ্জামান ও ডঃ কামাল হোসেনের মধ্যে একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেসিডেন্ট স্পষ্টভাবে শেখ মুজিবকে নির্দেশ দেন সব রাজনৈতিক নেতাদের স্পষ্ট চুক্তি শান্তিপূর্ণভাবে যে পরিকল্পনায় তার বিবেচনা করার পূর্বে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রেসিডেন্টের লোকজনও যে-কোনো ইন্সট্রুমেন্টের আইনগত বৈধতার ব্যাপারে প্রতিবাদ জানান যার দ্বারা সম্পূর্ণভাবে সামরিক শাসন প্রত্যাহার করা হবে এবং পরবর্তীতে জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্টের পদ ও ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিব ও তার লোকদের বোঝান যে, প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্রের আইনগত অনুমোদন আইন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরীক্ষা করা হবে। আওয়ামী লীগ তাদের অবস্থান সমর্থনে একজন সংবিধান বিশেষজ্ঞ (মি: এ. কে. ব্রোহী) কে ঠিক করেন। একই সময়ে প্রেসিডেন্টের লোক ও শেখ মুজিবের দলের মধ্যে আরো আলোচনার জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যের ব্যাপারে একমত হয়।

১) সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হবে।
২) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ গঠনের জন্য বিধান প্রণয়ন করা হবে।
৩) কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সংসদকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হবে।
৪) পূর্ব পাকিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হবে।
৫) সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি, যে পদ্ধতিতে এসব পদক্ষেপ কার্যকর করা হবে, আরো আলোচনা করা হবে।

আইনগত শর্ত পূরণের উদ্দেশ্যে উল্লেখ করা হয় যে, ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ কর্তৃক এসব উদ্দেশ্যা বাস্তবায়ন করার জন্য ইন্সট্রুমেন্ট সংশোধিত না হওয়া পর্যন্ত সামরিক আইন অব্যাহত থাকবে। শেখ মুজিবুর রহমান এতে রাজি হননি।

পরে একই দিন, প্রেসিডেন্ট কর্তৃক জারিকৃত ঘোষণাপত্রের একটা কার্যকরী খসড়া প্রস্তুত করা হয়। এটা আওয়ামী লীগের আপত্তি দূর করার লক্ষ্যে প্রস্তুত করা হয় প্রস্তাবিত ইন্সট্রুমেন্টটি সামরিক আইনের বিধানের আকারে জারি করা হবে না। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে বস্তুগত অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার ভিত্তি হিসাবে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য খসড়া ঘোষণাপত্র প্রস্তুত করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা এই ঘোষণাপত্রে আইনগত অনুমোদন ছিল না। আওয়ামী লীগের সংবিধান বিশেষজ্ঞদের সাথে আলোচনার জন্য মুলতবি রাখা হয়। আইনগত বৈধতার

যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে খসড়া ঘোষণা এর মুখ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্নরূপ:-

১) ২৫ মার্চ ১৯৬৯ তারিখের সামরিক আইনের ঘোষণা যে তারিখে প্রাদেশিক মন্ত্রিপরিষদ শপথ গ্রহণ করবে, সেই তারিখ হতে বাতিল বলে গণ্য করা হবে।

২) ঘোষণাপত্রের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিবর্ধনসহ ৪ এপ্রিল, ১৯৬৯ তারিখে সাময়িক সংবিধান আদেশ অন্তর্বর্তী মেয়াদে পাকিস্তানের সংবিধান হিসাবে গৃহীত হবে।

৩) ঘোষণাপত্র জারির অব্যবহিত পূর্বে প্রেসিডেন্ট হিসাবে পদ ধারণকারী ব্যক্তি অন্তর্বর্তী মেয়াদের জন্য প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪) প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রের নির্বাহী প্রধান হবেন এবং সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবেন, যা সামরিক সংবিধান আদেশ ১৯৬২ সংবিধান পঠিত, এখানে বিগত সংবিধান হিসাবে উল্লিখিত ধারা অনুসারে প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

৫) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নির্বাচিত একটা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ থাকবে।

৬) বিগত সংবিধান অনুসারে পাকিস্তানের জাতীয় সংসদের কার্যাবলী লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে বর্ণিত জাতীয় সংসদ কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৭) কেন্দ্রীয় বিধানসভার পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশের ব্যাপারে সম্মত কিছু নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ও পরিবর্তন সাপেক্ষে সংবিধানের তৃতীয় তফশিলে উল্লিখিত বিষয়সমূহের ব্যাপারে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে।

৮) বিগত সংবিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ কার্যাবলী এ. এফ. ও. অনুসারে প্রাদেশিক সংসদে নির্বাচিত সদস্য কর্তৃক সম্পাদিত হবে।

৯) প্রদেশের সংসদীয় গ্রুপের নেতাদের সাথে আলোচনাক্রমে প্রেসিডেন্ট প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ করবেন এবং প্রেসিডেন্টের সন্তুষ্টিতে পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন।

১০) প্রত্যেক প্রদেশে কার্য সম্পাদনে গভর্নরকে সাহায্য ও উপদেশ প্রদানের জন্য একজন মুখ্যমন্ত্রীসহ একটা মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। তবে কোনো ব্যক্তিকে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা হবে, যদি না তিনি প্রাদেশিক সংসদের সদস্য হন বা কোনো ব্যক্তি জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সদস্য হন।

১১) ঘোষণাপত্রের ঘোষণার ৭ দিনের মধ্যে ২টা কমিটি, একটা ঢাকায় এবং অন্যটি ইসলামাবাদে বিশেষ বিধান প্রণয়ন এবং জাতীয় সংসদ কর্তৃক

প্রণীতব্য সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করতে পাকিস্তানের প্রত্যেক প্রদেশে প্রয়োজনীয়তার উদ্দেশ্যে গঠিত হবে।

১২) উক্ত কমিটির রিপোর্ট পাওয়ার পর প্রেসিডেন্ট যে তারিখে, সময়ে ও দিনে প্রয়োজন মনে করবেন সেই তারিখে, সময়ে ও দিনে পাকিস্তানের সংবিধান প্রণয়নের জন্য জাতীয় সংসদ আহ্বান করবেন।

১৩) যখনই প্রেসিডেন্টের নিকট প্রাদেশিক গভর্নরের নিকট থেকে বা অন্যভাবে রিপোর্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যেখানে উক্ত প্রদেশের সরকার কার্যসম্পাদন করতে পারছে না, সেক্ষেত্রে প্রেসিডেন্ট প্রদেশের নির্বাহী সরকারের কার্যাবলী ঘোষণা বলে সম্পাদন করবেন।

একই দিনে (২০ মার্চ, ১৯৭১) কাউন্সিল মুসলিম লীগ ও জামিয়াতুল উলেমা-ই-ইসলাম এর নেতাদের শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে পৃথক সভা হয়।

২১ মার্চ, ১৯৭১

মি. তাজউদ্দীন আহমেদসহ শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে একটা অঘোষিত সভায় মিলিত হন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিপরিষদ গঠনে আর আগ্রহী নন। এটা একটা গরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন। আওয়ামী লীগ তাদের পূর্ব প্রতিশ্রুতির মতো তাদের খসড়া ঘোষণাপত্রের আইনগত বৈধতা প্রতিষ্ঠা করতে সংবিধান বিশেষজ্ঞ প্রদানে ব্যর্থ হয়।

প্রেসিডেন্টের আমন্ত্রণে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান মি. জেড এ ভুট্টো তার দলবল নিয়ে ঢাকায় উপস্থিত হন।

২২ মার্চ, ১৯৭১

আলোচনার জন্য ভুট্টোর সাথে দেখা করতে অস্বীকার করে শেখ মুজিবের প্রকাশ্যে ঘোষণা সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর সাথে যৌথ সভা আহ্বান করতে ২ জন নেতার উপর চাপ প্রয়োগ করেন। সভাশেষে ২৫ মার্চ, ১৯৭১ তারিখে জাতীয় সংসদ আহ্বান করে রাষ্ট্রপতি আদেশ রহিত করা হয়। এতে বলা হয় যে, প্রস্তাবিত ঘোষণায় আইনগত বৈধতা প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় সংসদের অধিবেশন ২ এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ আহ্বান করা হবে। আওয়ামী লীগ তা গ্রহণ করেনি।

প্রেসিডেন্ট মিয়া মোমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা, সর্দার শওকত হায়াৎ, মাওলানা মুফতী মাহমুদ, খান আবদুল ওয়ালী খান এবং মীর গাউস বক্স বেজেনজোর সাথেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি একটা রাজনৈতিক মীমাংসায় আসার প্রচেষ্টায় শেখ মুজিবের সাথে দেখা করার জন্য তাদের বলেন।

ইতোমধ্যেই সংশোধিত খসড়া ঘোষণাপত্র মি. জেড এ ভুট্টো ও মি. তাজউদ্দীন

আহমেদের নিকট পেশ করা হয়। বিকেল ৬.০০ সময় মি. জেড এ. ভুট্টো মি. মাহমুদ আলী কাসুরী, মি. জে এ রহিম, ডঃ মোবাশশের হোসেন, মি. হাফিজ পীরজাদা এবং মি. রফি রাজাসহ প্রেসিডেন্টের লোকদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। পিপিপি প্রতিনিধিগণ নিম্নোক্ত বিষয় উল্লেখ করেনঃ-

১) সামরিক আইন প্রত্যাহারের পর এবং জাতীয় সংসদ দ্বারা সংশোধনী ব্যতীত প্রস্তাবিত ঘোষণাপত্র আইনগত অনুমোদন ব্যতীত রেখে দেয়া হবে। অতএব, তারা পরামর্শ দেন যে, ঘোষণাপত্র জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হবে বা ঘোষিত হবে। কিন্তু জাতীয় সংসদ দ্বারা সংশোধনের পর কার্যকারিতা প্রদান করা হবে।

২) পিপিপির অবস্থান ছিল যে প্রয়োজনীয় আইনগত অনুমোদন ছাড়াই ঘোষণাপত্রের কোনো মূল্য নেই এবং আওয়ামী লীগ কর্তৃক স্বাধীনতা একক ঘোষণায় কোনো আইনগত বাধাও হবে না।

৩) জাতীয় সংসদের ঘটনাস্থল সম্মিলিত অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রোধে তারা পরামর্শ দেন যে, ঘোষণাপত্রে কোনো আইন বা সংবিধান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করা হবে না, যদি না প্রত্যেক অংশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৪) তারা অনুধাবন করতে পারেন যে ১৯৬২ সংবিধানের তৃতীয় তফশিল আলাদা করতে ক্ষমতা তফশিল সংশোধনে সীমিত এবং তফশিলের সব দফার পরিবর্তন আনতে ক্ষমতা থাকবে না।

৫) প্রাদেশিক গভর্নর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের পরামর্শ নয়, বরং কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে। যা কিছু-কিছু ক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকার নিজ ইচ্ছায় কাজ করতে পারে, যদি সরকার প্রতিনিধিত্বমূলক ধারণার সাথে এর বিরোধ সৃষ্টি হয়।

৬) পিপিপি ঘোষণার পর এল এফ ও এর মর্যাদা সম্বন্ধে তদন্ত করে দেখেছে। তদন্তে এফ. এল ও এর চলাচল দেয়া হয়।

৭) সবশেষে পিপিপি অনুধাবন করল যে, জাতীয় সংসদ সর্বপ্রথমে একক গোষ্ঠী হিসাবে অধিবেশনে বসবে এবং তারপর ২টি কমিটি গঠন করবে।

২৩ মার্চ, ১৯৭১

সশস্ত্র র‍্যালি এবং শেখ মুজিবের বাসায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনসহ ২৩ মার্চের ঘটনা সর্বত্রই প্রকাশ পায়।

দুপুর ১১.৪৫ মিনিটের সময় প্রেসিডেন্টের লোক ও আওয়ামী লীগের মধ্যে একটা সভা হয়। ডঃ কামাল হোসেন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তার নিজের প্রস্তুত একটা খসড়া ঘোষণাপত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগ পরামর্শ গ্রহণ করতে

প্রস্তুত ছিল না যে, ঘটনার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা ও চাপের পরিপ্রেক্ষিতে এমনকি পিপিপি ও অন্যান্য জাতীয় সংসদের দলের সাথে পরামর্শের প্রয়োজনীয়তায় পূর্বের খসড়া ঘোষণাপত্রের ভিত্তিতে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া হবে। আওয়ামী লীগ এই পরামর্শে একমত হল না, যদি তারা ইচ্ছা প্রকাশ করেন, মূল খসড়ার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারেন।

এইরূপ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগের খসড়া যাচাই-বাছাই আরম্ভ হয়ে যায় এবং বিকেল ৬.০০ টা পর্যন্ত আলোচনা মুলতবি হয়ে যায়। তারপর একটা সান্ধ্য সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগের সাথে নিম্নোক্ত ইস্যু নিয়ে আলোচনা হয়ঃ-

১) আইনগত দিক ছিল যে, এ ধরনের ঘোষণাপত্র সামরিক আইন সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহারের পূর্বে জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংশোধিত হবে।

২) আওয়ামী লীগের ঘোষণায় যে তারিখে প্রাদেশিক গভর্নর (যিনি অপসারণযোগ্য নন) শপথ গ্রহণ করবেন সে তারিখে ঘোষণাপত্র কার্যকর হওয়ার ৭ দিন পর সমগ্র পাকিস্তান সামরিক আইন প্রত্যাহারের কথা উল্লেখ রয়েছে। উল্লেখ করা হয় যে, এতে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে এবং সামরিক আইন যদি প্রত্যাহার করা হয়, সব প্রদেশের প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ কর্তৃক শপথ গ্রহণের তারিখে প্রত্যাহার করা হবে।

৩) দুটো অঞ্চল হতে জাতীয় সংসদের সদস্য নিয়ে কমিটি গঠনের বিষয়ে পূর্বের বিধান এই মর্মে আওয়ামী লীগের খসড়া সংশোধন করা হয় যে, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তান হতে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সদস্যগণ শপথ গ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশ এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য সংবিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পৃথকভাবে Constituent Convention হিসাবে গঠিত হবে। অতএব, উল্লেখ করা হয় প্রকৃতই পাকিস্তানের জাতীয় সংসদকে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ভাঙায় সাংবিধানিক ফরমুলা তৈরি করা হয়।

৪) আওয়ামী লীগের নিকট উল্লেখ করা হয় যে জাতীয় সংসদের সদস্য কর্তৃক গৃহীতব্য শপথ তাদের খসড়ায় পরিবর্তন করা হয়। লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারে যার অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং অধিবেশন আহ্বান করা হবে, ১২ নং অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত শপথের উল্লেখ করা হয়ঃ-

আমি .... সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে) ঘোষণা করছি যে পাকিস্তানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব। আমি লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার ১৯৭০-এর বিধানাবলী এবং উক্ত আদেশে বর্ণিত সংসদের আইন অনুসারে এবং পাকিস্তানের কল্যাণ ও অগ্রগতির স্বার্থে সততার সাথে এবং আমার ক্ষমতাবলে দায়িত্ব পালন

করব।

আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৭(৫) নং অনুচ্ছেদে নিম্নোক্ত শপথের উল্লেখ করা হয়ঃ-

আমি................ সশ্রদ্ধচিত্তে শপথ (বা দৃঢ়ভাবে) ঘোষণা করছি যে, প্রণীত আইন অনুসারে পাকিস্তানের সংবিধানের প্রতি অকৃত্রিম বিশ্বাস ও আনুগত্য পোষণ করব।

৫) প্রেসিডেন্টের দল তাদের খসড়ায় বিধানের গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব নিয়ে আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনা করে যে অধিবেশনে পাকিস্তান ফেডারেশনের জন্য একটা সংবিধান প্রণয়ন করা হবে। স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় যে কনফেডারেশনের অর্থ হলো স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের ইউনিয়ন, যা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডারের সাথে আওয়ামী লীগের ৬ দফার বিরোধী; যার উভয়টিতেই বিশেষ করে উল্লেখ রয়েছে পাকিস্তান একটা ফেডারেল রিপাবলিক হবে।

৬) আওয়ামী লীগের খসড়া ১৭(৭)-এর অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে যে, 'প্রেসিডেন্টের নিকট সংবিধান বিল উপস্থাপন করা হলে প্রেসিডেন্ট তাতে স্বাক্ষর করবেন এবং প্রেসিডেন্টের নিকট উপস্থাপনের তারিখ হতে ৭ দিন পর যে-কোনো ক্ষেত্রেই সংবিধান বিল স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে গণ্য করা হবে। আওয়ামী লীগের নিকট উল্লেখ করা হয় যে এই বিধান লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশের পরিপন্থী এবং লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক আদেশের বর্ণিত ৫টি মৌলিক সাংবিধানিক নীতির বিরুদ্ধে সংবিধানের পথ সৃষ্টি করবে।

আওয়ামী লীগের খসড়ার আর্থিক ও অর্থনৈতিক দিক নিয়েও আলোচনা হয়। আলোচিত প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিম্নরূপ:

১) আওয়ামী লীগের খসড়ায় পূর্ব পাকিস্তান ১২টি দফার সাথে ১৯৬২ সংবিধানের তৃতীয় তফশিলের ৪৯টি দফার পরিবর্তন করা হয়। এতে নির্দেশ দেয়া হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঐ ১২টি দফা নিয়ে কেন্দ্রের বিষয় গঠিত হবে এবং অন্যান্যগুলো প্রদেশের বিষয় হবে।

২) তৃতীয় তফশিলের ১২টি দফার বিষয়ে আওয়ামী লীগ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব দেয়। এভাবে আওয়ামী লীগের খসড়ায় তৃতীয় তফশিলে প্রথম দফায় শুধু পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার উল্লেখ করা হয়। ১৯৬২ সংবিধানে এই দফা ৫টি উপ-দফা নিয়ে গঠিত এবং উল্লেখ করা হয় যে, এতে প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট শিল্প, অস্ত্র তৈরি, সেনানিবাস এলাকার অধিক্ষেত্র ইত্যাদিসহ মিলিটারি-নৌ এবং বিমান বাহিনীর বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

৩) পররাষ্ট্র বিষয়ে আওয়ামী লীগের ফরমুলা ছিলঃ- বৈদেশিক বাণিজ্য ও সাহায্য বাদে পররাষ্ট্র বিষয়। আবারও এখানে আওয়ামী লীগের খসড়ায় ১৯৬২ সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত ৭টি উপ-দফা বাদ দেয়া হয়।

৪) উল্লেখ করা হয় যে, আওয়ামী লীগ পররাষ্ট্র থেকে সব বিষয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য ও অনুদান বাদ দিয়ে ব্যাপকভাবে বর্ণিত আওয়ামী লীগের অবস্থান থেকে পিছনে সরে আসে।

আওয়ামী লীগ বিদেশে পৃথক বাণিজ্য প্রতিনিধি নিয়োগের প্রস্তাব পেশ করে। আওয়ামী লীগের খসড়ার ১৪ (১) নং অনুচ্ছেদে যা কেন্দ্রীয় বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, নিম্নোক্ত বিষয়সহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

১) কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী চালনা কমিশন বা কেন্দ্রে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সার্ভিস এবং পদের উল্লেখ নেই।

২) জাতীয় শুমারী পরিচালনার জন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ নেই। (এক ব্যক্তি এক ভোটের পরিপ্রেক্ষিতে এটা গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি)।

৩) আন্তঃ অঞ্চল পরিবহন এবং আন্তঃ অঞ্চল ও আন্তর্জাতিক ডাক সার্ভিস উল্লেখ করা হয়নি। এই বিষয়গুলোর উপর আওয়ামী লীগ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে অনীহা প্রকাশ করে।

করারোপ বিষয়ে আওয়ামী লীগ খসড়ায় কেন্দ্র কর্তৃক করারোপের বিধান উল্লেখ নেই। আওয়ামী লীগ আরো ২টি বিধান খসড়া অন্তর্ভুক্ত হবে।

১) ধারণা করা হয় যে, ১৯৭০-৭১ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কেন্দ্র কর্তৃক প্রদত্ত অংকের কম প্রাদেশিক সম্পদের পুরো ঘাটতি পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্র কর্তৃক কর সংগ্রহ না করা সত্ত্বেও কেন্দ্র কর্তৃক পূরণ করা হবে।

২) নির্দেশ থাকে যে কেন্দ্রকে প্রদেশের একটা নির্দিষ্ট হারে অর্থ প্রদান নীতিও গ্রহণযোগ্য হবে না, যদি অন্তর্বর্তীকালীন সময় ১৯৭১, ৩০ জুনের বেশি সময় স্থায়ী হয়।

প্রেসিডেন্টের দল উল্লেখ করে যে, স্বীকৃত ফেডারেল প্যাটার্ন এই ছিল যে, তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু কর আরোপ করার ক্ষমতা কেন্দ্রের থাকবে।

আওয়ামী লীগের খসড়ায় যে প্রাদেশিক বিধান সভার নিয়ন্ত্রণে পূর্ব পাকিস্তানের

জন্য পৃথক স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের উল্লেখ করা হয়। ফেডারেল স্টেট ব্যাংকের নিকট শুধু নিম্নোক্ত কার্যাবলো ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়।

১) রূপীর বিনিময় হার নির্ধারণের সুপারিশ।

২) স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের অনুরোধে মুদ্রা ছাপানো।

৩) টাকশাল ও সিকিউরিটি প্রেস ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করা।

৪) আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে কার্য সম্পাদন করা। তবে শর্ত থাকে যে উক্ত কার্যাবলী স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের নির্দেশনা অনুসারে সম্পাদন করতে হবে।

আওয়ামী লীগের অনুচ্ছেদ ১৭(১১) এর সাথে গঠিত অনুচ্ছেদ ১৬ কেবলমাত্র ২ সপ্তাহ ৯ এপ্রিলের মধ্যে স্টেট ব্যাংক অব ইস্ট পাকিস্তানের স্থাপনের কথা বলা হয়।

আওয়ামী লীগ এই প্রস্তাব পরিবর্তন করার আগ্রহী ছিল না।

আওয়ামী লীগের ঘোষণাপত্রে তাদের তফশিলের মাধ্যমে ১৯৬২ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪, যথা: অনুচ্ছেদ ৯৯, ১০৩, ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২ ও ১৩১-এর ধারা ২ বাদ দেয়া হয়। ১৯৬২ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৭, ৬৮, ৭০, ৮০, ৮১, ৮৪, ১৯২-এর সংশোধন করা হয় এবং ফেডারেল কর্তৃপক্ষকে দুর্বল করার উহাতে নতুন অনুচ্ছেদ ৯০ এ ৯০ এফ সংযোজন করা হয়।

অনুচ্ছেদ ১৩১-এর ধারা ২-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয় যে, কেন্দ্রীয় বিধান সভায় নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে প্রাদেশিক বিষয়ে আইন প্রণয়ন করবে।

ক) পাকিস্তানের অর্থনেতিক ও আর্থিক অস্তিত্বসহ পাকিস্তানের নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হলে-

খ) পরিকল্পনার ও সমন্বয়তার জন্য।

গ) পাকিস্তানের বিভিন্ন অংশে যে-কোনো বিষয়ে সমতা অর্জনের জন্য।

উপরোল্লিখিত (ক)-এর ব্যাপারে আওয়ামী লীগ তাদের অবস্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকৃতি জানায়।

প্রেসিডেন্টের দল উল্লেখ করে যে একটা অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের উদ্দেশ্য মেটাবার জন্য ঘোষণাটি তৈরি করা হয়। সেহেতু আওয়ামী লীগের সব দাবি অন্তর্ভুক্ত করার দরকার নেই। জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ বললেন যে সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে এবং ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ঘোষণাপত্র বের করতে হবে। তিনি আরো বললেন, এই মেয়াদ শেষে ঘোষণাপত্রে খুব দেরি হয়ে যাবে। তাকে বলা হয় যে

অন্যান্য দলের অংশের সংসদীয় দলগুলো আওয়ামী লীগের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করবে। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ২০ মার্চ, ১৯৭১ আওয়ামী লীগ নেতাদের বলেছেন যে সব দলের সমঝোতার প্রয়োজন আছে।

একই দিন খান আবদুল কাইয়ুম খান প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন। সন্ধ্যায় মি. দৌলতানা, সর্দার শওকত হায়াত, মুফতী মাহমুদ, খান আবদুল খান ওয়ালী খান এবং মাওলানা শাহ আহমেদ মুজিবকে বোঝাতে ব্যর্থ হওয়ার কথা তাকে জানালেন এবং বললেন যে তিনি (শেখ মুজিব) আওয়ামী লীগের স্কিমে কোনো পরিবর্তন আনতে রাজি নন।

দিনের বেলায় সশস্ত্র স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন এবং বলেন, "এ সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।"

২৪ মার্চ, ১৯৭১

মি. জেড. এ. ভুট্টো ঘোষণাপত্রের উপযুক্ততা ও বৈধতা আলোচনা করার জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করেন, যার মাধ্যমে সামরিক শাসন আইন প্রত্যাহার করা হবে এবং জেনারেল এ. এম. ইয়াহিয়া খানের উপর প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ন্যস্ত করা হবে।

আওয়ামী লীগের লোকদের সাথে বিকেল ৬.০০ টার সময় প্রেসিডেন্টের দলের আরো একটা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার পর খবরের কাগজে একটা বিবৃতিতে মি. তাজউদ্দীন আহমেদ বললেন, "তাদের পক্ষে যতটুকু সম্ভব তারা সভায় তাদের যাবতীয় মুখ্য বিষয় পেশ করেছেন।" (দি পিপল, ঢাকা, ২৫ মার্চ, ১৯৭১)।

২৫ মার্চ ১৯৭১

আওয়ামী লীগ প্রকাশ্যে ঘোষণা দিল যে, তারা আর কোনো বৈঠকের জন্য আগ্রহী নয়। তাদের পেশ করা খসড়া ঘোষণাপত্র থেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্র বা পাকিস্তান ফেডারেশনের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থায় তারা আগ্রহী নয়। খসড়া ঘোষণাপত্র বরং ফেডারেশনের চেয়ে কনফেডারেশন সৃষ্টি করে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বিলোপ করবে এবং সমান্তরাল সরকারকে ক্ষমতা প্রদান করবে, যা তিনি ১ মার্চ থেকে পূর্ব পাকিস্তানে প্রয়োগ করে আসছেন এবং কোনো আইনগত বৈধতা ছাড়া ঘোষণা জারির মাধ্যমে একটা সাংবিধানিক শূন্যতা সৃষ্টি করবে।

এগুলো শব্দে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অবস্থার বর্ণনা দেয়া হয় "এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে সমঝোতায় আসা শেখ মুজিব ও তার উপদেষ্টাদের কোনো অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু কোনোভাবে আমার নিকট একটা ঘোষণা আদায়ে সচেষ্ট ছিল, যা কার্যত জাতীয় সংসদকে ২টি পৃথক constituent সংসদে বিভক্ত করবে। ফেডারেশন বাদ দিয়ে কনফেডারেশন তৈরি করা তাদের অভিপ্রায় ছিল এবং সামরিক শাসনের ক্ষমতা অপসারণের মাধ্যমে দেশে পুরোপুরি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা তাদের ইচ্ছা ছিল। বলা যায়, এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তারা পৃথক বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার প্রত্যাশা করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে জাতির পিতা হিসাবে সৃষ্টি করে পাকিস্তানের বিলুপ্তি ঘটতো।

ইতোমধ্যেই ২৬ মার্চের সকালে সশসস্ত্র বিদ্রোহের কথা আওয়ামী লীগের পরিকল্পনায় পরিলক্ষিত হয়।

ইয়াহিয়া খান

হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে দেয়া বিবৃতি

জাতীয় সংসদ অধিবেশনের কর্মসূচি নির্ধারণের জন্য আমি ইতোমধ্যেই সব নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতার ১০ মার্চ ঢাকায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আহ্বান জানালাম। আমার যতদূর মনে পড়ে, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ছাড়া অন্য সব নেতা সেই বৈঠকে অংশগ্রহণে অসম্মতি জানালেন। উপায়ন্তর না দেখে আমি পুনরায়' ৭১ সালের ২৫ মার্চ সংসদ অধিবেশনের দিন ধার্য করলাম।

আওয়ামী লীগের সাথে আলোচনার জন্য ২৫ মার্চ তারিখের জাতীয় সংসদ অধিবেশনের ১০ দিন পূর্বে ১৪ অথবা ১৫ মার্চ আমি ঢাকা পৌঁছি। বলার অপেক্ষা রাখে না যে আমি পৌঁছে ঢাকাকে কালো পতাকার শহর হিসাবে দেখলাম ও কোথাও কোথাও বাংলাদেশের পতাকাও ছিল। সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আওয়ামী লীগ হাইকমান্ড থেকে বিভিন্ন সংস্থাকে আদেশ ও নির্দেশাবলী দেয়া হচ্ছিল। এই নির্দেশাবলীর অধিকাংশই ছিল নেতিবাচক। কর কিংবা জমির খাজনা দেবে না। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, মিল-কারখানায় কাজ বন্ধ করে দিল। অন্য কথায় সম্পূর্ণ অসহযোগ চলছিল। জনজীবন অচল হয়ে গিয়েছিল। যা জোরেশোরে চলছিল (পরবর্তীতে এটা জানা গিয়েছিল) তা ছিল অবাঙালি ও ভিন্নমতাবলম্বীদের হত্যা, জ্বালিয়ে দেয়া, ধর্ষণ, লুট এবং বর্বরোচিত নিষ্ঠুরতা যা পরবর্তী সপ্তাহ ও সময়গুলোতে প্রকাশ পেয়েছিল।

সৈন্যরা ছাউনীতে ছিল এবং আওয়ামী লীগের হাই কমান্ড তাদের অসামরিক সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছিল। সৈন্যরা তাদের শুধুমাত্র রেশন নিয়ে চলছিল। সৈন্যদের প্রতি গালাগাল এমন নোংরা ছিল যে, কোনো বিদেশী শত্রু জাতিও এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করে না, যেমন "পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা কুত্তারা ফিরে যাও", 'ইয়াহিয়ার কুত্তারা ফিরে যাও', '১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পরাজিত কুত্তারা আমরা তোদের বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করবো'। এই সবকিছুই প্রকাশ্যে বাংলা সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হচ্ছিল। সবচাইতে জঘন্য ছিল স্বয়ং শেখ মুজিব নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র "জনতায়"। আমাদের সৈন্যরা যারা এসব সহ্য করে যাচ্ছিল, তাদের

শৃংখলতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু আমাদের সেনাবাহিনী চরম ধৈর্য ও শৃঙ্খলার পরিচয় দিয়েছিল।

আমি তৎক্ষণাৎ শেখ মুজিব এবং তাঁর উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা শুরু করলাম। শেখ মুজিব আমাকে উগ্র মেজাজেই জানিয়ে দিলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে পূর্বের ভিত্তিতে আর থাকতে চান না। আমাকে অবশ্যই তাঁর চার দফা মানতে হবে এবং জাতীয় সংসদের দুটি পৃথক অধিবেশন ডাকতে হবে, একটি পূর্ব পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের দ্বারা হবে এবং অন্যটি হবে পশ্চিম পাকিস্তানের সংসদ সদস্যদের দ্বারা। দুটি সংসদ তাদের নিজস্ব শাসনতন্ত্র রচনা করার পর একটি যৌথ সংসদে বসে দেখতে পারে যে একত্রে থাকার কোনো যৌক্তিকতা আছে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি। সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে বিস্তারিত আছে। তাঁর সাথে কয়েক দিনব্যাপী দীর্ঘ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে তার দাবির অগ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করে বুঝলাম, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত জাতীয় সংসদের সংসদীয় নেতাদের ঢাকায় আসার জন্য বার্তা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলাম। যাঁরা আসলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন মি. ভুট্টো ও তাঁর উপদেষ্টাগণ, খান ওয়ালী খান, মি. দৌলতানা, মুফতী মাহমুদ, খান কাইউম, সরদার সাখাওয়াহ হায়াৎ, মি. বেজেনজো ও আরও কয়েকজন।

আমি সব বিষয় তাঁদের সামনে তুলে ধরলাম এবং সত্যতা যাচাই করার জন্য তাদের শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে বললাম। তারা সকলে পৃথকভাবে ও সম্মিলিতভাবে দেখা করলেন। শেখ মুজিবের দাবি তাদের কাছে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য এবং এর অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাওয়া। আমি তাদের উপদেশ চাইলাম যে, আমার কি করা উচিত। তাদের কোনো উপদেশ ছিল না, বলল: আমরা আপনার উপর ছেড়ে দিলাম, একমাত্র মি. ভুট্টো যিনি আমাকে সরকারের নিয়ন্ত্রণের পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরামর্শ দিলেন। এইভাবে পাকিস্তানকে ভেঙে যেতে দেয়া যায় না। আমি তখন আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমার সামরিক অফিসারদের সাথে যেমন জেনারেল হামিদ, জেনারেল টিক্কা খান এবং আমার সাথে ঢাকায় উপস্থিত ছিলেন এমন অন্যান্য জেনারেল যেমন পীরজাদা, উমার ও ফরমান আলী, খাদিম রাজা এদের সাথে আলোচনা করলাম। আমরা আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সরকারের নিয়ন্ত্রণ বলবৎ করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করলাম।

২৫ মার্চ রাতে সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সেনাছাউনির বাইরে গিয়ে তাদের কাজ শুরু করলেন। আমি সম্ভাব্য কম শক্তি প্রয়োগ করতে এবং শেখ মুজিবসহ সকল বিদ্রোহী নেতাকে গ্রেফতারের নির্দেশ দিলাম। আমি

বিশেষভাবে বললাম শেখ মুজিব এবং অন্যান্য নেতার প্রতি যেন শারীরিক নির্যাতন না করা হয়। শেখ মুজিব এবং ডক্টর কামাল হোসেন ছাড়া সকল নেতা পালিয়ে গিয়ে কলকাতার আশ্রয় নিলেন।

(হামিদুর রহমান কমিশনের কাছে দেয়া জেনারেল (অবঃ) ইয়াহিয়া খানের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত)।

লাহোর হাইকোর্টে দেয়া বিবৃতি

পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে মি. ভুট্টো ছাড়া সকলেই আসলেন। মি. ভুট্টোর নিকট তার বার্তা পাঠালেন যে, মুজিবের সাথে তাঁর আলোচনা হয়েছে এবং সাক্ষী মনে করেন মি. ভুট্টো খুশি হবেন। ঢাকা আসার পূর্বে মি. ভুট্টো লন্ডন পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেছিলেন যে মি. ভুট্টো যদি এইরূপ আচরণ করেন তবে তাঁর সাথে তার আলোচনা সম্ভব নয়। মি. ভুট্টো ৫/৬ জন দাঁড়িওয়ালা সিন্ধী পাহারাদার নিয়ে ঢাকায় পৌছলেন যারা (পাহারাদার) তাদের স্টেনগানের ট্রিগারে হাত রাখা অবস্থায় ছিল। পরিস্থিতি সহজ করার পরিবর্তে তিনি এইরূপ আচরণ করেছিলেন। বাঙালিরা অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জাতি এই সবকিছু পরিস্থিতি খাড়া করল। মি. ভুট্টো বিমানবন্দর থেকে সরাসরি হোটেলে গিয়ে উঠলেন।

যেমন আগে বলা হয়েছে, সাক্ষী মি. ভুট্টোকে ঢাকা ত্রিপক্ষীয় আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাতে অস্বীকৃতি জানান। তারপর একটি টেলিগ্রাম বার্তায় তিনি অংশগ্রহণের সম্মতি জানালেন। ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার পূর্বমুহূর্তে তিনি (মি: ভুট্টো) কাদা ছোঁড়াছুঁড়িতে লিপ্ত হলেন যার ফলে মুজিব উত্তেজিত হলেন এবং তা সাক্ষীর গোচরে নিয়ে আসলেন। তিনি যখন সাক্ষীর সাথে দেখা করেন তখন তাঁর সাথে তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন। মুজিব তুলে ধরলেন সাক্ষীর ইচ্ছা অনুযায়ী আলোচনায় অংশগ্রহণে মি. ভুট্টোর সদিচ্ছা নেই। কারণ, তিনি কুমতলব নিয়ে লন্ডন পরিকল্পনার ত্রুটিগুলো তুলে ধরছেন। ফলে অংশগ্রহণকারীদের পক্ষে একটি সাধারণ গ্রহণযোগ্য সমাধান বের করা সম্ভব হবে না।

ঢাকায় পৌছে মি. ভুট্টো মুজিবকে জিজ্ঞেস করলেন সরকারে তাঁর কি অংশ থাকবে। উত্তরে মুজিব বললেন তাঁর সরকারে মি. ভুট্টোর বিন্দুপরিমাণ অংশ থাকবে না। তা ছাড়া মি. ভুট্টো যখন লন্ডন পরিকল্পনার উদ্ধৃতি দিলেন তখন তার সমর্থন মিললো না। বাঙালি "খুনী ভুট্টো ফিরে যাও" লিখা প্লাকার্ড বহন করছিল। তারা ভুট্টোর বিরুদ্ধে শ্লোগানও দিচ্ছিল।

পূর্ব পাকিস্তানে সেনা কার্যক্রমের ব্যাপারে সাক্ষীকে কোনো ব্যক্তি প্রস্তাব দেননি সাক্ষী সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন এবং বিদ্রোহীদের দমন করা

সেনাবাহিনীর দায়িত্ব ছিল। সাক্ষী বিদ্রোহ দমনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। মি. ওয়ালী খান, বেজেনজো, দৌলতানা, মুফতী মাহমুদ, আবদুল কাইউম প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন তাঁরা তাঁদের সাধ্যমতো চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পরিস্থিতির উন্নতি হচ্ছিল না। সাক্ষী তখন বলেছিলেন তাঁর তখন কি করা উচিত। তাঁরা সবাই বলেছিলেন যে এটা সাক্ষীর নিজের সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত। পাকিস্তানি পতাকাও পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। সাক্ষী এসব ঘটনাবলির পর দুষ্কৃতকারীদের শায়েস্তা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এটা ছিল সাধারণভাবে একটি বিদ্রোহ।

সাক্ষী পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে বৈঠক করেছিলেন যেখানে মি. ভুট্টো যোগদান করেননি। তিনি বলেছিলেন তিনি অকর্মণ্য লোকদের সাথে বসবেন না এবং সাক্ষীর সাথে তিনি একা দেখা করবেন। যখন পরিস্থিতির উন্নতি হলো না তখন পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা সাক্ষীকে তাদের প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন।

ঢাকায় মি. ভুট্টো ও মি. মুজিবের সাথে সাক্ষীর উপস্থিতিতে সাক্ষাতে উভয় নেতা সাক্ষীর কাছাকাছি বসেছিলেন কিন্তু তাঁরা কথা বলেননি। সাক্ষী তাঁদেরকে নববধূর ন্যায় আচরণ না করে নিজেদের মধ্যে আলাপ করতে বললেন। সাক্ষী ভুট্টো ও মুজিবের হাত ধরে বলেছিলেন তাঁরা বন্ধু এবং তাঁদের আলাপ করা উচিত। মুজিব এবং ভুট্টো আলাদাভাবেও আলোচনা করেছিলেন।

মুজিব সাক্ষীর সাথে প্রেসিডেন্ট ভবনে ছিলেন। যখন মি. ভুট্টো আসেন তখন তিনি সামরিক সচিব মি. ইসহাকের রুমে ছিলেন। যখন মুজিব বের হয়ে আসেন তখন ভুট্টো তাঁকে অনুসরণ করেন এবং তাঁরা বারান্দায় আলাপ করেন। আলাপের পর সাক্ষী যখন আলাপের ব্যাপারে মি. ভুট্টোকে জিজ্ঞেস করেন তখন তিনি উত্তর দেন যে মুজিব তাঁকে বলেছেন যে সেনাবাহিনীর লোকজন ভয়ঙ্কর। তারা প্রথমে তাকে (মুজিবকে) শেষ করবে, তারপর মি. ভুট্টোকে। সুতরাং তারা আক্রমণের পূর্বে তাদেরকে আক্রমণ করা উচিত।

মুজিবুর রহমানের গ্রেফতারের পর সাক্ষী করাচিতে ফিরে আসেন। সাক্ষী যখন জানতে পারেন যে, মুজিবকে জীবিত বা মৃত আনার জন্য টিক্কা খান নির্দেশ প্রদান করেছেন তখন তিনি তা নাকচ করে দিয়ে মুজিবকে জীবিত গ্রেফতার করার জন্য নতুন নির্দেশ জারি করেন। মি. ভুট্টো সেনা আক্রমণ সমর্থন করেন এবং মুজিবের গ্রেফতারে উল্লসিত হন।

(লাহোর হাইকোর্টে দেয়া জেনারেল (অবঃ) ইয়াহিয়া খানের শপথপত্র থেকে উদ্ধৃত)।

খান আবদুল ওয়ালী খান

JP: আপনি কি এই উক্তির সাথে একমত যে ইয়াহিয়া খান এই আশা নিয়ে সাধারণ নির্বাচন দিয়েছিলেন যে, অনেক রাজনৈতিক দল মিলে জাতীয় সংসদ গঠন করবেন। তারা পরস্পরের সাথে একমত হতে না পারার ফলে তার ক্ষমতায় টিকে থাকার সুযোগ হবে। এভাবে তিনি বিশ্ববাসীকে দেখাতে পারবেন যে রাজনৈতিক নেতারা সরকার গঠনের জন্য যোগ্য নয়?

ওয়ালী খান : এটা খুবই সম্ভব। লন্ডনে আমি যেখানে চোখের চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম, সেখানে আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট থেকে একটা সংবাদ পেলাম যে, আমি যেন অতি সত্বর তার কাছে পৌছাই। আমাকে ৯ মার্চের পূর্বে পৌছাতে বলা হয়েছিল। ৮ তারিখে তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, আমি যদি যেতে না চাই তবে না যেতে পারি। কারণ, বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। ব্রিটিশ সংবাদ মাধ্যমে আমাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপারে অনেক গুরুতর সংবাদ আসতে থাকল এবং এটা মনে হতে লাগল যে, আমরা একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দিকে এগুচ্ছি।

৭ তারিখের মধ্যে পরিস্থিতি এতই মারাত্মক হলো যে তারা শিরোনাম সংবাদ ছাপালো যে "পাকিস্তান ধ্বংসের কাছাকাছি"। স্বাভাবিক সময়ে আপনি যদি ইংল্যান্ডে যান এবং কয়েক মাস থাকেন তবে ব্রিটিশ সংবাদপত্রে পাকিস্তান সম্বন্ধে অতি অল্প সংবাদ পাবেন কিন্তু বর্তমানে নতুন নতুন সংবাদ প্রতিদিন টেলিগ্রাফ, টাইম্স, গার্ডিয়ান এবং ডেইলী এক্সপ্রেসে বেরুচ্ছিল। আমি অনুমান করলাম পরিস্থিতি মারাত্মক ছিল। সুতরাং আমি বিমানযোগে ঢাকা এসে পৌছলাম।

সদস্য নং ২ : আপনি কি মনে করতে পারেন কখন আপনি ঢাকা পৌছেছিলেন?

ওয়ালী খান : লাহোরে আমার অবস্থান করা দরকার ছিল কিন্তু আমি ১৩ তারিখ ঢাকা পৌছলাম। যখন আমি যাচ্ছিলাম তখন আমি পিন্ডিতে শুনলাম যে, প্রেসিডেন্ট ঢাকার পথে করাচি আছেন কিন্তু শেখ মুজিবের নিকট থেকে তিনি কোনো নিশ্চয়তা পাননি যে, তিনি তাঁর সাথে আলাপ করবেন। ঢাকা পৌছে আমি

শেখ মুজিবকে আলোচনায় অংশগ্রহণে রাজি করানোর জন্য উদ্যোগ নিলাম।

আমি ১৪ তারিখ শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে তাঁকে বললাম, যদিও পূর্ববর্তী নির্বাচনে আমরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করেছি তবুও কেন্দ্রে আমি তাঁকে বৃহত্তম দলের নেতা হিসাবে গ্রহণ করতে রাজি। আমি তাঁকে বললাম, রাজনীতিবিদ হিসাবে গণতন্ত্রের জন্য আমরা একযোগে কাজ করেছি। আমি তাঁকে বললাম তিনি কোন্ অবস্থানে আছেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করলাম, "আপনি এক পাকিস্তান না দুই পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন।" উত্তরে তিনি বললেন তিনি 'মুসলিম লীগের লোক' ছিলেন। তিনি আমার দিকে মিটমিট করে তাকিয়ে বললেন, "আপনি কিছু পরিমাণে পাকিস্তান সৃষ্টির বিরোধিতা করেছিলেন। এখন আপনি আমাকে প্রশ্ন করতে এসেছেন আমি তাতে বিশ্বাস করি কিনা? আপনি পাকিস্তানের একজন অনধিকার প্রবেশকারী। এখন আমি এটাকে ধ্বংস করছি এবং আপনি তাকে রক্ষা করার চেষ্টা করছেন।"

আমি তাঁকে পশতু প্রবাদ শোনালাম 'গিঁট খোলার জন্য দাঁত দিয়ে চেষ্টার পূর্বে একজনের হাত দিয়ে চেষ্টা করা উচিত।' আমি তাঁকে বললাম যে আমাদের প্রথমেই দাঁত ব্যবহার করা উচিত নয়। তিনি বললেন, "ইয়াহিয়া, ভুট্টো ও কাইউম এর সাথে আছে"? আমি বললাম, "হ্যাঁ!" তিনি বললেন, "না, তিনি শুধুমাত্র আমাকে ব্যস্ত রাখবেন এবং এই ফাঁকে আক্রমণের জন্য এখানে সৈন্য সমাবেশ করবেন।" আমি বললাম, আমাদের আলোচনা শুরু করা উচিত। যাহোক, আমি আমার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলাম এবং অবশেষে এই শর্তে তিনি তাঁর সাথে সাক্ষাতে রাজি হলেন আমি যেন ঢাকায় অবস্থান করি। আমি কথা দিলাম যে প্রয়োজন হলে আমি ঢাকায় ছয় মাস থাকবো এবং তাঁকে বললাম পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত কেননা আমরা হানাহানিকে প্রশ্রয় দিতে পারি না। আমরা যখন বেরিয়ে আসলাম তখন সেখানে প্রচুর সাংবাদিক ছিলেন যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বিদেশী। তাঁদের প্রথম প্রশ্ন ছিল আমি কোনো সংবাদ এনেছি কিনা। আমি বললাম, "না"। তাঁরা বললেন, "আপনাকে ডাকা হয়েছিল কেন?" আমাকে সম্মেলনে, জন্য ডাকা হয়েছিল এবং ভাবী প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার জন্য এসেছিলাম। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, আমি শেখ মুজিবের নিকট থেকে কোনো বার্তা নিয়ে এসেছি কিনা। আমি বললাম যে আলোচনার জন্য আমরা সবেমাত্র এসেছি এবং মধ্যস্থতাকারীর ধারণা আমি নাকচ করলাম। আমি তাঁদেরকে ইশারা করলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করলেন তিনি প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করবেন কিনা। তিনি বললেন, প্রেসিডেন্ট যদি ঢাকায় আসেন তবে তিনি তার সাথে দেখা করবেন।

আমার মনে হয় পরের দিন ইয়াহিয়া খান ঢাকায় পৌঁছান এবং তাঁর সাথে ২/৪টি বৈঠক করেন। তারপর তিনি আমাকে ডেকে আমার সাথে বৈঠকে বাঙালিদের অনুভূতির ব্যাপারে জানতে চান। আমি বললাম যে তাদের অনুভূতি, মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত ফলে তারা একটা আক্রমণাত্মক রূপধারণ করেছে।

আমি প্রশ্ন রাখলাম যে, তিনি কেন জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করেছেন, যা তাঁর করা উচিত হয় নি। আমি ম্যানচেস্টারে জানতে পারলাম, যেখানে কিছু বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছিল, "এখন আপনার কিছু সময় আছে, আপনি কি আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসতে পারেন?" আমি বললাম "আপনারা কি বোঝাতে চাচ্ছেন?"

আমি বললাম, "না"। আমি তৎক্ষণাৎ দূতাবাসে ফোন করলাম এবং সংবাদটি নিশ্চিত করা হলো। আমি নিজে-নিজে বললাম যে এটা ছিল সমাপ্তির শুরু। প্রেসিডেন্ট বললেন, "আমার মনে হয় সেটা করা উচিত হয় নি।"

JP: তিনি কি তাই বলেছিলেন?

ওয়ালী খান: হ্যাঁ, তিনি তাই বলেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম যে কেন তিনি তা করেছিলেন। আমি এটাও তাঁকে বলেছিলাম, আমাদের দেখতে দেন যে তিনি কিভাবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনবেন। তখন তিনি বললেন, শেখ মুজিব দুটি সংসদের কথা বলছেন। আমি বলেছিলাম, প্রেসিডেন্ট সাহেব, এটা আমার তথ্য নয়। আমি তাঁর সাথে দুইবার বৈঠক করেছি এবং তিনি কখনোই দুটি শাসনতান্ত্রিক সংসদের প্রশ্ন রাখেননি এবং কেন তিনি শাসনতান্ত্রিক সংসদ ভাঙতে চাইবেন যেখানে তাঁর নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে। আমি বললাম, মি. ভুট্টো শাসনতান্ত্রিক সংসদ ভেঙে দেয়ার কথা বলেছিলেন এবং আপনি যদি অনুমতি দেন তবে বলতে পারি আপনার নির্দেশেই পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংসদের অবলুপ্তির পর মি. ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনতান্ত্রিক সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবেন। এই কথা শুনে তিনি নিশ্চুপ রইলেন। আমি তাঁকে বললাম যে শেখ মুজিব একমাত্র ব্যক্তি যিনি পাকিস্তানকে অখণ্ড জাতি হিসাবে রাখতে পারেন, তাঁকেই তিনি দুর্বল করার চেষ্টা করছেন।

আমি বললাম যে মওলানা ভাসানী পরিচালিত বাম দল চরমপন্থিদের দ্বারা শেখ মুজিব চরম চাপের মুখে আছেন। আমার জানামতে গত আট বছরের মধ্যে এটা তাঁর প্রথম সভা ছিল যেখানে লোক সমাগত হয়েছিল। চট্টগ্রামে ভাসানীর দেয়া ভাষণের রেকর্ডকৃত টেপ আমি শুনেছি। তিনি বলেছেন বাঙালিরা চিন্তা ও উদ্দেশ্যে যে একতা প্রদর্শন করেছে তার জন্য ধন্যবাদ দেয়া উচিত। তিনি আরও বলেছেন, "কোনো গণতান্ত্রিক দেশের ইতিহাসে একটি দল এমন নিরঙ্কুশ

সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেনি। আমি এখন গর্বিত যে আমি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা নেতা। এমনকি সোহরাওয়ার্দীও এমন স্বচ্ছ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেতেন না। কিন্তু এখন আমাদের মাঝে এমন একজন নেতা আছে যিনি সোহরাওয়ার্দীর চাইতেও জনপ্রিয়।" আমি মওলানা ভাসানীর সাথে আট বছর কাজ করেছি বলে তাকে আমি জানি। আমি জানি ভাসানী শেখ মুজিবকে চরম ঘৃণা করেন কিন্তু তিনি কেন এসব বলছেন? এখন তিনি এমন একটা অবস্থানে পৌঁছে বলেছেন যে আমরা সব সময় সোহরাওয়ার্দী, শের-ই-বাংলা, নাজিমুদ্দিনের মতো নেতা তৈরি করেছি কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানিদের ষড়যন্ত্রের কারণে আমরা তাঁদের প্রতিষ্ঠা দিতে পারি নি। শেখ মুজিবও তার ব্যতিক্রম নন। একমাত্র বিষয় হচ্ছে কোনো মতেই এক টেবিলে পশ্চিম পাকিস্তানিদের সাথে আলোচনায় বসতে পারি না, তা না হলে সব শেষ হয়ে যাবে। মওলানা সাহেব বলেছেন তিনি মুসলিম লীগের লোক ছিলেন এবং ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের একজন অনুসারী ছিলেন এবং সে প্রস্তাবে দুটি স্বাধীন দেশের প্রস্তাব ছিল। সেখানে একক রাষ্ট্রের কোনো ধারণা ছিল না। যখন আমরা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কাছাকাছি হলাম তখন আমি তাঁর সাথে দেখা করলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, আমি যদি তাঁর সাথে থাকি তবে তিনি স্বাধীন পাখতুনিস্তানের দাবি তুলে ধরবেন।

আমি তাঁকে বললাম কিভাবে তিনি এ ধরনের কথা বলতে পারেন যখন এটা বলকানাইজেশনের যুগ নয়, এমনকি যখন ইউরোপ একটি সাধারণ বাজারের ভিত্তিতে চিন্তা করা শুরু করেছে। প্রেসিডেন্ট আমাকে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করতে বললেন। আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম যে ভাসানী শেখ মুজিবকে চরমপন্থির দিকে চাপ দিচ্ছেন এবং সেই মওলানাকে প্রদত্ত সরকারের দেয়া রূপরেখা অনুযায়ী তিনি পথ অবলম্বন করছেন। আমার কাছে এর প্রমাণ আছে। কারণ, যখন ধারণা করা হচ্ছিল যে ভাসানী ২৩ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন তখন আমরা বিষয়টি প্রেসিডেন্টের নজরে এনেছিলাম। আমাদের আশ্বস্ত করা হয়েছিল, মওলানা তা করবেন না। এবং ঠিক তাই ঘটেছিল। কারণ, সেদিন তিনি কৌশলে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং সেটা আর প্রকাশিত হয়নি।

আমি তাঁকে বললাম সংসদীয় শাসনতান্ত্রিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে তাঁর সাথে আমার কিছু দ্বিমত আছে। প্রাথমিকভাবে প্রেসিডেন্ট আমাকে বলেছিলেন যে, তিনি সার্বভৌম। আমি বললাম যে তিনি নিজেকে সার্বভৌম ক্ষমতা হিসাবে চিন্তা করেন, কারণ তার হাতে সামরিক আইনের বড় লাঠি আছে। আমি বললাম, আমি সার্বভৌম। কারণ, আমার পেছনে জনগণের সমর্থন আছে। আমি প্রেসিডেন্টের কাছে জানতে চাইলাম তিনি কেন এ ধরনের সার্বভৌমত্বের কথা ভাবছেন।

তিনি বললেন, তিনি এভাবে ভাবছেন, কারণ তিনি একজন সৈনিক। তিনি বললেন যে তিনি সরাসরি কথায় বিশ্বাসী। আমি তাঁকে সেই লোকের কথা স্মরণ করিয়ে দিলাম, যিনি তাঁর বন্ধুর কাছে কুকুর ধার করতে গিয়েছিলেন শস্য কাটার সময় পাহারা থাকার জন্য। বন্ধু বলেছিলেন কুকুরটা মারা গিয়েছে। তবে কুকুরটি বেঁচে থাকলেও তা তিনি তার বন্ধুকে দিতেন না।

জনাব প্রেসিডেন্ট, আপনি কি মনে করেন ঐ লোক যুক্তিযুক্ত ছিলেন শুধু এই কারণে যে তিনি একজন সৈনিক ছিলেন? তিনি অতি সহজেই ব্যাপারটার সমাপ্তি ঘটাতে পারতেন শুধুমাত্র এই বলে যে কুকুরটি মারা গিয়েছে। আমি বললাম আমি শুধু তখনই শেখ মুজিবের নিকট গিয়ে কথা বলবো যখন আপনি আমাকে কিছু নিশ্চয়তা দেবেন। এতে প্রেসিডেন্ট বললেন যখন জাতীয় সংসদ অধিবেশন শুরু হবে আমি তখন এর সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করব। তারপর আমি শেখ মুজিবের সাথে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। কিছু পরে ভুট্টো সাহেব একটা বক্তৃতা করে বললেন তিনটি দল আছে, পিপিপি, আওয়ামী লীগ এবং সেনাবাহিনী। এটাই প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনীকে রাজনৈতিক দলের প্রতিপক্ষ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। সুতরাং আমি অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম যে আমরা যদি এই বিষয়ে দূরে থাকি তবে সেটা উত্তম। প্রাথমিকভাবে আমি প্রেসিডেন্টের নিকট চাপ প্রয়োগ করেছিলাম এ বিষয়ে যে তাঁর উচিত অন্যান্য সব নেতাকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো। যদি সকলে একসঙ্গে বসতে পারেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদের আগমনের পর এবং তাদের সাথে আমার সাক্ষাতের পর সর্দার শওকত হায়াৎ, মুফতী মাহমুদ এবং শাহ্ আহমদ নুরানী আমাকে জানান যে পূর্ব পাকিস্তানে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য তাঁদের নির্দেশ দেয়া হয়।

JP: আপনারা কি সকলে মিলে ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠক করেছিলেন?

ওয়ালী খান : আমরা সকলে মিলে ২৩ তারিখ সন্ধ্যায় তাঁর সাথে দেখা করেছিলাম। তাঁর কথাগুলো আমার মনে পড়ছে। শেখ মুজিব আমাকে জানিয়েছিলেন যে ইয়াহিয়া খান তার প্রতি ভালো ভালো আচরণ কর ছিলেন শুধুমাত্র সৈনিকদের সেখানে সমবেত করার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজনে। তারপর আইনের জটিলতায় তারা হারিয়ে যান। উদাহরণস্বরূপ, যদি সামরিক আইন উঠিয়ে নেয়া হয় কিংবা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয় তবে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী কিভাবে চলবে?

প্রেসিডেন্ট কোথা থেকে তার ক্ষমতা অর্জন করবেন? সামরিক আইন উঠিয়ে নেয়ার পর প্রেসিডেন্টের অফিস থাকবে কিনা? কারণ প্রেসিডেন্টের যাবতীয় ক্ষমতার উৎস ছিল সামরিক আইন। এতে সর্দার শওকত হায়াৎ বললেন, মনে

হচ্ছে আমরা শুধু আইনের প্যাঁচে পড়ে এই দেশটাকে ভাঙবো। যাহোক, আমরা জাতীয় সংসদের বিভক্তির বিরোধিতা করলাম। আমি শেখ মুজিবের নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলাম, কেন তিনি এমনটি করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন বাধ্য হয়ে তিনি তা করছেন। কারণ, জাতীয় সংসদ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে না। ফলে তাঁর কাছে একমাত্র বিকল্প পথ খোলা আছে, তা হলো জাতীয় সংসদের বিভক্তিতে সম্মত হওয়া। কিন্তু আমি বললাম যে, তাঁর সুনির্দিষ্টভাবে কোনো সমঝোতায় পৌছানো উচিত। যখন আমি কথা বলছিলাম তখন তিনি তাঁর আলমারী থেকে তাঁকে লিখা ইয়াহিয়া খানের একটি চিঠি বের করে আনলেন। সেই চিঠিতে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবকে অযৌক্তিক কোনো কিছু বলা থেকে বিরত থাকতে এবং তাঁর ঢাকা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলেছিলেন। এই চিঠির অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল, "আমি আপনাকে ছয় দফার অনেক বেশি দিতে ইচ্ছুক।"

এই প্রস্তাবে আমি ১০/১২ জন বিদেশী সাংবাদিক শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের প্রতিক্রিয়া অনুমান ও প্রকাশ করার জন্য পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা এর উপর মন্তব্য করেননি। তারপর আমি তাঁদের অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞ রেহমান সোবহানের কাছে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে ভুট্টো সাহেবের এই প্রস্তাবের উপর তিনি কেন মন্তব্য করছেন না? অট্টহাসি হেসে তিনি বললেন সে প্রস্তাবে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে কেন। কারণ, ছয় দফায় তাঁরা কেবলমাত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছিলেন সেখানে মি. ভুট্টোর প্রস্তাব তাঁদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিচ্ছে। তাঁর সোজা উত্তর ছিল যে, তাঁরা সেটা সন্তুষ্ট হয়ে গ্রহণ করবেন। কারণ, সে প্রস্তাব এসেছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে।

সদস্য নং-২: সম্ভবত তিনি চিন্তা করেছিলেন পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী আরও একটি অভ্যুত্থান ঘটাবে?

ওয়ালী খান : এটা একটা প্রস্তাব হতে পারে। একসময় তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের ব্যাপারে আলাপ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীতে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। আমরা ব্যাপকতায় যাইনি, কারণ সামগ্রিক বিষয়টি মোটের উপর এই বিষয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, ইয়াহিয়া খান কোনো মতেই শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছুক ছিল না। যদি না তিনি তাঁর মন্ত্রিসভায় ভুট্টোকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এতে শেখ মুজিব বলেছিলেন যে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে এবং প্রত্যেক গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান যদি মনে করেন তাঁর মন্ত্রিসভায় ভুট্টোকে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত তাহলে সেটা হবে দুই দলের মধ্যে জোট সরকার এবং তার জন্য মি. ভুট্টোর আসা উচিত এবং শর্তসমূহ নির্ধারণ করা উচিত।

তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন এমনটি কি কখনও ঘটেছে যে, ব্রিটিশ রাজা মি. হিথকে তাঁর মন্ত্রিসভায় মি. উইলসনকে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন? রাজনৈতিক কলহের ফলে শেষে শেখ মুজিব বললেন, ঠিক আছে আমরা প্রদেশগুলোতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব এবং প্রেসিডেন্টের নিকট কেন্দ্র ছেড়ে দিব এবং ইয়াহিয়া খানের উচিত ঐ কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেয়া। এটা মি. ভুট্টোকে সজাগ করে দিল। কারণ, তিনি সেই ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রস্তাবের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে একটি এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি সংসদ অধিবেশন বসার বিষয়টি ঘুরপাক খেতে থাকল। তারা তাদের নিজ-নিজ শাসনতান্ত্রিক খসড়া তৈরির পর তাদের যৌথ অধিবেশনে বসার কথা ছিল। যেখানে তারা সিদ্ধান্ত নিত যে, কোন্ কোন্ বিষয় কেন্দ্রের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত। আমি বলেছিলাম আমি জাতীয় সংসদ এবং NWFP প্রাদেশিক সংসদ উভয়েরই সদস্য এবং যখনই তাদের অধিবেশন বসুক আমি স্বেচ্ছায় পশ্চিম পাকিস্তানি বৈঠকে অংশগ্রহণ করব না। আমি মি. ভুট্টোকে বলেছিলাম যখন তিনি বলেন যে কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও এর সংখ্যাগরিষ্ঠতা পূর্ব পাকিস্তানেই সীমাবদ্ধ। তখন সেটা পাকিস্তানের ঐক্য ও অখণ্ডতায় আঘাতের শামিল। আমি বলেছিলাম, আমরা যখন এ ধরনের কথা বলি তখন আমরা এক পাকিস্তানের কথা বলি না বরং পাঁচ প্রদেশের কথা বলি।

আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যাপারেও একই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হতাম। আমি প্রেসিডেন্টকে বললাম যেহেতু পাকিস্তানে এ ধরনের সংসদের অস্তিত্ব নেই সেহেতু আমি পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদান করব না।

JP: বিষয়টা কি এ রকম নয় যে, ইয়াহিয়া খানের সকল পরিকল্পনা যখন হাওয়ায় মিশে গেল, তখন তিনি এক দলকে অন্য দলের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিলেন? যেহেতু তিনি মুজিবকে সেখানে এবং ভুট্টোকে এখানে ব্যবহার করছেন সেহেতু তিনি আন্তরিক নন।

ওয়ালী খান : আমি মুজিবের ব্যাপারে এত নিশ্চয়তা দিয়ে বলতে পারব না। তবে ভুট্টোর ব্যাপারে আমি সুনিশ্চিত।

JP: তিনি কি এভাবে দেখছিলেন না, যদি পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যায়, সেনাবাহিনী তখনও অনির্দিষ্টকালের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কারণ এটা একটা একক এলাকা?

JP: আমি জানি না, আপনি কখনও ভেবে দেখেছেন কিনা যে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আপনাকে সঠিক চিত্র দেবেন না। কিভাবে মুজিবের সাথে কিংবা অন্য

নেতাদের সাথে তাঁর আলোচনা এগিয়ে যাচ্ছে?

ওয়ালী খান : এটা সম্পূর্ণ সত্য। তবে আমি শেষ মুহূর্তে এটা বুঝতে পারি।

JP: আপনার কি স্মরণে আছে শেখ মুজিব এবং ভুট্টো ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্য নেতাদের সাথে যৌথ সভার ব্যাপারে?

ওয়ালী খান : হ্যাঁ।

JP: সর্দার শওকত হায়াৎও উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ালী খান : এটা ২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।

JP: সেই সভায় কি ঘটেছিল?

ওয়ালী খান : আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন দেখলাম যে তাঁর সহযোগী যেমন ডঃ কামাল, তাজউদ্দীন, নজরুল ইসলাম এবং মোশতাক আহমেদ এদের দ্বারা তাঁর ঘর ভরে ছিল।

সদস্য নং ১ : তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বে আপনি কি জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেছিলেন? জেনারেল ইয়াহিয়াই নেতাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ডেকে এনেছিলেন। এ রকম কি কিছু ঘটে নি যে, তিনি আপনাদের সকলকে শেখ মুজিবের নিকট পাঠিয়েছিলেন এই বলে যে, আপনাদের যদি সমঝোতা হয় তবে দুই সংসদের ব্যাপারে তাঁর কোনো আপত্তি থাকবে না?

ওয়ালী খান : আমরা যখন শেখ মুজিবের ঘরে গেলাম তখন তাঁর ঘর জনাকীর্ণ ছিল। তিনি করমর্দন করে বলেছিলেন আপনারা যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করতে না চান তবে না করুন কিন্তু আল্লাহর দোহাই আমাদের জবাই করবেন না। মাওলানা নুরানী মনে করেছিলেন যে এটা একটা সাধারণ ব্যাপার ছিল এবং শেখ মুজিবকে তিনি বললেন প্রেসিডেন্ট অবশ্যই জাতীয় সংসদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে সম্মত হবেন। আমরা শেখ মুজিবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে প্রেসিডেন্ট ভবনে গেলাম। এই প্রস্তাবে প্রেসিডেন্ট মোটেই খুশি হলেন না। সে সময় তিনি ভবিষ্যতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছিলেন। আমি প্রেসিডেন্টকে স্মরণ করিয়ে দিলাম এই বিষয়ে মাত্র তিনটি দল সম্পৃক্ত আছে। আওয়ামী লীগ, পিপিপি এবং সেনাবাহিনী। ছোট দলগুলোর নাক গলানোর কোনো সুযোগ নেই; তাছাড়া তাঁর উপদেষ্টার বৈঠক করায় সমাধানের কিছু আলো দেখা গেছে। অতএব, বিদায় হওয়ার জন্য আমরা তাঁর অনুমতি চাইলাম। সাথে সাথে প্রেসিডেন্ট আমাদের সাথে সম্মত হলেন এবং বললেন দুইদিনের মধ্যে তিনি ফিরে আসবেন। প্রেসিডেন্ট ভাবলেন সকল পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে এবং তাঁকে তাঁর নিজের পথ বের করতে হবে।

আমি বললাম, এটা রাজনৈতিক বিষয় এবং আমরা রাজনৈতিক সমাধান

উপস্থাপন করতে চেষ্টা করেছি। এটা যদি তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য না হয় তবে সেখানে আমাদের অবস্থান করা নিরর্থক। এখানে আমি একটি জরুরি বিষয়ে দৃষ্টি আনতে চাই।

JP: জি, বলুন।

ওয়ালী খান : আমি ঠিক মনে করতে পারছি না কারণ সেটা অনেক পরে মনে হয় যে মাসের প্রথম সপ্তাহে যখন আমি প্রেসিডেন্টের পিন্ডিতে ফিরে আসার পর তাঁর সাথে দেখা করার ইচ্ছা করি। আমি সংবাদপত্রে প্রকাশিত মি. ভুট্টো ও মি. কাইউম খানের বক্তব্যের ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম যেখানে ঢাকায় সংগঠিত ঘটনাবলী বিকৃতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জানতে চেয়েছিলেন আমি ঢাকা ত্যাগের পূর্বে শেখ মুজিবের সাথে দেখা করেছিলাম কিনা। আমি তাঁকে বলেছিলাম মুজিবের সাথে আমি ২৪ তারিখ দেখা করেছি। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন, "তার বোধোদয়ের জন্য আপনি চেষ্টা করেননি?" আমি বলেছিলাম, "না, কারণ সেইদিন মুজিব আমাকে যা বলেছিলেন তারপর তাঁর সাথে রাজনীতি নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সাহস ছিল না।" আমি মুজিবকে বলেছিলাম যে, তিনি ভুট্টো ও ইয়াহিয়ার সাথে পরামর্শ করছিলেন এবং তাঁদের উপদেষ্টাগণও বৈঠক করছিলেন। তাছাড়া ভুট্টো বলেছিলেন সেখানে তিনটি দল অন্তর্ভুক্ত আছে। আমি তাঁর কাছ থেকে বিদায়ও নিয়েছিলাম কারণ আমি সেখানে ২ সপ্তাহ ছিলাম এবং কিছুটা ক্লান্ত ছিলাম। আমি তাঁকে আরও বলেছিলাম, মনে হচ্ছে যে নীতিনির্ধারণী বিষয়ে আপনারা সম্মত হয়েছেন এবং শুধু বিস্তারিত নিয়ে কাজ করছেন। সুতরাং আমাদের ফিরে যেতে দেয়া হোক। আমি একই কথা জেনারেল ইয়াহিয়াকে বলেছিলাম। শেখ মুজিব তৎক্ষণাৎ বলেছিলেন, "হ্যাঁ, ওয়ালী খান প্রথম বিমানেই এই অভাগা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন।" তারপর আমি বললাম, "আপনি এত হতাশ কেন?" এতে শেখ মুজিব আমাকে গোপনে বললেন যে, জেনারেল একদিন রাত ১২টা থেকে সকাল ৭টা পর্যন্ত বৈঠক করে যেভাবে অগ্রসর হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গত সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট সেই কথাই উচ্চারণ করলেন এবং যখন তিনি বিদায় নিতে আসলেন তখন আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, "ওয়ালী খান আমাদের জন্য দোয়া করো। এই লোকেরা আমাদের রক্ত চায় এবং তারা প্রচুর বাঙালির রক্ত ঝরাবে।" তারপর তিনি বললেন, সম্ভবত সেটা ছিল আমাদের একে অপরের সাথে শেষ দেখা। আমি শেখ মুজিবের চোখে পানি দেখতে পেয়েছি।

মাওলানা মুফতী মাহমুদ

১৯৭১ সালের ২৪ ডিসেম্বর মি. ভুট্টো পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর পরাজয়ের কারণসমূহ বের করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হামুদুর রহমানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন।

এই প্রসঙ্গে হামুদুর রহমান পাকিস্তানের সকল রাজনীতিবিদের একে-একে ডেকে তাঁদের বিবৃতি ধারণ করেন। কমিশন কর্তৃক মাওলানা মুফতী মাহমুদকে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করা হয়েছিল :

প্রশ্ন : আপনার মতে ঢাকা পতনের পেছনে মূল কারণ কি হতে পারে?

উত্তর : আমার মতে ৩ তারিখের জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করাই ছিল ঢাকার দুঃখজনক ঘটনা কিংবা বাংলাদেশ সৃষ্টির প্রধান কারণ। যদি ইয়াহিয়া খান জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা না করতেন তাহলে পূর্ব পাকিস্তান কখনোই আমাদের কাছ থেকে আলাদা হয়ে যেত না।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্ধারণের পর আপাত কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই জাতীয় সংসদ অধিবেশন না ডাকার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ও নেতারা সন্দিহান হয়ে পড়েন। জাতীয় সংসদ অধিবেশনের তারিখ নির্ধারণ করার পর এবং সংসদের অনেক নেতার ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার পর হঠাৎ জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতের ঘোষণা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নিকট সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত হয়ে দেখা দেয়। তারা বিশ্বাস করল যে, তাদের শুধু বিশ্বাসই করা হচ্ছে না উপরন্তু অনুভব করল যে, পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার তারা যে প্রথম অধিকার পেয়েছে তা থেকেও বঞ্চিত করার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ধরনের অবিশ্বাস ইতোমধ্যেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিস্তর ফারাক তৈরি করেছিল এবং আহূত জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতাদেশ সেটাকে আরও বেগবান করে তাদেরকে রাস্তায় নামিয়ে আনে।

প্রশ্ন : কি কারণে ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চ অধিবেশন স্থগিত করেন?

উত্তর : এই প্রশ্নের সঠিক উত্তরের জন্য আমাদের ১৯৭১ সালের

ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকের রাজনৈতিক কার্যাবলী পর্যালোচনা করতে হবে। ইয়াহিয়া খান এবং ভুট্টোর মধ্যে পাঁচ ঘন্টাব্যাপী বৈঠক হয়। তারপর ভুট্টো ১৯৭১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি আমার এবং ওয়ালী খানের সাথে পেশাওয়ারে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের পর ভুট্টো শেখ মুজিবের পরিকল্পনার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে পরামর্শ দেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সব নির্বাচিত দলের শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষার জন্য নয় বরং শেখ মুজিবকে আবদ্ধ করার জন্যও সম্মিলিত অবস্থান নেয়া উচিত।

তিনি বলেন, প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে আমাদের ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশন পরিহার করা উচিত, যাতে শেখ মুজিব যেন তাঁর পছন্দমতো শাসনতন্ত্র আমাদের উপর চাপিয়ে দিতে না পারে। কিন্তু আমরা বলেছিলাম যে যেহেতু জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পর সংসদ অধিবেশন ডাকা হয়েছে, সুতরাং সেটাকে আর স্থগিত করা উচিত নয়। তাছাড়া পূর্ব পাকিস্তানিরা ইতোমধ্যেই সন্দিহান হয়েছিল যে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও সরকার গঠনের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে তাদের ডাকা হচ্ছে না। একইভাবে সংসদ অধিবেশন অসম্ভব বিলম্বে ডাকা হয়েছে। সুতরাং অধিবেশন ডাকার পর এর স্থগিতকরণ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে পারে। ছয় দফার উপর ভিত্তি করে শেখ মুজিবের শাসনতন্ত্র আমাদের উপর চাপানো হবে। আমরা বললাম যে, আমরা একযোগে পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থরক্ষা করব এবং এতে আমরা ব্যর্থ হলে জাতীয় সংসদ থেকে বের হয়ে আসবো। কিন্তু পেশাওয়ারে অবস্থানকালীন মি. ভুট্টো ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশনে যোগদান না করার তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন। তাঁর পথ অনুসরণ করে খান আবদুল কাইউম খানও ঢাকা যেতে অস্বীকৃতি জানালেন। সেই দিনগুলোতে ইয়াহিয়া খানও সকল নেতার সাথে যোগাযোগের জন্য তাঁর রণকৌশল অবলম্বন করেন। তিনি সকল নেতার উপর ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ অধিবেশন পরিহারের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন, যাতে তিনি স্থগিতাদেশের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু রাজনৈতিক দল জাতীয় সংসদ বর্জনের সরাসরি বিরোধিতা করে।

এই পরিস্থিতি আয়ত্তের জন্য ইয়াহিয়া খান ২০ ফেব্রুয়ারি আমাকে ও মাওলানা হাজারভিকে আমন্ত্রণ জানান এবং আমাদের ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য চাপ দেন। আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম তিনি যদি জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করতে চান তবে তিনি তা করতে পারেন কিন্তু সেই সংসদ স্থগিতের কারণে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হবে

তার দায়দায়িত্ব আমরা নিতে চাই না। এতে ইয়াহিয়া খান বলেন, আমরা যদি সংসদ অধিবেশনে যোগদান না করি তবে তা তাঁকে সংসদ অধিবেশন স্থগিতের সুযোগ করে দেবে। তিনি আরও বললেন, সংসদ অধিবেশনের আগে শাসনতান্ত্রিক বিষয়সমূহে সমঝোতা হওয়া উচিত। কারণ, সংসদ অধিবেশন শুরুর পর নির্ধারিত ১২০ দিনের মধ্যে যদি শাসনতন্ত্র গঠন কাজ সমাধা না হয় তবে সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করে পুনঃনির্বাচন দিতে হবে; যা সরকারের জন্য ৯ কোটি টাকার একটা বোঝা হবে এবং যদি শেখ মুজিবের ছয় দফা অনুযায়ী যদি শাসনতন্ত্র রচিত হয় তবে তার ফলে দেশ বিভক্ত হয়ে পড়বে। আমি ইয়াহিয়া খানের সাথে দ্বিমত পোষণ করে বলেছিলাম, যদি শেখ মুজিব সংসদে আমাদের কথা না শুনে তাঁর ছয় দফার উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র গঠন করেন তবুও আমরা মনে হয় দেশ বিভক্তিতে কয়েক বছর লেগে যাবে। কিন্তু যদি প্রস্তাবিত ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন স্থগিত করা হয় তবে সেই বছরই দেশ ভেঙে দু'ভাগ হয়ে যাবে। আমি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলাম। তিনি যদি আশঙ্কা করেন ভুট্টো ও মুজিবের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদের কারণে বাধ্যতামূলক ১২০ দিনের মধ্যে শাসনতন্ত্র তৈরি করা সম্ভব নয় তবে সংসদ বিলুপ্তি ও পুনঃনির্বাচনের আশঙ্কা নিরসনের তিনি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বৃদ্ধি করতে পারেন।

আমি তাঁকে আরও বললাম হয় তিনি শাসনতন্ত্র রচনার জন্য বরাদ্দকৃত সময় বিলোপ করবেন অথবা এর সময়কাল বৃদ্ধি করবেন কিন্তু তিনি যেন কোনোক্রমেই সংসদ অধিবেশন স্থগিত না করেন, যেখানে ইয়াহিয়া খানের কোনো জবাব ছিল না।

প্রশ্ন : যখন আপনি জানতে পারলেন যে শাসনতন্ত্র গঠনের ১২০ দিন বরাদ্দকৃত সময় ইয়াহিয়া খান বিলোপ করতে চান না বরং সংসদ অধিবেশন স্থগিতের পরিকল্পনা করছেন, যা আপনার মতে সংকটের দিকে নিয়ে যাবে তখন আপনি কি শেখ মুজিবকে নমনীয় করার জন্য তাঁর সাথে দেখা করার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ। আমি শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে তাঁর ছয় দফার ব্যাপারে শুধু যুক্তি প্রদর্শনই করি নি, তাঁকে ছয় দফার ব্যাপারে আমার নিজের ও অন্যান্য দলের মতামতও অবহিত করেছিলাম। মুজিবের সাথে বৈঠক করার ধারণাটা ছিল আমার নিজের যা আমি ইয়াহিয়া খানের সাথে বৈঠকের সময় তাঁর কাছে পেশ করেছিলাম। এ কারণে আমি এবং মাওলানা হাজারভি ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় করাচি পৌঁছাই এবং বিমানবন্দরে কাওসার নিয়াজী ও রাসূল

বকস্ তালপুরকে দেখি। তাঁরা আমাদের বললেন যে মি. ভুট্টো আমাদের সাথে দেখা করতে চান। আমরা মি. ভুট্টোর স্থানে গেলাম। তিনি আবারও ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশনে যোগদান না করার জন্য আমাদের রাজি করানোর চেষ্টা করলেন। মি. ভুট্টো আমাদের বললেন, আমরা শুধু সংসদ অধিবেশন বর্জন করব এবং বাকিটা তিনি স্থির করবেন।

যাহোক, ২১ তারিখ সকালে কলম্বো হয়ে আমরা ঢাকায় পৌঁছলাম। আমরা মুজিবের সাথে দুই ঘণ্টা পরামর্শ করলাম। তিনি বললেন তিনিও দেশের অখণ্ডতার প্রশ্নে উদ্বিগ্ন এবং তুলে ধরলেন যে তাঁর ছয় দফা দেশবিভাগ করবে না। তাছাড়া তিনি বললেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের নেতাদের সাথে আলোচনা করতে আগ্রহী। এই মর্মে সংবাদপত্রে একটা বিবৃতি প্রকাশ পেয়েছিল কিন্তু ইয়াহিয়া খানকে মনে হলো সংসদ অধিবেশন স্থগিতের জন্য দৃঢ়সংকল্প। সেই অনুসারে মি. ভুট্টো লাহোরের মিন্টো পার্কে তার দেয়া জনসভার ভাষণে সংসদ অধিবেশন বর্জনের তাঁর পূর্বের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করলেন। তাঁর ভাষণে তিনি সতর্ক করে দিলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানের যে সব নেতা ঢাকা যেতে চান তাঁরা যেন বিমানের ফিরতি টিকিট নিয়ে না যান। কারণ, তাঁদের ফিরতি পথে পশ্চিম পাকিস্তানের কোনো বিমানবন্দরে তাঁদের অবতরণ করতে দেয়া হবে না। তাঁর নিজের দলের সদস্যদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, কোনো ব্যক্তি যদি সেই অধিবেশনে যোগদানের সাহস দেখায় তাঁর ঠ্যাং ভেঙে দেয়া হবে। এই বক্তব্যের পর ঠিক পরের দিন ইয়াহিয়া খান ৩ মার্চের সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।

এতে শেখ মুজিব সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেন এবং পরিস্থিতি ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে এগুতে থাকে।

ইতোমধ্যে করাচিতে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে মি. ভুট্টো দুই সংসদের ধারা তুলে ধরেন—দুই সরকার এবং শ্লোগান দেন "এই দিকে আমরা ঐ দিকে তোমরা"। এতে পশ্চিম পাকিস্তানের কিছু দল বিশেষ করে জামায়াত এবং ন্যাপ জোরালো বিরোধিতা করে এই ভেবে যে এ ধরনের ধারণা দেশকে নিশ্চিতভাবে দু'ভাগ করে দেবে।

প্রশ্ন : ইয়াহিয়া খান ঢাকায় যে যোগাযোগ করেছিলেন তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট ছিলেন?

উত্তর : ঐ সমস্ত যোগাযোগে ব্যক্তিগতভাবে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। কারণ, ঐ যোগাযোগগুলো প্রধানত ছিল ইয়াহিয়া-মুজিব, ভুট্টো-মুজিব, ইয়াহিয়া-ভুট্টো-মুজিব, কখনও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে ইয়াহিয়ার

যোগাযোগ কিংবা কোনো সময় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার মুজিবের সাথে আলাপ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। যখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতারা মুজিবের সাথে কথা বলার পর ইয়াহিয়াকে বলতেন মুজিব সঠিক ছিল। কারণ, তাদের সাথে আলাপের সময় তিনি অখণ্ড পাকিস্তানের নিশ্চয়তা দিয়েছেন তখন ইয়াহিয়া এই বলে তা উঠিয়ে দেবে যে মুজিব তাঁর ছয় দফা থেকে কোনো কিছু ছাড় দেবেন না। সেই সময় ১০ দিনব্যাপী সমগ্র আলোচনায় ইয়াহিয়া খান কখনও সব দলের নেতাদের এক টেবিলে বসিয়ে পারস্পারিক মতবিনিময়ের সুযোগ দেননি। বাস্তবে সেই দিনগুলোতে আমরা যখন ইয়াহিয়া এবং মুজিবের সাথে দেখা করি তখন ঢাকায় আমরা সন্দেহজনক এবং চক্রান্তমূলক পরিস্থিতি দেখি। সুতরাং জাতীয় স্বার্থে সেখানে আমাদের যাওয়া একটা দায়িত্ব বলে আমরা মনে করেছিলাম। কিন্তু ইয়াহিয়া খান আপাত দৃষ্টিতে একটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সর্বাধিক সৈন্য মোতায়েনের জন্য সময় চাচ্ছিলেন যাতে করে তাঁর সামরিক অভিযানের সময় সৈন্যদের কোনো অসুবিধার সম্মুখীন হতে না হয়।

প্রশ্ন : সেই দশ দিনের আলোচনায় ইয়াহিয়া খান কি কোনো পথনির্দেশ করেছিলেন যাকে আপনারা এই বলে নাকচ করেছিলেন যে, এর ফলে পাকিস্তান ভেঙে যেতে পারে?

উত্তর : হ্যাঁ। ইয়াহিয়া খান সংখ্যালঘিষ্ঠ পার্টির সংসদীয় নেতাদের বিবেচনার জন্য একটি পন্থা উপস্থাপন করেছিলেন। আমাকে তিনি নিজে বলেছিলেন যে তিনি এবং মুজিব একমত হয়েছিলেন যে, সেখানে আমাদের সম্মতির প্রয়োজন ছিল।

পন্থাটা ছিল নিম্নরূপ:

ক) আদেশ বলে প্রাদেশিক সংসদসমূহকে কার্যকর করা হবে এবং তাদেরকে কাজ করার অনুমতি দেয়া হবে।

খ) সামরিক আইন তুলে নেয়া হবে।

গ) সামরিক আইন তুলে নেয়ার পর জাতীয় সংসদের দুটি পৃথক কমিটি গঠন করা হবে। একটি পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে এবং অন্যটি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। পশ্চিম পাকিস্তান কমিটির সভা ইসলামাবাদে এবং পূর্ব পাকিস্তান কমিটির সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হবে।

ঘ) এই দুই কমিটি দুটি স্বতন্ত্র শাসনতন্ত্র গঠন করবে। যখন দুটি কমিটি তাদের নিজ-নিজ শাসনতন্ত্র গঠনকার্য সম্পন্ন করবে তখন সমগ্র

পাকিস্তানের উপর ভিত্তি করে একটি সর্বজনস্বীকৃত শাসনতন্ত্র তৈরি করার জন্য একটি যৌথ সংসদ ডাকা হবে।

মি. ভুট্টো ও কাইউম খান ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতা একযোগে এই পন্থা বাতিল করেন। কারণ, এটার স্বীকৃতি দুই পাকিস্তান সৃষ্টির সমতুল্য। এর উত্তরে আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলোর নেতারা একটা বিকল্প পন্থা উপস্থাপন করি যা ছিল নিম্নরূপ:

১) জাতীয় সংসদ অধিবেশন ঢাকা হোক

২) প্রথম অধিবেশনে শপথ গ্রহণ হওয়া উচিত

৩) একটা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র অনুমোদনের পর সামরিক আইন তুলে নেয়া উচিত।

৪) আমাদের পন্থায় আমরা সুনিশ্চিত করেছিলাম যে, যেহেতু সামরিক আইন তুলে নেয়ার সাথে সাথে সরকারের কার্যাবলী সুস্থভাবে পরিচালনার জন্য একটি অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্র প্রতিস্থাপন করা হবে সেহেতু সামরিক আইন তুলে নেয়া থেকে স্থায়ী শাসনতন্ত্র গঠন না হওয়া পর্যন্ত সময়ে কোনো শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা সৃষ্টি হবে না। অন্যদিকে যদি জাতীয় সংসদের জন্মের পূর্বে কিংবা অন্তর্বর্তীকালীন শাসনতন্ত্রের অনুমোদনের পূর্বে সামরিক আইন তুলে নেয়া হতো তবে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা যা তিনি সামরিক আইনের মাধ্যমে অর্জন করেছিলেন তা স্বাভাবিকভাবেই লোপ পাবে। তাছাড়া সামরিক আইনের সময়ে প্রেসিডেন্টের আদেশে যে প্রাদেশিক সংসদ গঠন হতো তা যদি তাদের স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কোনো আইন পাস করতো তবে তারা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারতো। সুতরাং ইয়াহিয়া খানের সেই পরিকল্পনায় এক পাকিস্তানের বদলে অনেক স্বাধীন পাকিস্তান সৃষ্টির, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের আলাদা হয়ে যাওয়ার জন্য শাসনতান্ত্রিক সমর্থন দেয়ার একটি চক্রান্ত ছিল। প্রকৃতপক্ষে এ কারণেই শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনা বিবেচনা ও গ্রহণ করে গুনগুন করে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ শুরু করেন।

যখন ইয়াহিয়া খান দেখলেন যে, আমরা তার পন্থা প্রত্যাখ্যান করেছি তখন তিনি শেখ মুজিবের কাছে ব্যাখ্যা করলেন যে, তাঁর পন্থা শুধু তখনই কার্যকর হবে যখন তা পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতা কর্তৃক গৃহীত হবে।

প্রশ্ন : আপনি কি আপনাদের এবং ইয়াহিয়া খানের উভয় পন্থা নিয়ে শেখ মুজিবের সাথে কথা বলে তাঁর অনুভূতি জানার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর: আমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের নেতারা ২৩ মার্চ শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে তাঁর সাথে ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করি। আমরা তাঁকে বলেছিলাম, ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনায় অনেকগুলো অন্তর্নিহিত বিপদ আছে এবং তাঁকে আমাদের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেছিলাম। কারণ, আমাদের আশঙ্কা ছিল ইয়াহিয়ার পরিকল্পনায় পাকিস্তান অনেক ভাগে ভাগ হয়ে যাবে, কিন্তু মুজিব ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনার উপর অটল থাকলেন।

যখন আমরা ইয়াহিয়া খানকে এই বিবরণ দিলাম, তিনি বললেন, আমাদের সমর্থন সাপেক্ষে তিনি দুই সংসদের পরিকল্পনা অনুমোদন করেছেন। তিনি আরও বললেন, আপনারা যদি মনে করেন আমার পরিকল্পনা দেশের ঐক্য ও অখণ্ডতার পরিপন্থী তবে আমি সেই পথে যাব না এবং শেখ মুজিবকেও একই কারণে সম্মত হওয়ার জন্য চাপ দেব। কিন্তু পরের দিন যখন আমরা ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করলাম, তিনি বললেন, তিনি সামরিক অভিযানের পথ অবলম্বন করবেন কারণ শেখ মুজিব রাজি হচ্ছেন না। আমরা বললাম, আমরা গণতান্ত্রিক লোক এবং এ ব্যাপারে তাঁকে কোনো উপদেশ দেব না। কারণ, এ ধরনের ব্যবস্থার ব্যাপার বরং তাঁর জেনারেলদের সাথে পরামর্শ করা উচিত। এর ফলে ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ তারিখ সামরিক অভিযান শুরু করেন। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে জুলফিকার আলী ভুট্টো ছিলেন নেতা যিনি এই সামরিক অভিযানকে এই বলে স্বাগত জানান যে, এটা পাকিস্তানকে ভেঙে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করেছে অথচ পাকিস্তানের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, ভুট্টোর কারণেই সেনা অভিযান পাকিস্তানকে রক্ষার পরিবর্তে ভেঙে 'কায়েদে আজমের' নতুন পাকিস্তানের সৃষ্টি করেছে।

সরদার শওকত হায়াৎ খান

২১০ নং সাক্ষী দৃঢ় শপথ নিয়ে বর্ণনা করেন।

মি. বোখারীর পালা সকাল ৯:৩০ শুরু হলো (১০-৪-৭২)

১৯৭১ সালের ৩ মার্চের জাতীয় সংসদ স্থগিত হওয়ার ফলে ঢাকায় সৃষ্ট গোলযোগের কথা শুনে আমি জেনারেল ইয়াহিয়ার বড় ভাই আগা মোহাম্মদ আলীর সাথে যোগাযোগ করি এবং আভাস দেই যে, আমি এবং মুমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হতে পারি এবং গোলযোগ নিরসনের জন্য আমাদের সাধ্যমতো চেষ্টা করতে পারি। তিনি প্রস্তাব রাখলেন যে, জেনারেল ওমারের পরিবর্তে কর্নেল মোবারক আসলেন এবং জানালেন আমাদের জন্য ঢাকা যাওয়া ঠিক হবে না, আমাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা সেটা নিয়ন্ত্রণে আনতে যাচ্ছেন। যাহোক, পর্যাপ্ত আসন ছিল না। তিনি আমাদের জানালেন, যেহেতু প্রেসিডেন্ট নিজে ১১ তারিখ ঢাকা যাচ্ছেন, আমরা যেন সেখানে ১৮ তারিখে যাই।

কর্নেল মোবারক এবং আমাদের মধ্যকার আলাপ সম্ভবত ৪-৬ মার্চের মধ্যে হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় যে, যদিও আমাদের জানানো হয়েছিল আমাদের জন্য কোনো আসন ছিল না তবুও মুফতী মাহমুদ এবং মাওলানা হাজারভিকে ঐ সময় ঢাকার পথে রওয়ানা হওয়ার জন্য অনুমতি দেয়া হয়েছিল।

১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ মি. দৌলতানা এবং আমি ঢাকায় পৌঁছাই এবং পীর সাইফুদ্দিন, মুসলিম লীগের একজন জাতীয় সংসদ সদস্য ২/১ দিন আগেই ঢাকা পৌঁছেছিলেন। একই বিমানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল হামিদ ভ্রমণ করছিলেন। ঢাকা ভ্রমণের পথে আমি সুযোগ নিয়ে তাঁর সাথে পূর্ব পাকিস্তানে সেনা অভিযানের সাথে জড়িত বিপদের দিকটা তুলে ধরলাম। আরও বললাম যে অনেক দূর থেকে সরবরাহের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর সাথে নিয়ন্ত্রণ ছিন্নও হয়ে যেতে পারে। জেনারেল আমার সাথে একমত হলেন বলে মনে হলো। যে কারণে আমি পূর্ব পাকিস্তানে সম্ভাব্য সেনা অভিযানের অনুমান

করে আলোচনা করলাম, তা হলো লাহোরে কর্নেল মোবারক আমাদেরকে বলেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী নেয়ার কাজে সব বিমান ব্যবহার করা হচ্ছিল সুতরাং আমাদের জন্য কোনো আসন ছিল না। এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে সেনা অভিযানের পরিকল্পনা করা হচ্ছিল।

ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছে আমরা দেখলাম অবাঙালি যেমন বিহারি, পাঠান ইত্যাদি যারা পাকিস্তান চলে যেতে চাচ্ছিল তাদের দেখাশোনার জন্য একটি উদ্বাস্তু শিবির স্থাপন করা হয়েছে। এই লোকগুলো আমার ও দৌলতানার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের দালাল বলে শ্লোগান দিল।

১৯৭১ সালের ১৯ মার্চ মি. দৌলতানা এবং আমি শেখ মুজিবের সাথে তাঁর বাসায় দেখা করলাম। লক্ষ্য করলাম, ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবের সাথে আমার যে বৈঠক হয়েছিল সেই পরিবেশ এবং বৈঠকের পরিবেশের মধ্যে একটা বড় ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে। আগের বার শেখ মুজিব একা আমার সাথে বৈঠক করেছিলেন। তখন একজন মুক্ত ব্যক্তি বলে মনে হয়েছিল কিন্তু এখন যে সাক্ষাতের কথা বলছি তখন তাঁকে ঘিরে মি. তাজউদ্দীন, মি. নজরুল ইসলাম ছিলেন এবং তিনি একাকী আমাদের সাথে দেখা করতে পারেননি।

শেখ মুজিবুর রহমান এই দুই ভদ্রলোক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেক পন্থা অবলম্বন করেছিলেন কিন্তু সফল হননি। কারণ, সাক্ষাতের পুরো সময়টা ধরে তাদের একজন হাজির ছিলেন। আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, শেখ মুজিব আমাদের সুনির্দিষ্ট কিছু কথা বলতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে ও সরাসরি তাঁর দলের সদস্যের সামনে তা করতে পারছিলেন না। সেই সাক্ষাতে গঠনমূলক কিছু বেরুল না। শুধু শেখ মুজিব বললেন, জেনারেলরা তাকে নিয়ে বেশ খেলা করছেন এবং তিনি তাঁর ধৈর্যের শেষ সীমানায় চলে এসেছেন। মি. মুজিবুর রহমান মি. ভুট্টোর একটি বক্তব্যের সিদ্ধান্ত দিয়ে বলেন, মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্ব নিতে পারেন এবং ভুট্টো নেবেন পশ্চিম পাকিস্তানের। শেখ মুজিবুর রহমান অবিকল শব্দ প্রয়োগ করে বলেছিলেন মি. ভুট্টো বলেছেন, "তুম উধার হাম ইধার"। শেখ মুজিবুর রহমান আরও বললেন, ইয়াহিয়া খান তাঁকে দুটি পৃথক শাসনতান্ত্রিক সংসদের সুযোগ দিয়েছেন, একটি ঢাকায় এবং অন্যটি ইসলামাবাদে, যা তাঁর জন্য খুব ভালো হয়েছে। আমি তাঁকে বললাম, এই ধরনের পরিকল্পনা ধ্বংসাত্মক হবে। শেখ মুজিব আমাদের বললেন তিনি যা

চাচ্ছিলেন বাস্তবে তার চায়ে বেশি পাচ্ছেন। তিনি ভেঙে বলেছিলেন তবে আমরা সহজেই বুঝতে পারছিলাম, যদিও তিনি প্রদেশের সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছিলেন, ইয়াহিয়া খান তাঁকে স্বাধীনতার সুযোগ দিয়েছেন। শেখ মুজিব আমাদের ইয়াহিয়ার লেখা কোনো চিঠি দেখান নি কিন্তু তিনি মৌখিক মন্তব্য প্রদান করেন যা আমি একমাত্র উল্লেখ করলাম। আমাদের বিদায় দেয়ার সাথে পরে দেখা করবেন।

পরে সেই রাতে আমাদের এক বন্ধুর বাড়িতে আওয়ামী লীগের একজন বড় নেতা আমাদের সাথে দেখা করে আমাদের অবহিত করেন যে, আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত স্বাধীনতা ঘোষণার পক্ষে থাকা সত্ত্বেও ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ পল্টন ময়দানের জনসভায় শেখ মুজিব তা না করায় শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির কয়েকজন সদস্য বাস্তবে সেই দিন থেকেই কয়েদির জীবনযাপন করছেন।

সেই ভদ্রলোক আমাদের জানালেন, কার্যনির্বাহী কমিটির মাত্র তিনজন সদস্য একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার বিপক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয় পাশ কাটিয়ে ৭ মার্চের ভাষণে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের ভবিষ্যতে জাতীয় সংসদে অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনা করার জন্য জেনারেল ইয়াহিয়ার নিকট ৪টি পূর্বশর্ত পেশ করেন। সেই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বাহক, যাঁর নাম কমিশনের কাছে আমি আলাদাভাবে প্রকাশ করব, এই বলে আমাদের নিকট আবেদন জানালেন যে, আমরা যেন জেনারেলের এই ব্যাপারে শেখ মুজিবকে সহায়তা করতে বলি, অন্যথায় পাকিস্তান দিবসে অর্থাৎ ২৩ মার্চ ১৯৭১ শেখ মুজিবকে একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণার প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরও বললেন, শেখ মুজিব এবং তাঁর কয়েকজন সহকর্মী, যারা এখনও এক পাকিস্তানে বিশ্বাস করেন, আওয়ামী লীগের উগ্রবাদীদের নিয়ন্ত্রণ করতে চান। ইতোমধ্যে মি. ভুট্টো এবং তাঁর দলের বেশ কয়েকজন নেতা ১৯ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছান। খান আবদুল কাইউম খানও পরের দিন ২০ মার্চ ঢাকায় পৌঁছেন। ২১ মার্চ মি. দৌলতানা এবং আমি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার সাথে একটা বৈঠক করি যাঁদের মধ্যে ছিলেন মি. ওয়ালী খান, মুফতী মাহমুদ, মি. গাউস বক্স, বেজেনজো এবং মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী।

আমরা এই বৈঠকে মি. ভুট্টোকে এবং খান আবদুল কাইউমকে ডাকি নি।

যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনা নিয়ে আলাপ করছিলাম যে জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে আমাদের জিজ্ঞেস করা উচিত, তিনি আমাদের সাথে আলাপে বসুন অথবা আমাদের পশ্চিম পাকিস্তান ফিরে যাওয়ার অনুমতি দিন। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির দুই নেতা, মি. মাহমুদ আলি কাসুরী এবং মি. হাফিজ পীরজাদা আমরা যে বাড়িতে সভা করছিলাম সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। এই দুই ভদ্রলোক আমাদের জানালেন, বড় ধরনের অগ্রগতি হয়েছে তাতে জাতীয় সংসদকে ভেঙে দুটি শাসনতান্ত্রিক সংসদ গঠন করার বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। প্রথমে কে এই প্রস্তাব তুলে ধরেছেন এই বিষয়ে তাঁরা বিস্তারিত বলেননি। আমরা তাঁদের জানালাম এই বিষয়ে ইতোমধ্যে আমরা শেখ মুজিবুর রহমানকে আমাদের অমতের কথা জানিয়ে দিয়েছি। পিপলস্ পার্টির এই দুই নেতার কাছ থেকে আমরা আরও জানতে চাইলাম যে "তুম উধার হাম ইধার" এই বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁদের দলের চেয়ারম্যান কি বোঝাতে চেয়েছেন?

পরের দিন অর্থাৎ ২৩ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে বৈঠকের জন্য আমাদের প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ডেকে পাঠানো হলো। এই বৈঠকে মি. ভুট্টো ও তাঁর দলের নেতারা এবং খান আবদুল কাইউম ছাড়া ঢাকায় আগত পশ্চিম পাকিস্তানের প্রায় সকল নেতা উপস্থিত ছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের সাথে তাঁর যোগাযোগের একটি অসংলগ্ন ফিরিস্তি দিলেন যার উপর আমি তাঁকে বললাম যে তাঁর এবং শেখ মুজিবের দেয়া বিবরণের মধ্যে গরমিল আছে সুতরাং যদি সর্বদলীয় একটি বৈঠক করা হয় তবে তা বেশি কার্যকর হবে। জেনারেল ইয়াহিয়া এই প্রস্তাব পাস করলে অন্যদিকে তুলে ধরলেন যে, বৈধভাবে সামরিক আদেশবলে তাঁর পক্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব নয়। কারণ, আইন উপদেষ্টাদের মতে একবার সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হলে তা জাতীয় সংসদের অনুমোদন না হওয়া পর্যন্ত একটা শূন্যতার সৃষ্টি হবে। জেনারেল ইয়াহিয়ার নিকট প্রস্তাব রাখা হলো যে, কমপক্ষে তিনি আওয়ামী লীগের প্রস্তাব অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিতে পারেন, যা পরবর্তীতে জাতীয় সংসদে পাস করিয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে অনুমোদন করা যেতে পারে।

আমরা এই অভিমত ব্যক্ত করলাম যে এ ব্যবস্থা জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক আহূত ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ তারিখে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে শেখ মুজিবের যোগদানে সহায়তা করবে। তখন জেনারেল ইয়াহিয়া আমাদের সকলকে উপদেশ দিলেন শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে এই প্রস্তাবে তাঁকে

রাজি করাতে চেষ্টা করানোর জন্য।

সেই অনুসারে ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় আমরা শেখ মুজিবের সাথে দেখা করলাম। সেই সময় আওয়ামী লীগের উচ্চ পর্যায়ের সকল নেতা শেখ মুজিবের সাথে উপস্থিত ছিলেন। শেখ সাহেব আমাদের বললেন তিনি একেবারে বিরক্ত হয়ে গেছেন। জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তার উপদেষ্টারা প্রতিদিন অবস্থান পরিবর্তন করছেন এবং প্রতিদিন তাঁরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে সরে আসছেন এবং দুই শাসনতান্ত্রিক সংসদের প্রস্তাব তাঁর জন্য উপযোগী।

১৯-৪-৭২-এর সকাল ১০:৪৫ পর্যন্ত চললো।

শেখ মুজিব আমাদের নিকট পরিষ্কার করে বললেন, জাতীয় সংসদ ভেঙে দুটি শাসনতান্ত্রিক সংসদ গঠনের প্রস্তাবের শুরু করেছিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগ তা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিল। কারণ, তখনকার চলমান পরিস্থিতির কারণে সেটা তাদের কাছে উপযোগী ছিল। তিনি যোগ করে বলেছিলেন যদি সম্ভব হয় কিংবা প্রয়োজন হয় তবে দুটি শাসনতান্ত্রিক সংসদ এক সংসদ হিসাবে বসতে পারে।

আমরা শেখ মুজিবের নিকট ব্যাখ্যা করে বোঝালাম যে এ ধরনের প্রস্তাব দেশকে বিভক্ত করে ফেলবে এবং তার পরিবর্তে আমাদের প্রস্তাবে তাঁর সম্মত হওয়া উচিত যে, আওয়ামী লীগের চার দফা মেনে নিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া প্রকাশ্য ঘোষণার মধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শেখ মুজিবের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করবেন।

এই ঘোষণার পর জাতীয় সংসদের একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়া উচিত, যার বলে LFO এর ভিত্তিতে জেনারেল ইয়াহিয়াকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে অনুমোদন দেয়া হবে। আমাদের প্রস্তাব জাতীয় সংসদকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের দু'টি পৃথক কমিটিতে বিভক্ত করার জন্য ছিল না। শেখ মুজিবের উত্তর ছিল "জেনারেল ইয়াহিয়া প্রথমে এটা করুক"। আমি এবং মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী এই উত্তরকে এইভাবে ব্যাখ্যা করলাম যে, শেখ মুজিব আমাদের প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। এই ধারণা পোষণ করে আমরা আমাদের নিজ-নিজ বাসস্থানে ফিরে গেলাম।

সেই দিনই রাত এগারোটা অথবা সাড়ে এগারোটা হবে, খবর পেলাম জেনারেল ইয়াহিয়া আমাদের পেতে চান। রাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছে দেখলাম একঘরে জেনারেল ইয়াহিয়া এবং জেনারেল পীরজাদা আছেন। আমরা দেখলাম জেনারেল ইয়াহিয়া পাজামা পরে আছেন এবং মদ পান করছেন। ঘরে

জেনারেল পীরজাদাও ছিলেন। আমরা ধারণা করলাম যে এই বৈঠকে জেনারেল পীরজাদার উপস্থিতি অস্বাভাবিক। পশ্চিম পাকিস্তানের সকল নেতা, গাউস বকস্ বেজেনজো ছাড়া, ইতোমধ্যেই আমি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি, সকলেই এই বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। অবশ্য পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির নেতারা এবং মি. কাইউম খান উপস্থিত ছিলেন না। মনে হয়েছিল এসব নেতা আলাদাভাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে পরামর্শ করেছিলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া এই দিন শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার ফলাফল কি তা জানতে চেয়েছিলেন। আমাদের কেউ-কেউ বলেছিলেন যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তবে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম এটা সঠিক নয়। কারণ, শেখ মুজিব প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন। যদি জেনারেল ইয়াহিয়াও সেই প্রস্তাবে রাজি থাকেন। জেনারেল ইয়াহিয়া বারান্দায় শেখ মুজিব এবং ভুট্টোর মধ্যে আলাপের, যা তাঁরা বুঝতে পারেননি যে তিনি শুনতে পেয়েছেন, বিস্তারিত বিবরণ দিলেন। পরিশেষে তিনি আমাদের উদ্দেশ করে বললেন তাঁর কি করা উচিত। তখন মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী জেনারেল ইয়াহিয়াকে বললেন তাঁর শুধুমাত্র সঠিক কাজটি করা উচিত এবং তা হচ্ছে গণতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং গত নির্বাচনের বিজয়ীদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর।

উত্তরে জেনারেল ইয়াহিয়া বললেন তিনি যদি তা করেন তবে বিশ্ববাসীর নিকট তিনি হাসির পাত্র হিসাবে বিবেচিত হবেন এবং সেনাবাহিনীর কাছে তা কলঙ্কিত হবে যারা পূর্ব পাকিস্তানে শেখ মুজিব এবং সমান্তরাল সরকার গঠন করে উত্ত্যক্ত করা সত্ত্বেও ধৈর্যশীল ছিল।

এই অবস্থায় কথায় ছেদ ঘটিয়ে আমি জেনারেল ইয়াহিয়াকে বললাম তার জন্য দুটো পথ খোলা আছে:

ক) হয় মওলানা শাহ আহমেদ নূরানীর প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে হবে, অথবা

খ) পরিস্থিতি অনুযায়ী যা করা উচিত তা তাঁর নিজের করা উচিত।

আমি পরামর্শ দিলাম একজন জ্ঞানী লোক খুব কমই নিজের কাঁধে বন্দুক রেখে গুলি করে এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার জন্য শেখ মুজিবের কাঁধ ধার নেয়ার সুযোগ ছিল। এক বা দু'দিন আগে শেখ মুজিবের বিশেষ দূত আমাদের যে বার্তা পৌঁছে দিয়েছিলেন আমি তা জেনারেল ইয়াহিয়াকে অবহিত করলাম। আমি জেনারেল ইয়াহিয়াকে সেনা আক্রমণের সাথে অন্তর্নিহিত বিপদসমূহ ব্যাখ্যা করলাম। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীকে সমর্থনের অন্যান্য

অসুবিধা ছাড়াও এখানে এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে হত্যা করবে। আমি তাঁকে আরও বললাম এই হত্যাকার্যে আমি পাঞ্জাবি সৈন্যের জড়িত হওয়া পছন্দ করি না। জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে আমি পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অসুবিধার কথা ও তুলে ধরলাম। যেমন একটি রক্ষিত বাজার হারানো, পূর্ব পাকিস্তানের সব বৈদেশিক আয় থেকে বঞ্চিত হওয়া ইত্যাদি। কোনো সামরিক অভিযানে অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়ার কথা আমার কাছ থেকে শুনে জেনারেল ইয়াহিয়া মন্তব্য করলেন, আমি অর্থনীতির কথা বলছি। উত্তরে আমি বললাম যে অর্থনীতি এবং রাজনীতি একে অপরের সম্পূরক। আলোচনা শেষে জেনারেল ইয়াহিয়া উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন যে আগামী কাল অর্থাৎ ২৪ মার্চ ১৯৭১ আমাদের সকলের ঢাকা ত্যাগ করা উচিত।

আমাদের বেরিয়ে আসার পথে আমরা প্রেসিডেন্টের সামরিক সচিবকে বিমানে আমাদের আসনের জন্য ব্যবস্থা করতে বললাম এবং সেই সময় আমি জেনারেল হামিদকে দেখলাম। আমি তাঁর সাথে কথা বললাম এবং সংক্ষেপে তাঁকে সেনা অভিযানে যা আসন্ন বোধ হচ্ছিল তার বিপদের ব্যাপারে ইঙ্গিত দিলাম। জেনারেল হামিদ কৌশলে এড়িয়ে গিয়ে উত্তর দিলেন, যাতে আমি সুনিশ্চিত হলাম যে, সেনা আক্রমণের জন্য জেনারেলরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা সত্য, বৈঠক শেষে জেনারেল ইয়াহিয়া মন্তব্য করেছিলেন যে, তাঁর জন্য অভিযানের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো পথ খোলা ছিল না। সুতরাং আমাদের ঢাকা ত্যাগ করা উচিত। এ মুহূর্তে আমি স্মরণ করতে পারছি না যে মাওলানা শাহ আহমদ নূরানী ঠিক কি মন্তব্য করেছিলেন এবং এটা বলা কঠিন যে মাওলানা জেনারেল ইয়াহিয়াকে এটা বলেছিলেন কিনা যে, জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডাকা তাঁর দায়িত্ব এবং বিষয়টা পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের উপর ছেড়ে দেয়া উচিত, যারা এ ধরনের ব্যবস্থার প্রস্তাব করছিলেন। ২৪ মার্চ খুব সকালে আমি বন্ধুর বাসায় গেলাম যেখানে আমি পূর্বে শেখ মুজিবের বিশেষ দূতের সাথে দেখা করেছিলাম। আমি সেই দূতকে সংবাদ পাঠিয়েছিলাম দেখা করার জন্য। যখন তিনি আসলেন আমি বললাম যে সেনাবাহিনী আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। তিনি বললেন যে আওয়ামী লীগ ইতোমধ্যেই এ ব্যাপারে অবহিত হয়েছে। আমি সেই ভদ্রলোককে অনুরোধ করলাম তিনি যেন শেখ মুজিবের সাথে দেখা করে [illegible] আমার ঐ কথা উনাকে জানান। উনাকে [illegible] আওয়ামী লীগের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠক সেই মুহূর্তে শুরু হতে [illegible] এবং বললেন তিনি

শেখ মুজিবকে আমার বার্তা পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসবেন। সকাল ১১-৩০ মিনিটে ফোনে আমি শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করলাম কিন্তু আমাকে জানানো হলো যে, তিনি তখনও বৈঠকে আছেন। যা হোক, ১৫ মিনিট পরেই তিনি আমাকে পালটা ফোন করলেন। তিনি বললেন তিনি আমার বার্তা পেয়েছেন, কিন্তু কিছু বলার থাকলে বলতে পারেননি। তিনি বোঝালেন আমার মি. দৌলতানা এবং খান ওয়ালী খানের সেই দিনই দুপুরে ঢাকা ত্যাগ করে চলে যাওয়া উচিত। কারণ, পরে বন্ধু ও শত্রুর সাথে পার্থক্য করা কঠিন হবে।

তিনি আরও বললেন পৃথিবীতে আমাদের দেখা নাও হতে পারে; তবে পরবর্তীতে হবে কারণ আমরা একসঙ্গে পাকিস্তান সৃষ্টি করেছিলাম। সুতরাং ১৯৭১ সালের ২৪ মার্চ বিকেলে আমরা ঢাকা ত্যাগ করলাম। আমরা যখন করাচি বিমানবন্দরে পৌঁছলাম তখন পিপিপির লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ করছিল। বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে আসতে আমাদের অনেক কষ্ট হয়েছিল।

(১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল, হামুদুর রহমান কমিশনের কাছে দেয়া সরদার শওকত হায়াতের বিবৃতি থেকে উদ্ধৃত)

তৃতীয় অধ্যায়
সংবাদপত্রের উক্তিসমূহ

১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যৌথ বৈঠকের বিবরণ
অচলাবস্থা নিরসনের জন্য ইয়াহিয়ার আহ্বান
ভুট্টোর উস্কানিমূলক আচরণের নিন্দা

গতকাল বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যৌথ সভা পিপলস্ পার্টি প্রধান মি. ভুট্টোর "দুই পাকিস্তান" পরিকল্পনার তীব্র নিন্দা করে এবং বলেন তার ব্যবহৃত পশ্চিম পাকিস্তান পরিভাষার কোনো অস্তিত্ব নেই।

পাকিস্তান জামায়াত-ই-উলামা দলের সংসদীয় নেতা মাওলানা শাহ আহমদ নূরানীর বাসভবনে যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা তিন ঘণ্টা স্থায়ী হয় এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ছাড়া সব রাজনৈতিক দলের MNA, MPA এবং প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত এবং জামায়াত-ই-উলামা দলের নেতা মাওলানা মুস্তফা আজহারী সভাপতিত্ব করেন।

প্রস্তাবের মাধ্যমে সভা স্থির করে যে মি. ভুট্টো পাঞ্জাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ, সিন্ধু অঞ্চলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার তাঁর দাবি শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। সভা গত মাসে লাহোরের জনসভায় তাঁর "শত্রুভাবাপন্ন ও উস্কানিমূলক আচরণ" এবং সংসদে অধিবেশন বর্জনের হুমকির জন্য নিন্দা জ্ঞাপন করে।

এতে বলা হয় যে, যেভাবে তিনি অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছেন তা "নিশাতার পার্কের" জনসভায় পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পেয়েছে এবং তাঁর আকাঙ্ক্ষা এবং উদ্দেশ্যও প্রকাশ পেয়েছে।

ইয়াহিয়ার নিকট আবেদন

সভা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবিলম্বে মি. ভুট্টোর ষড়যন্ত্রমূলক পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করে গণতান্ত্রিক নীতিমালার উপর নির্বাচিত প্রদিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কার্যকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য আবেদন করে।

(ডন, করাচি, ১৬ মার্চ, ১৯৭১)।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ, শেখ মুজিবের ঘোষণা
অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে
জনগণের দৃঢ়প্রত্যয় প্রশংসিত
বিবাদযুদ্ধ তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ, আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি

গতকালের রেডিও পাকিস্তানের প্রচারিত সংবাদ অনুযায়ী আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন যা তৃতীয় সপ্তাহে পদার্পণ করেছে। আজ পূর্ব পাকিস্তান শান্তিপূর্ণভাবে অতিবাহিত।

ঢাকায় একাধিক সভা সমাবেশ হয়েছে এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবের চার দফা দাবি সমর্থনে মিছিল বের হয়।

সকল সরকারি এবং আধা-সরকারি অফিস বন্ধ ছিল। শুধু সেই সব বিভাগ, অফিস ও সেবামূলক প্রতিষ্ঠান যেগুলোকে নির্দেশ থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে সেগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করেছে। আওয়ামী লীগ প্রধানের নতুন আদেশবলে আরও কিছু প্রতিষ্ঠানকে আজ থেকে কাজ করতে দেয়া হয়েছে।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক এবং অন্যান্য তফশিলি ব্যাংক আজ সকাল ৯টা থেকে ১২টা পর্যন্ত কাজ করেছে এবং ক্লিয়ারিং হাউসও খোলা ছিল। ব্যাংক এবং সংবাদ মাধ্যমের জন্য অভ্যন্তরীণ টেলিগ্রাফ দুপুর ৩টার পর কাজ করেছে।

শেখ মুজিব রোববার রাতে নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করলেন যা সোমবার থেকে অনুসরণ করা হবে।

তাঁর কর্মসূচিতে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "জনগণের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চলছে। বিশ্বের সর্বত্র যাঁরা স্বাধীনতাকে লালন করেন কিংবা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছেন আমাদের বিষয়কে তাদের নিজের করে দেখা উচিত। আমাদের জনগণ প্রমাণ করেছে কিভাবে দৃঢ়প্রত্যয়ী এবং ঐক্যবদ্ধ জনগণ বলপ্রয়োগ করে শাসন করার ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য দুর্গ গড়ে তুলতে পারে।"

"বাংলাদেশের জনগণ, সরকারি চাকরিজীবী, অফিস ও কারখানার শ্রমিক, কৃষক এবং ছাত্র এভাবে আন্দোলন করছে তারা বরং মরবে তবু পরাজয় মানবে না।"

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বললেন, "এটা দুঃখজনক যে এই পরিস্থিতিতেও কিছু অচিন্ত্যনীয় ব্যক্তি সামরিক আইন জারি করে বেসামরিক কর্মজীবীদের একটা

অংশকে ভয় দেখাচ্ছে।"

"আজ সমগ্র জনতা সামরিক আইনের কাছে নতিস্বীকার না করার জন্য একত্রিত। সুতরাং আমি ঐ সব ব্যক্তি যাদের বিরুদ্ধে সর্বশেষ নির্দেশ এসেছে, আহ্বান জানাচ্ছি যে, তারা যেন ভীত না হন। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ তাদের এবং তাদের পরিবারবর্গের পেছনে আছে।"

শেখ মুজিবুর রহমান বললেন, "বাংলাদেশে স্বাধীনতার স্পৃহা নেভানো যাবে না। আমাদের পরাজিত করা যাবে না। কারণ, আমাদের প্রত্যেকে প্রয়োজনে মরতে রাজি আছি যাতে আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধর সম্মান ও স্বাধীনতার সাথে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক হতে পারে।"

"আমাদের মুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত নতুন শক্তিতে সংগ্রাম চলতে থাকবে।"

"আমি জনগণকে সব ধরনের ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেছি এবং তাদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হলে তা সম্ভাব্য সকল উপায়ে প্রতিরোধ করতে বলেছি।"

নির্দেশাবলী :

নির্দেশ ১ : কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সচিবালয়, সরকারি এবং আধাসরকারি অফিসসমূহ, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের সকল আদালত নিম্নবর্ণিত বিশেষ নির্দেশাবলী সাপেক্ষে হরতাল পালন করবে এবং এ ব্যাপারে সময় সময় অব্যাহতি বা ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

নির্দেশ ২ : সমগ্র বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।

নির্দেশ নং ৯-এর অধীনে ডাকঘর এবং টেলিগ্রাফ অফিস শুধুমাত্র বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চিঠিপত্র, টেলিগ্রাফ ও মনিঅর্ডার কাজের জন্য খোলা থাকবে। কিন্তু সব ধরনের বৈদেশিক চিঠিপত্র বা বৈদেশিক টেলিগ্রাফ সরাসরি সংশ্লিষ্ট দেশসমূহে পাঠানো যেতে পারে।

অভ্যন্তরীণ টেলিপ্রিন্টার লাইন ১ ঘণ্টার জন্য দুপুর ৩টা থেকে ৪টা পর্যন্ত সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার এবং বৃহস্পতিবার খোলা থাকবে শুধুমাত্র নির্দেশ নং ২৫-এর আওতায় অনুমতিপ্রাপ্ত সংবাদসমূহ, ব্যাংককে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে আদান-প্রদানের সুযোগ দেয়ার জন্য।

অভ্যন্তরীণ সংবাদপত্রে তারবার্তাসমূহ শুধু পাঠানো যাবে।

নির্দেশ ১০ : বাংলাদেশের ভিতরে শুধু স্থানীয় ও আন্তঃজেলা সরাসরি টেলিযোগাযোগ কাজ করবে। টেলিফোনের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য

প্রয়োজনীয় বিভাগ খোলা থাকবে।

নির্দেশ ১১ : রেডিও, টেলিভিশন এবং সংবাদপত্রসমূহ কাজ করবে এবং জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কিত সকল বিবৃতি এবং সংবাদ প্রচার করবে। নতুবা ঐ সব সংস্থায় যারা কাজ করছেন তারা সহযোগিতা করবে না।

নির্দেশ ২৫-এর আওতায় ব্যাংকসমূহ যে সব কাজ পরিচালনা করবে তা হচ্ছে : যে-কোনো পরিমাণ জমা, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে-কোনো মাত্রায় ইন্টার ব্যাংক ক্লিয়ারেন্স, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ইন্টার ব্যাংক হস্তান্তর, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে টিটি বা মেল ট্রান্সফারের মাধ্যমে গ্রহণ এবং বিভিন্ন নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে টাকা-পয়সা লেনদেন।

পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত এবং জাতীয় ব্যাংক সমগ্র বাংলাদেশে টিটির উপর বাট্টা চালু রাখবে, এই ভিত্তিতে যে তা পরিশোধ করা হবে ঢাকায়।

যে সব ব্যাংকের প্রধান অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে তারা পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত এবং জাতীয় ব্যাংকে ঢাকায় পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল গঠন করবে।

বৈদেশিক ভ্রমণকারীদের চেক অনুমোদিত ডিলারদের কাছ থেকে ভাঙানো যেতে পারে এবং কূটনীতিকরা স্বাভাবিকভাবে তাদের হিসাব পরিচালনা করতে পারেন এবং বিদেশী নাগরিকগণ তাদের বৈদেশিক মুদ্রার হিসাব পরিচালনা করতে পারেন এবং তারা বৈদেশিক মুদ্রা গ্রহণ করতে পারেন।

কোনো লকারের ব্যবস্থা চালু থাকবে না। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে বা অন্য কোনোভাবে বাংলাদেশের বাইরে কোনো টাকা পাঠানো যাবে না।

সেই সব লাইসেন্সধারীদের বিপরীতে ঋণপত্র খোলা যেতে পারে যারা বিদেশ থেকে আমদানির জন্য বোনাস ভাউচার সমর্পণ করবে। বিনিময় দলিল (যেখানে মাল ইতোমধ্যে চালান করা হয়েছে) কার্যকরী থাকবে। বাকি রপ্তানি বিল ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক এবং ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হবে। এই বিষয়ে সেই সব ব্যাংকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা মেনে চলবে।

নির্দেশ ২৬ : উপরোল্লিখিত নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় ব্যাংক অন্যান্য সকল ব্যাংকের ন্যায় একই ব্যাংকিং এবং অফিস সময়সূচি মেনে চলবে এবং বাংলাদেশের সুষ্ঠু ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু রাখার জন্য সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য খোলা থাকবে।

পিপিপি ফরম বাবদ দেয়া যেতে পারে এবং ছাত্রদের জন্য ও অন্যান্য অনুমোদিত গ্রহীতার জন্য সকল অনুমোদিত টাকা প্ররণের অনুমতি দেয়া যেতে পারে।

নির্দেশ ২৮ : সকল ট্রাভেল এজেন্ট এবং বৈদেশিক এয়ার লাইন্স

অফিসসমূহ কাজ করতে পারে। তাদের বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যে-কোনো ব্যাংকে জমা দিতে পারে।

নির্দেশ ৩১ : (ক) পরবর্তী কোনো নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত জমির কোনো খাজনা নেয়া হবে না। বাংলাদেশের লবণ উৎপাদনের উপর কোনো আবগারী কর নেয়া হবে না। বাংলাদেশের উৎপন্ন কোনো তামাক পাতার উপর কর নেয়া হবে না। তাঁতিরা কোনো আবগারী কর ছাড়াই সুতা কিনতে পারবে এবং মিলগুলো ও ডিলাররা তাদের কাছে করমুক্ত মূল্যে সুতা বিক্রয় করবে।

খ) উপরোল্লিখতি বিষয় সাপেক্ষে, সকল প্রাদেশিক কর, যেমন প্রমোদ কর, হাট, বাজার, ব্রিজ এবং পুকুর থেকে আদায়কৃত কর বাংলাদেশ সরকারের হিসাব খাতে জমা দিতে হবে।

গ) নগর শুল্কসহ সকল স্থানীয় শুল্ক পরিশোধ করা হবে।

ঘ) সকল পরোক্ষ কেন্দ্রীয় শুল্ক যেমন—আমদানি-রপ্তানি শুল্ক, আবগারী শুল্ক, বিক্রয় শুল্ক যা এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংগৃহীত ও ব্যবহৃত হয়েছে তা এখন থেকে সংগ্রহকারী সংস্থা কর্তৃক সংগৃহীত হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের হিসাব খাতে জমা, হস্তান্তর বা পরিশোধ করা হবে না।

এভাবে সংগ্রহের মাধ্যমে আদায়, ইস্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক, ইস্টার্ণ ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেডের "বিশেষ হিসাব খাত"-এ জমা হবে। সেই ব্যাংকগুলো এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রদত্ত নির্দেশাবলী মেনে চলবে। সকল সংগ্রহকারী সংস্থা এই নির্দেশাবলী এবং এ ধরনের অন্যান্য নির্দেশাবলী, যা সময় সময় জারি করা যেতে পারে, তা কার্যকর করবে।

ঙ) পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত সরাসরি কেন্দ্রীয় শুল্ক যেমন—আয়কর আদায় করা হবে না।

নির্দেশ নং ৩২ ঃ পাকিস্তান ইনসিওরেন্স কর্পোরেশন কার্যকর থাকবে।

ডাক, জীবন বীমাসহ সকল বীমা কোম্পানি কার্যকর থাকবে।

নির্দেশ নং ৩৪ ঃ সকল বাসার ছাদে কালো পতাকা উত্তোলন অব্যাহত থাকবে।

(ডন, করাচি, ১৬ মার্চ, ১৯৭১)।

লাহোরে ১৯৭১ সালের ১৬ মার্চ কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রেসিডেন্ট মিঞা মুমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানার বিবৃতি সকলের দৃষ্টি ঢাকার দিকে এক দেশে দুটি বৃহৎ দলের প্রশ্ন আসে না

কাউন্সিল মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট মিঞা মুমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা দেখলেন যে, সকলের দৃষ্টি ঢাকার দিকে যেখানে পাকিস্তানের ১২ কোটি মানুষের আশা ও আলো আনার আকাঙ্ক্ষায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমান বৈঠক করছিলেন।

মি. দৌলতানা বলেন, তিনি ১৯ মার্চ সকালের বিমানে ঢাকা যাচ্ছিলেন যেখানে তিনি পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষার্থে শুভেচ্ছা ও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে তাঁর পক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা নেবেন। তিনি আশাবাদী ছিলেন যে এই শক্তি পাকিস্তানের বৃহত্তম দলের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

মি. ভুট্টোর সাম্প্রতিক বক্তব্য, 'পূর্ব পাকিস্তানের বৃহত্তম দল ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহত্তম দলের কাছে আলাদা আলাদা করে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত'-এর উপর মন্তব্য করতে গিয়ে মি. দৌলতানা বলেন, "যেহেতু একটিমাত্র পাকিস্তান এবং আল্লাহর রহমতে সর্বদাই এক পাকিস্তান থাকবে, এক দেশে দুটি বৃহত্তম দলের প্রশ্ন থাকতে পারে না। যদিও আমরা সকলে আশা করি যে রাষ্ট্রপরিচালনায় সকল বড় দলের মধ্যে সমঝোতা ও সহযোগিতা আছে।

তিনি বলেন, যখন জনগণের গণতান্ত্রিক ইচ্ছায় প্রত্যেক ব্যক্তির দেশ পরিচালনার জন্য বেড়ে উঠার সুযোগ আছে তখন কোনো ব্যক্তিকে তার নিজের খুশিমত দেশকে ভেঙে টুকরো টুকরো করার সুযোগ দেয়া যেতে পারে না।

মি. দৌলতানা বলেন, সবাই ঢাকার দিকে তাকিয়ে আছে যেখানে প্রেসিডেন্ট এক পাকিস্তানের অধীনে জনগণের সার্বভৌমত্বের জন্য অনেক কিছু করেছেন। শেখ মুজিবুর রহমান যিনি গত ২৮(?) বছর পাকিস্তানের সাথে সম্পৃক্ততা প্রমাণের জন্য অনেক কিছু করেছেন, তারা সমঝোতার শক্তিতে ১২ কোটি পাকিস্তানির আশা ও আলো ফিরিয়ে আনবেন যারা কায়েদে আজমের নেতৃত্বে অভিন্ন সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা এনেছিলেন।

তিনি তুলে ধরেন স্বাধীনতার প্রথম বীজটি ১৯০৬ সালে ঢাকায় বপন করা হয়েছিল।

তিনি আশা করেছিলেন যে, জাতীয় সংসদের দলীয় নেতারা যারা ১৩ মার্চ লাহোরে বৈঠক করেছিলেন তারাও ১৯ তারিখ বা সেই সময়ের দিকে ঢাকা যাবেন।

ডন, করাচি, ১৭ মার্চ ১৯৭১।

১৯৭১ সালের ১৮ মার্চ ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি তদন্ত কমিটি মেনে নিতে মুজিবের অস্বীকৃতি প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সফল হবে না

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ 'খ' এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি প্রত্যাখ্যান করেন। এই তদন্ত কমিটির উদ্দেশ্য ছিল পরিস্থিতি তলিয়ে দেখা, যার কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ২ মার্চ থেকে ৯ মার্চ পর্যন্ত বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী ডাকা হয়েছিল।

এখানে আজ এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান ঘোষণা দেন, বাংলাদেশের জনগণ এ ধরনের কমিশনকে কোনোভাবেই সহযোগিতা দেবেন না। তিনি আরও বলেন, যে-কেউ যেন এ ধরনের কমিশনের সদস্যের জন্য কাউকে দায়িত্ব প্রদান না করেন কিংবা কেউ যেন এর সদস্যপদের দায়িত্ব না নেয়।

সামরিক প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক পূর্ব পাকিস্তান হাইকোর্টের একজন বিচারক এই কমিশনের নেতৃত্বে থাকবেন এবং প্রধান বিচারক তাকে সেই দায়িত্ব প্রদান করবেন।

বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ নিম্নরূপ :

"আমি দুঃখের সাথে বলছি যে, তদন্ত কমিশন যা গঠন করা হয়েছে তা বাংলাদেশের জনগণের পক্ষ থেকে আমার প্রদত্ত দাবি পূরণ করতে পারবে না। এটা সামরিক আইনের তৈরি করা একটি প্রতিষ্ঠান এবং সামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে এর রিপোর্ট জমা দিতে হবে এটা অত্যন্ত আপত্তিকর। তাদের নির্দেশের শর্তাবলী অন্তত মৌলিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং প্রকৃত বিষয়ের তদন্ত বন্ধ করে দেয়া।"

সুপারিশের একমাত্র বিষয় হলো

"পরিস্থিতি তলিয়ে দেখা যার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসনের সাহায্যার্থে ২-মার্চ থেকে ৯ মার্চ-এর মধ্যে সেনাবাহিনীকে ডাকা হয়েছিল"। মৌখিক অধিকার এইভাবে পূর্ব নির্ধারিত। যেহেতু যা তলিয়ে দেখা দরকার ছিল,

তা হলো সেনাবাহিনী নিয়োগ, যা কোনো প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছিল, কোনো বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার জন্য নয়। কমিশন বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার প্রকাশিত ঘটনায় প্রকৃত গণহত্যার কারণ তদন্ত বন্ধ করেছে। এভাবে এমনকি নিরস্ত্র জনগণ নিহত হওয়ার বিবরণ কিংবা নিহতের সংখ্যা তদন্ত করা যায় না।

এ ধরনের কমিশন কোনো প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে কোনো কার্যকর তদন্ত হবে না বরং এটা জনগণকে ধোঁকা দেয়ার একটা হাতিয়ার হবে।

সুতরাং আমরা এ ধরনের কমিশন গ্রহণ করতে পারি না। বাংলাদেশের জনগণ এ ধরনের কমিশনকে সহযোগিতা করতে পারে না কিংবা এর সদস্য হতে পারে না।

১৯৭১ সালের ৭ মার্চ জনগণের পক্ষে আমরা চার দফা দাবি দিয়েছি যার একটি হলো উপযুক্ত সুপারিশ সহকারে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং প্রকাশ্য তদন্ত। এ দাবিগুলোর একটি নামমাত্র এবং খণ্ডভাবে গ্রহণ যেটিও কিভাবে হয়েছে তার উপরোল্লিখিত বিবরণ, এসব আমরা যে ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন তা সমাধান করতে পারবে না।

মুজিবের তদন্ত

ইতোমধ্যে শেখ মুজিব, পূর্ব পাকিস্তান সংসদের সংসদীয় নেতা ক্যাপটেন মনসুর আলী, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমেদ, চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মি. আবিদ রেজা খানকে সাম্প্রতিক গুলিবর্ষণ ও অন্যান্য দুর্ঘটনার সরেজমিন তদন্ত রিপোর্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন।

সেই অনুসারে তাঁরা পরিস্থিতি মূল্যায়ন ও রিপোর্ট করবেন। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এই মর্মে মওলানা ভাসানীও তাকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

(ডন, করাচি, ১৯ মার্চ ১৯৭১)।

১৯ মার্চ ১৯৭১ ঢাকায় শেখ মুজিবের সাংবাদিক সম্মেলন
ঢাকা আলোচনার সংকটজনক পরিস্থিতি
ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার পর উপদেষ্টাদের বৈঠক
আওয়ামী লীগ প্রধান পশ্চিম পাকিস্তানের যে-কোনো নেতার সাথে আলোচনার জন্য প্রস্তুত

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবের মধ্যে ভাগ্য নির্ধারণী আলোচনা পুনরায় রাষ্ট্রপতি ভবনে আজ শুরু হয়েছে। আলাপ ৯০ মিনিট স্থায়ী হয়। কাল সকাল দশটায় আরেক দফা আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ প্রধানের তিনজন উপদেষ্টা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে বৈঠক করেন।

বর্তমান শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা নিরসনের জন্যে আলোচনায় কোনো পন্থার কথা প্রস্তাব করা হয়েছে কিনা এটা যদিও আওয়ামী লীগ প্রধান বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের বলেননি তবুও উপদেষ্টাদের বৈঠক করা থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগ প্রধানের মধ্যে তৃতীয় দফা আলোচনার কিছু পথ তৈরি হয়েছে।

এটাও তাৎপর্যপূর্ণ যে উপদেষ্টাদের বৈঠকের পর আবারও প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে বৈঠক হবে। তখন মুজিবের সাথে তার দলের ছয়জন নেতা থাকবেন।

বৈঠক শেষে উৎফুল্ল শেখ মুজিবুর রহমান তার বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন, আলোচনা চলতে থাকবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের অবস্থান (সরাসরি শাসনতন্ত্র তৈরি) পরিষ্কার এবং সারা বিশ্ব জানে কেন বাঙালিরা ত্যাগ স্বীকার করেছে। তবে উনি এটাও বলেন যে, এটা একটা সহজ সমস্যা নয় এবং এটা সমাধানের জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রয়োজন।

অগ্রগতি

তৃতীয় দফা আলোচনার ফলাফল উপদেষ্টাদের মধ্যে বৈঠকের সিদ্ধান্ত এ সবকে বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনের জন্য সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি হিসাবে দেখা

হচ্ছিল। এর পাশাপাশি প্রেসিডেন্ট এবং শেখ মুজিবের মধ্যকার আলোচনা বর্তমান সংকট নিরসনের আশার সঞ্চার করেছে। কিন্তু একজন সাংবাদিক যখন শেখ মুজিবকে প্রশ্ন করেন বর্ণিত কার্যাবলী আলোচনায় অগ্রগতির কোনো প্রমাণ আছে কিনা। আওয়ামী লীগ প্রধান সাংবাদিককে বলেন, "আপনি আপনার নিজস্ব ধারণা করতে পারেন।"

তিনি আলোচনায় সন্তুষ্ট কিনা তাও বলতেন না। তিনি বলতেন আমি সন্তুষ্ট কিনা "আমি সর্বদাই বঞ্চিতদের জন্য সর্বোত্তম এবং উপযুক্ত বিধান আশা করি।"

কোনো বিশেষ পন্থা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে কিনা জানতে চাওয়া হলে শেখ মুজিব বলেন, "তার উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আলোচনা করবেন কি পন্থা তাঁরা বাতলান।"

জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের উপ-নেতা এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জেনারেল সেক্রেটারি মি. তাজউদ্দীন আহমেদ এবং ডঃ কামাল হোসেন আজ শেখ মুজিবের উপদেষ্টা হিসাবে কাজ করবেন।

খন্দকার মোশতাক আহমদ এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট মি. মনসুর আলী, সমগ্র পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মি. কামরুজ্জামান, ডঃ কামাল হোসেন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং মি. তাজউদ্দীন আহমেদ শেখ মুজিবের সাথে আগামীকাল রাষ্ট্রপতি ভবনে যাবেন।

এক প্রশ্নের জবাবে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত যে-কোনো নেতাকে তিনি সানন্দের সাথে গ্রহণ করবেন। তিনি ব্যক্তিগতভাবে যে-কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাকে তার বাসভবনে স্বাগত জানাবেন। "আমি তাদেরকে আসতে এবং আমার সাথে আলাপ করতে স্বাগত জানাচ্ছি।" যখন একজন সাংবাদিক জানতে চান তিনি সফররত পশ্চিম পাকিস্তানি নোতদের সাথে আলাপ করবেন কিনা তিনি উত্তর দেন।

তাঁর আলোচনায় কোনো দলের বিষয় স্থান পেয়েছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, "এই ধরনের কোনো কিছুই হয়নি।"

তিনি আরও বলেন, "আজ সন্ধ্যায় আমার উপদেষ্টারা সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আলোচনা করবেন যে, তাঁরা কি পন্থায় এবং কিভাবে এগুতে চান।"

আজকের আলোচনায় তার সাথে কোনো সহযোগী ছিলেন কিনা জানতে

চাওয়া হলে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট এবং মুজিব উভয়েই একা ছিলেন।

মি. ভুট্টোসহ পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে বৈঠক করার জন্য প্রস্তুত কিনা জানতে চাওয়া হলে শেখ মুজিব বলেন যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত যে-কোনো ব্যক্তিকেই স্বাগত জানানো হবে। তিনি বলেন, তাঁদের সাথে আলোচনায় তার কোনো আপত্তি নেই "আমার দরজা খোলা আছে।"

তিনি বলেন, "এটা কখনও বন্ধ করা হয়নি।" যখন আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে জানতে চাওয়া হয় তখন শেখ মুজিব বলেন, "আমার বলার কিছুই নেই। এটা আপনারা অনুমান করতে পারেন যে, যা কিছু আপনারা ধারণা করতে পারেন।"

যখন একজন সাংবাদিক শেখ মুজিবকে জিজ্ঞেস করেন আগামীকালের বৈঠক চূড়ান্ত পর্ব কিনা, তিনি তখন উত্তরে বলেন, "আমি বলতে পারি না।"

অন্য এক প্রশ্নের জবাবে আগামীকালের বৈঠকে কে হবে প্রেসিডেন্টের সহকারী সেই প্রসঙ্গে শেখ মুজিব বলেন, "আমি জানি না।"

"খ" এলাকার সামরিক আইন প্রশাসক কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিশন প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব তিনি এড়িয়ে যান।

যখন তিনি রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে আসেন তখন "জয় বাংলা" ধ্বনি দেন। এটা কি কোনো আশার সংকেত বহন করে? এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন তিনি সর্বদাই এই শ্লোগান উচ্চারণ করেন। তিনি মৃত্যুর সময় কালেমার সাথে এই শ্লোগানও উচ্চারণ করবেন। এর আগে আপাত দৃষ্টিতে উৎফুল্ল মনে আওয়ামী লীগ প্রধান রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে ৯০ মিনিটের বৈঠক শেষে সোজা গাড়ি চালিয়ে তাঁর বাসায় চলে যান।

কয়েক হাজার লোক যারা পুরো সময় ধরে রাষ্ট্রপতি ভবনে নিরাপত্তা এলাকার বাইরে অবস্থান করছিল, নিরাপত্তা বেষ্টনী ভঙ্গ করে শেখের গাড়ি ঘিরে ধরে। জনতার এত ভিড় ছিল যে অপেক্ষমাণ সাংবাদিকরা শেখ সাহেবের গাড়ির কাছে পৌঁছাতে পারেননি।

শেখ মুজিব গাড়ি থেকে নেমে এসে তাঁকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে লোকদের কাছে অনুরোধ জানালেন।

তিনি সাংবাদিকদেরও তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করেন। অনুরোধের প্রেক্ষিতে হাজার হাজার জনতা সেই স্থান ত্যাগ করেন এবং শেখ মুজিবের গাড়িকে গন্তব্যস্থলে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন।

অনেক উৎসাহী জনতা শেখ মুজিবের বাসার সামনেও আলোচনার ফলাফল

জানার জন্য সমবেত হয়।

যখন একজন বিদেশী সাংবাদিক জানতে চান যে, আলোচনার অগ্রগতি সম্বন্ধে সাংবাদিকদের কখন জানানো হবে? তখন শেখ বলেন, "অনুগ্রহপূর্বক অপেক্ষা করুন এবং দেখুন এই বিস্ময়কর দেশ এবং এর হতভাগ্য জনগণকে।"

কখন তিনি শেষ হাসি হাসতে যাচ্ছেন এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে শেখ সাহেব তাঁর প্রচলিত অট্টহাসি হেসে উত্তর দিলেন, "এর উত্তর দেয়া কঠিন। আপনারা নিজেরাই অনুমান করুন।"

(ডন, করাচি, ২০ মার্চ ১৯৭১)

২০ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান এসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে সাক্ষাৎকার
আশু সমাধানের জন্য দৌলতানার আহ্বান
মুজিব, ওয়ালীর সাথে বৈঠক

পাকিস্তান কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান মিঞা মুমতাজ মোহাম্মদ খান দৌলতানা পাকিস্তানের ঐক্য সংহত ও রক্ষা করা এবং দেশের গণতন্ত্রের জন্য আজ বর্তমান রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সমস্যাসমূহের আশু সমাধানের জন্য গুরুত্ব আরোপ করেন।

পাকিস্তান এসোসিয়েটেড প্রেসের সাথে এক সাক্ষাৎকারে মিঞা মুমতাজ দৌলতানা বলেন, "আমরা সকলে উদ্বিগ্ন।" তিনি বললেন, একটি সমঝোতায় পৌছানো উচিত যাতে পাকিস্তানের গণতন্ত্র ও ঐক্য, যা অর্জনের জন্য আমরা সকলে ১৯৪৭ সালে সংগ্রাম করেছি, এবং যার প্রথম বীজ ঢাকায় ১৯০৬ সালে বপন করা হয়েছিল, তা যেন রক্ষা পায় ও উন্নত হয়।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবের আলোচনার উল্লেখ করে কাউন্সিল মুসলিম লীগ প্রধান, যিনি গত সন্ধ্যায় লাহোর থেকে উড়ে ঢাকায় এসেছেন, বলেন, প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগ প্রধানের আলোচনার দিকে সবার দৃষ্টি চেয়ে আছে। মিঞা মুমতাজ দৌলতানা বলেন তিনি ব্যাগ্রভাবে প্রার্থনা করছেন সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জিত হোক এবং জাতীয় দেশপ্রেমিকদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হোক।

পরে সাংবাদিকদের মুফতী মাহমুদ বলেন, "আমরা রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করেছি" এবং "আলোচনা চলতে থাকবে। আমরা দেশের সংহতি ও অখণ্ডতা কামনা করি।"

চলমান রাজনৈতিক অচলাবস্থার নিরসনের জন্য তার কাছে কোনো পন্থা আছে কিনা জানতে চাওয়া হলে তিনি 'না' সূচক জবাব দেন। তবে তিনি বলেন, শেখ সাহেবের কাছে কিছু পন্থা থাকতে পারে। তিনি বলেন, "সমস্যা সমাধানের জন্য তার প্রচেষ্টাকে সহায়তা করার জন্য আমরা এখানে এসেছি।"

শেখ মুজিব এবং প্রেসিডেন্টের সংলাপের ব্যাপারে তিনি বলেন, সংলাপ চলবে এবং এই বলে মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকেন যে, এখন মন্তব্য করা অতি অগ্রিম হবে।

(মর্নিং নিউজ, করাচি/ঢাকা, ২১ মার্চ ১৯৭১)।

২২ মার্চ, ১৯৭১ ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা
জাতীয় সংসদ অধিবেশন পুনরায় স্থগিত

আজ বিকেলে রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে প্রচারিত ঘোষণা মোতাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেছেন।

সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় বলা হয়, "পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের নেতাদের সাথে পরামর্শক্রমে এবং রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতার ক্ষেত্র প্রসারিত করার সুযোগ দানের জন্য রাষ্ট্রপতি ২৫ মার্চের আহূত জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত করেছেন।" ঘোষণায় আরও বলা হয়, প্রেসিডেন্ট "শীঘ্রই জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবেন।"

জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতির ভাষণের কোনো তারিখ দেয়া হয় নি, জাতীয় সংসদ অধিবেশনের জন্য কোনো নতুন তারিখ ঘোষণায় ছিল না।

(পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ২৩ মার্চ ১৯৭১)।

২২ মার্চ ১৯৭১ তিনটি সংসদীয় দলের নেতাদের বিবৃতি
দৌলতানা, ওয়ালী, মুফতী স্থগিতের কারণে ক্ষোভ প্রকাশ করেন

জাতীয় সংসদের সংসদীয় দলের নেতারা উদ্বোধনী অধিবেশনের স্থগিতাদেশের বিরোধিতা করেন এবং বলেন যে, তাঁরা এখন বিশ্বাস করেন জাতীয় সংসদ হচ্ছে সকল জাতীয় সমস্যার আলোচনা ও সমাধানের স্থান।

তিন দলের নেতারা হচ্ছেন ন্যাপের খান আবদুল ওয়ালী খান, কাউন্সিল মুসলিম লীগের মিঞা মুমতাজ মাহমুদ খান দৌলতানা এবং জামায়াত-ই-উলামা-ইসলামের মাওলানা মুফতী মাহমুদ।

(পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ২৩ মার্চ ১৯৭১)।

২২ মার্চ ১৯৭১ : ঢাকায় জুলফিকার আলী ভুট্টো সাংবাদিক সম্মেলন আমাদের সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি

আজ পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জেড. এ. ভুট্টো বলেন, তারা প্রেসিডেন্ট এবং আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে চুক্তি পরীক্ষা করে দেখছেন এবং আশ্বস্ত করেন যে বর্তমান সংকট সমাধানের জন্য তার দল সমঝোতায় পৌঁছাতে প্রতিটি পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যাকে তিনি বণনা করেন "সর্বাত্মক দুর্ভাগ্যজনক ও দুঃখজনক।"

ঢাকা কন্টিনেন্টাল হোটেলের উপরের তলায় দ্রুত ডাকা সাংবাদিক সম্মেলনে মি. ভুট্টো বলেন, শেখ মুজিবের সাথে বৈঠকের সময় তার যে সমঝোতা হয়েছে এ ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট তাকে অবহিত করেছেন। প্রেসিডেন্ট তাঁকে এও বলেছেন যে, এই সমঝোতা নির্ভর করছে "আমাদের সমঝোতা"র উপর।

মি. ভুট্টো বলেন, রাষ্ট্রপতি ভবনে ত্রিপক্ষীয় বৈঠকের সময় তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে দেখা করেছেন। প্রেসিডেন্ট ছাড়া তিনি আলাদাভাবেও আওয়ামী লীগ প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেন— এই প্রশ্ন করা হলে তিনি তাকে এড়িয়ে যান।

তবে তিনি বলেন যে শেখ মুজিবের সাথে তার আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক বৈঠক হয়েছে। শেখের সাথে আরও একটি বেঠকের সুযোগকে তিনি স্বাগত জানাবেন।

মি. ভুট্টো বলেন, প্রয়োজন হলে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ তাঁর সাথে এখানে নেই তাঁদের সাথে পরামর্শের জন্য সর্বশেষ পরিস্থিতিতে তিনি করাচিতে উড়ে যাবেন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার উপর তাঁরা আলোচনা করছিলেন যা অবশ্যই স্থায়ী সমাধানের জন্য নেয়া উচিত। এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "আমরা এক পাকিস্তানের ভিত্তিতে চিন্তা করছি।"

বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি কোনো উপায়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিনা এরূপ এক প্রশ্নের জবাবে মি. ভুট্টো 'না' বোধক জবাব দেন এবং গুরুত্ব আরোপ করেন যে, আমাদের দুই (আওয়ামী লীপ এবং পিপলস্ পার্টি)-এর মধ্যে অবশ্যই একটি সমঝোতা থাকতে হবে।

পিপলস্ পার্টি প্রধান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে তাঁর সন্তোষজনক বৈঠক হয়েছে এবং তিনি তার সাথে আবারও বৈঠক করার আশা করেন। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ করে মি. ভুট্টো বলেন, "শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমার মধ্যে অবশ্যই সমঝোতা হতে হবে।"

তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার জন্য কাজ করছেন কিনা প্রশ্ন করা হলে মি. ভুট্টো বলেন তাঁরা দেশের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন এবং স্থায়ী উভয় ব্যবস্থার উপরই কাজ করছেন। তিনি আরও বলেন যে অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থায় সমস্যার স্থায়ী সমাধানের বিষয় বিবেচনায় নেবে।

জাতীয় সংসদ অধিবেশনে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবের চারটি পূর্বশর্ত সম্পর্কে মন্তব্য করতে বলা হলে মি. ভুট্টো বলেন, তাঁরা ঐগুলোর উপর এবং আরও অন্যান্য বিষয়ের উপর কাজ করছেন। তিনি পুনরায় বলেন, তাঁরা অন্তর্বর্তীকালীন ও স্থায়ী ব্যবস্থায় সমঝোতায় পৌঁছানোর জন্য কাজ করছেন।

পিপিপি প্রধান বলেন এখানে আগমনের পর গতকাল এবং আজ উভয় দিনই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করেন এবং শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্টের সাথে ১৫ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে আলাপ করেছেন বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন তিনি রাষ্ট্রপতির সাথে পুনরায় দেখা করার আশা করছেন।

মি. ভুট্টো বলেন তাঁর দল বর্তমান "দুর্ভাগ্যজনক" রাজনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য সমঝোতায় পৌঁছানোর ব্যাপারে প্রতিটি পদক্ষেপ নেবে। তিনি বলেন, "সমঝোতায় আসার জন্য আমরা আমাদের সাধ্যমতো সবকিছু করব" এবং আরও বলেন বাস্তবতা হচ্ছে, "শেখ মুজিবুর রহমান এবং আমাকে অবশ্যই সমঝোতায় আসতে হবে।"

জাতীয় সংসদ স্থগিতাদেশ

জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিতকরণ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে মিঃ ভুট্টো বলেন, "এটা হচ্ছে বাস্তব অবস্থা, আমি যা চেয়েছিলাম তা হচ্ছে ব্যাপক সমঝোতা ও চুক্তিতে পৌঁছানোর জন্য কিছু সময়।"

পিপলস্ পার্টি প্রধান বলেন, ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা হওয়া উচিত—দুটি হচ্ছে একদিকে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত "বৃহত্তর রাজনৈতিক দলসমূহ" এবং অন্যদিকে সেনাবাহিনী যারা ক্ষমতা হস্তান্তর করবে।

এক প্রশ্নের জবাবে মিঃ ভুট্টো বলেন, তাঁরা শেখ মুজিবের উত্থাপিত বিষয়গুলো "ঐগুলো ছাড়া অন্যান্য জিনিস ও তার ভবিষ্যৎ কাঠামো" নিয়ে আলোচনা করছেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের

মধ্যে ব্যাপক চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছে প্রশ্নে তার ধরন সম্পর্কে কথা বলতে মিঃ ভুট্টো রাজি হননি। তিনি বলেন, "আমি এখন কিছু বলতে চাই না।"

বাধাদান ক্ষমতা নেই

তিনি আওয়ামী লীগকে দেশের বৃহত্তর দল হিসাবে গণ্য করেন কিনা এই প্রশ্নের জবাবে মিঃ ভুট্টো বলেন, গতবার যখন তিনি এখানে এসেছিলেন তখন ইতোমধ্যে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আর এক প্রশ্নে, জবাবে তিনি বলেন, "আমি কোনো বাধাদান ক্ষমতা বহন করছি না এবং আমাদের কারোই বাধা দান ক্ষমতা নেই" এবং দুটি বৃহত্তর দল পিপলস্ পার্টি এবং আওয়ামী লীগের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য "আমরা কোনো উপায় উত্থাপন করিনি।"

তিনি বলেন, "আজ সকালে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার আশাব্যঞ্জক ও সন্তোষজনক বৈঠক হয়েছে। আমি আরও একটা বৈঠকের স্বাগত জানাবো।" তাঁরা আলাদা বৈঠক করেছিলেন কিনা প্রশ্ন করা হলে মিঃ ভুট্টো বলেন, যা শেখ মুজিব বলেছেন তার সাথে তিনি দ্বিমত চান না এবং সাংবাদিকদের এ বিষয়ে আর পীড়াপীড়ি না করার জন্য বলেন।

মিঃ ভুট্টো বলেন যে এখানে যতদিন প্রয়োজন তিনি অবস্থান করবেন। তিনি আরও বলেন, যদি প্রয়োজন হয় তবে তাঁর দলের নেতাদের সাথে পরামর্শের জন্য পশ্চিম পাকিস্তান যাবেন এবং আবার ফিরে আসবেন। তাঁর দলের লোকজনের সাথে এখানে ঢাকায় আলাপ করছিলেন এবং আরও বলেন, পিপিপি কেন্দ্রীয় কমিটির যে সব নেতা এখানে নেই তাঁদেরও পরামর্শের জন্য ঢাকায় ডাকা হতে পারে।

লাহোর প্রস্তাবের উপর এক প্রশ্নের উত্তরে মিঃ ভুট্টো অদ্ভুত ভৌগোলিক অবস্থানের পটভূমিতে বলেন, "এটা উপযুক্ত পরিবেশ নয়।" আমরা দেশের ভবিষ্যতের জন্য এবং উভয় অঞ্চলের জনগণের সন্তুষ্টির জন্য একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাই। তিনি আরও বলেন, "জনগণের মঙ্গলের জন্য উভয়কেই ক্ষমতা ব্যবহার করতে দেয়া হোক।"

(ডন, করাচি, ২৩ মার্চ ১৯৭১)

২২ মার্চ ১৯৭১ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বাণী

রাজনৈতিক সংকট সমাধান করা হবে: ইয়াহিয়া

রাষ্ট্রপতি জেনারেল এ এম ইয়াহিয়া খান বলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের অভিন্ন লক্ষ্যসমূহ একত্রিত করে সুষ্ঠুভাবে এবং সবাই মিলে একত্রে কাজ করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধিরা জন্য প্রস্তুত। পাকিস্তান দিবসের বাণীতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া জাতিকে স্মরণ করিয়ে দেন যে, বর্তমানে পাকিস্তান সংকটের মধ্যে আছে। তিনি বলেন, এই সংকটপূর্ণ সন্ধিক্ষণে যখন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, "আসুন আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি যাতে তিনি আমাদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন"।

প্রেসিডেন্টের বাণীর বিষয় নিম্নরূপ:

"এই ঐতিহাসিক দিনে, ৩১ বছর আগে আমরা আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির জ৽. শপথ নিয়েছিলাম। জনগণের ইচ্ছা ব্যক্ত করে কায়েদে আজম ঘোষণা করেছিলেন, পাকিস্তান সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য ইসলামিক নীতিমালার উপর ভিত্তি করে একটি গণতান্ত্রিক দেশ হবে। এর লক্ষ্য হবে গণতান্ত্রিক নীতিমালা মেনে চলা এবং পাকিস্তানের বৃহত্তর গৌরব ও অখণ্ডতার জন্য দেশের সব অবহেলিত জনগণ একসাথে বসবাস ও কাজ করবে।"

এই লক্ষ্য অর্জনে বর্তমান সরকার অবাধ ও মুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের নিকট শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর নিশ্চিত করার জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাজ করার জন্য যা পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অঞ্চলের অভিন্ন লক্ষ্যে সুষ্ঠুভাবে সবাই মিলে কাজ করার জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত। আজ আমাদের জাতির পিতা কর্তৃক অনুসৃত নীতিমালাসমূহের প্রতি নতুন করে উৎসর্গ করতে হবে যেমন: আমাদের শ্রেণীগত একতা, আমাদের অদৃশ্যে বিশ্বাস এবং আমাদের কার্যাবলী পরিচালনায় শৃঙ্খলা বজায় রাখা। আমরা যদি এসব নীতিমালা মেনে চলি যা আমাদের অস্তিত্বের সারমর্ম বহন করে এবং সহিষ্ণুতা ও সংযমের উদ্যমে কাজ করে। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানে আমরা সফল হব। গণতন্ত্রে ফিবে আসার যন্ত্রণায় অস্বস্তিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু আমরা যদি আমাদের লক্ষ্য ভুলে না যাই তবে কিছুই হারাবো না

"পাকিস্তান আজ সংকটের মধ্যে। এই ক্রান্তিলগ্নে যখন আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, আসুন আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি আমাদের যেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন।"

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

(পাকিস্তান টাইমস্, ২৩ মার্চ ১৯৭১)

২২ মার্চ ১৯৭১ ঢাকার জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ

শাসন করার অধিকার একমাত্র আমার আছে : মুজিব

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান আজ জনগণের প্রতি তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করে লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

তাঁর বাসভবনের সামনে বিপুল জনতাকে উদ্দেশ করে শেখ মুজিব বলেন, বাংলাদেশের জনগণ এখন ঐক্যবদ্ধ এবং এই জাগ্রত জনতাকে বুলেট বা বেয়োনেট দিয়ে দমানো যাবে না। "আমরা আশা করি আমরা জয়ী হবো।"

যে-কোনো আপসের বিরুদ্ধে জনতার উচ্চারিত শ্লোগানে শেখ বলেন, "যদি তারা আমাদের দাবি অনতিবিলম্বে মেনে নেয় তবে সম্ভবত এখনও আমরা বন্ধু হয়ে বাস করতে পারি।"

(আগে এক বৈদেশিক টেলিভিশন সংবাদদাতাকে তিনি বলেন; তিনি বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি লোকের প্রতিনিধি, সুতরাং তিনি নৈতিকভাবে এবং আইনগত একাই শাসন করতে পারেন)।

শেখ জনগণকে শৃঙ্খলা মেনে চলার আহ্বান জানান, কারণ কোনো জাতি ত্যাগ ও শৃঙ্খলা ছাড়া উন্নতি করতে পারে না।

তবে তিনি ২১ দিনের আন্দোলনে জনগণের শৃঙ্খলা ও দৃঢ় প্রত্যয়ের প্রশংসা করেন যা বিশ্বের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

যে সব ক্ষেত্রে টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছে সেগুলোকে কঠোরভাবে নিন্দা করেছেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, যখন জনগণের সরকার পূর্ব পাকিস্তানে বসবে তখন কাউকে অবৈধভাবে জেলে আটক রাখা হবে না।

কোনো ব্যক্তিকে হয়রানি ও বেত্রাঘাত করে নির্যাতন করাকে শেখ গুণ্ডামির সাথে তুলনা করেন এবং এ ধরনের বর্বর কাজের নিন্দা করেন।

আওয়ামী লীগ প্রধান এসব সমাজবিরোধীর ব্যাপারে সতর্ক থাকার জন্য জনগণকে আহ্বান জানান এবং সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ এসব ব্যক্তিকে ক্ষমা করবে না।

শেষে তাঁর দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করেন যে, চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। তিনি ঘোষণা করেন— "আমরা সঠিক এবং সম্মুখভাগে আছি এবং বিজয় আমাদের হবে।"

তিনি বলেন, কোনো শক্তি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে ঔপনিবেশিক নির্যাতন ও অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তির জন্য এবং তাদের অধিকার অর্জনের প্রত্যয় থেকে নড়াতে পারবে না।

তিনি বলেন, "আমাদের জনগণ তাদের ন্যায্য ও আইনগত অধিকারের জন্য রক্ত দিতে শিখেছে এবং কোনো ভয়ভীতি, অত্যাচার ও বল প্রয়োগ করে তা দাবানোর চেষ্টা ব্যর্থ হবে।"

এসব সংগঠিত সংস্থাগুলোর মধ্যে ছিল, "প্রাক্তন চাকরিজীবী সংস্থা, চার্টার্ড একাউনট্যান্ট এ্যাকশন কমিটি, এস.এস.সি. পরীক্ষার্থী, ওয়াপদা শ্রমিক ফেডারেশন, আইটিএ শ্রমিক ফেডারেশন, দোকান কর্মচারী এসোসিয়েশন এবং ভাসমান জনগণ সংস্থা।"

ইতোমধ্যে আজ এখানে এক বিশেষ বার্তায় শেখ ঘোষণা করেছেন যে, "আমাদের দাবি ন্যায্য এবং বিজয় আমাদের হবে।"

আজকের অধিকাংশ সংবাদপত্রে "বাংলাদেশের জন্য মুক্তি" বিশেষ শিরোনামে প্রদত্ত বাণীতে শেখ মুজিব বর্তমান সংগ্রামকে "সাত কোটি বাঙালির পূর্ণ মুক্তি" বলে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না হওয়া পর্যন্ত এই সংগ্রাম চলতে থাকবে" এবং আরও বলেন যে গুলি, বন্দুক বা বেয়োনেট দিয়ে বাংলাদেশের জনগণকে দাবানো যাবে না কারণ আজ তারা ঐক্যবদ্ধ।

"জয় বাংলা" বলে তাঁর বাণী শেষ করার সময় জোর দিয়ে বলেন, আমাদের লক্ষ্য অর্জনে "আমরা যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকবো।"

"বাংলাদেশের প্রতিটি বাড়িকে প্রতিরোধের শক্তিশালী দুর্গ হিসাবে গড়ে তুলতে হবে।"

সাংবাদপত্রগুলো অর্থনীতির উপর একটি এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দুটি যে বিশেষ সংবাদ প্রকাশ করেছে তার জন্য তিনি প্রশংসা করেন।

(মর্নিং নিউজ, করাচি/ঢাকা, ২৩ মার্চ ১৯৭১)।

২৪ মার্চ ১৯৭১ সালে বিভিন্ন নেতার বৈঠকের উপর প্রেস রিপোর্ট
উত্তপ্ত আলোচনা : কাইউম একটি সিদ্ধান্তের আভাস দেন

মঙ্গলবারের দিনটি একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক আলোচনার দিন ছিল যখন বর্তমান সংকট উত্তরণের পথে প্রেসিডেন্ট ও আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যকার সমঝোতার আলোকে নেতৃবৃন্দ একের পর এক বৈঠক করেন।

তিনজন আওয়ামী লীগ নেতা তাদের পার্টি কর্তৃক মনোনীত হয়ে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে গতকাল দুই দফায় সাক্ষাৎ করেন—একবার সকালে এবং আরেকবার সন্ধ্যায়। তারা পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদের মতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যকার সমঝোতার নীতিতে আলোচনা করেন। শেখ মুজিবুর রহমানের তিনজন উপদেষ্টার একজন জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ এবং অপর দুইজন সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও ডঃ কামাল হোসেন।

প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা জনাব এম, এম, আহমেদ গতকালের উপদেষ্টা পর্যায়ে আলোচনায় যোগ দেন। প্রেসিডেন্টের দলের অন্যরা হচ্ছেন বিচারপতি এ. আর. কর্নেলিয়াস, লে. জে. এস. জি. এম পীরজাদা ও কর্নেল হাসান।

খান আবদুল কাইউম খান প্রেসিডেন্টের অনুরোধে গতকাল ঢাকা পৌঁছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড, এ. ভুট্টোর সাথে পৃথক পৃথক ভাবে সাক্ষাৎ করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা জানেন যা এখন আলোচনা চলছে কিন্তু এই মুহূর্তে তা প্রকাশ করা যাবে না। তিনি এও বলেন, আলোচনার ফলাফল পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টায় প্রকাশ করা যেতে পারে। জনাব ভুট্টো গতকাল প্রায় সারাদিন তার হোটেলে বসে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে ব্যাপক সমঝোতার উপর পরীক্ষা করে কাটান তার দলের লোকদের সাথে। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট ছোট দলের প্রতিনিধি হিসাবে পাঁচজন নেতা আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে যৌথভাবে সাক্ষাৎ করেন এবং পরে ইয়াহিয়া খানের সাথে প্রেসিডেন্ট হাউসে সাক্ষাৎ করেন। এই পাঁচজন নেতা ছিলেন—কাইউম-মুসলীম লীগ সভাপতি, মিয়া মমতাজ

দৌলতানা, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সভাপতি, খান আবদুল ওয়ালী খান, জামিয়াতুল ওলেমা-ই-পাকিস্তান, সাধারণ সম্পাদক, মাওলানা মুফতী মাহমুদ, মাওলানা শাহ্ আহমেদ নূরানী ও সরদার শওকত হায়াৎ খান।

শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের পর মমতাজ দৌলতানা বলেন, তারা কোনো নির্দিষ্ট প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করেন নি। আলোচনা কতক্ষণ চলবে এর জবাবে মিয়া সাহেব বলেন, "আমরা মনে করি দেশের মঙ্গলের জন্য সবকিছু কয়েক মিনিটেই শেষ হওয়া উচিত।" তিনি আলোচনার ব্যাপারে আশাবাদী ছিলেন।

এই পর্যায়ে ভাবাবেগে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, "সবচেয়ে ভালো আশা করা যাক এবং সবচেয়ে খারাপের জন্য প্রস্তুত হোন।"

(মর্নিং নিউজ, করাচি ও ঢাকা, ২৫ মার্চ ১৯৭১)।

জনাব জেড, এ, ভুট্টোর সাক্ষাৎ
আমরা অগ্রসর হচ্ছি : ভুট্টো

পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড এ ভুট্টো আজ এখানে বলেন, তিনি সব সময়ই পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাসমূহের ব্যাপারে এবং এই প্রদেশ যে শোষিত হচ্ছে তা তিনি নিজেই স্বীকার করেন। তিনি বলেন, জাতির প্রতি তার একটা দায়িত্ববোধ আছে এবং সেই সাথে তিনি এক পাকিস্তানের প্রতি নিবেদিত।

আজ প্রেসিডেন্ট হাউসে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর হোটেলে ফিরে সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎকালে জনাব ভুট্টো বলেন, আলোচনায় অগ্রগতি হয়েছে। তিনি বলেন, আলোচনা চলছে এবং আমরা বেশ অগ্রসর হয়েছি।

এসোসিয়েট প্রেস অব পাকিস্তানের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো বলেন, প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টামণ্ডলী, অওয়ামী লীগ ও তার দল যৌথ অধিবেশনের ত্বরিৎ ব্যবস্থা নেবে কিন্তু ঠিক এ মুহূর্তে সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

সংবাদপত্রের সহযোগিতা কামনা করে পিপিপি প্রধান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি বেদনাদায়ক ও দুঃখজনক। পিপিপি প্রধান বলেন যে তার দলের কিছু লোক আজ বিকেলেই ঢাকা ছেড়ে গেছেন। তিনি বলেন, চলমান আলোচনায় তাদের প্রয়োজন নেই বিধায় তারা চলে গেছেন।

গতকাল বিকেলে জনাব ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, যতদিন প্রয়োজন ততদিন তিনি ঢাকায় থাকবেন। সকালে প্রেসিডেন্ট হাউসের উদ্দেশে হোটেল ত্যাগ করার ঠিক পূর্বমুহূর্তে পিপিপি প্রধান এক সাক্ষাৎকারে বলেন, তিনি এখনও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন নি যে তিনি কখন পশ্চিম পাকিস্তানে যাবেন পিপিপি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্য সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য। তিনি আবারও বলেন, তিনি এখানেই সবকিছু আলোচনা করবেন। বর্তমান রাজনৈতিক সংকটের সমাধানে জনাব ভুট্টো প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে যে ব্যাপক সমঝোতা ও বোঝাপড়া হয়েছে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে সোমবার সারারাত তার দলের লোকদের সাথে নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

ডন, করাচি, ২৫ মার্চ ১৯৭১

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় যৌথ বিবৃতির মূল বিষয়বস্তু এক ইউনিট পুনঃ প্রবর্তন করার বিরুদ্ধে ওয়ালী, মুফতী ও বেজেনজোর অবস্থান

মুফতী মাহমুদ সাধারণ সম্পাদক (জামিয়াত-ই-ওলেমা ইসলাম), খান আবদুল ওয়ালী খান, সভাপতি (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এবং জনাব গাওস বক্স বেজেনজো, সভাপতি (বেলুচিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি) এক যৌথ বিবৃতিতে স্বাক্ষর করে অভিযোগ করেন যে রাষ্ট্রশক্তিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করার এক অশুভ পরিকল্পনার মাধ্যমে পুনরায় এক ইউনিট চালু করার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে।

তারা বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট প্রদেশসমূহ যেমন সিন্ধু পুনরায় এক ইউনিট পদ্ধতি গ্রহণ করবে না এবং হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এর ফলে এই অঞ্চলে পুনরায় হিংসা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হবে। জনাব ভুট্টোর মতে, দেশে ক্ষমতার উৎস তিনটি— আওয়ামী লীগ, পিপিপি ও সেনাবাহিনী। ঐ তিনজন রাজনীতিবিদ জনাব ভুট্টোর এই অবস্থানের তীব্র সমালোচনা করেন। তারা বলেন, মারারক ভুল বোঝাবুঝির ভিত্তিতে জনাব ভুট্টোর এরূপ ধারণার উৎপত্তি, যা সমগ্র জাতিকে দেশের সত্যিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা দিতে ব্যর্থ হচ্ছে।

এক প্রদেশের উপর ভিত্তি করে আওয়ামী লীগের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে জনাব ভুট্টো মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। সেক্ষেত্রে মাত্র দুটি প্রদেশ পাঞ্জাব ও সিন্ধুতে বিজয় লাভ করে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের হয়ে কথা বলতে অবশ্যই এক ইউনিট প্রয়োজন হবে অথচ সেখানে এক ইউনিটের অবস্থান নেই চারটি প্রদেশ।

নিম্নে বিবৃতির মূল বিষয়বস্তু ঃ-

পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান বলেন, বর্তমান অচলাবস্থার নিরসন কেবলমাত্র গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলসমূহ ও সামরিক শাসনের মাঝে এক বোঝাপড়ার মাধ্যমেই সম্ভব এবং তিনি পুনরায় তার তত্ত্ব মনে করিয়ে দেন, দেশে কেবলমাত্র তিনটি শক্তিই ক্ষমতার উৎস—আওয়ামী লীগ, পিপলস্ পার্টি ও সেনাবাহিনী। এই মারাত্মক ভুল বোঝাবুঝির দ্বারা

দেশের সত্যিকার অবস্থান দেশবাসী বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে।

অপরদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনায় যা ছিল তা হচ্ছে—পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভেঙে দেয়াসহ সমগ্র দেশের পাঁচটি প্রদেশের জন্য এক স্বাধীন-সার্বভৌম সংসদ প্রতিষ্ঠা করা যা "এক মানুষ এক ভোটের উপর ভিত্তি হবে।" এই প্রথম পাকিস্তানের জনগণ তাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সংসদে পাঠাতে সবকিছু নিয়ে এগিয়ে আসল গণতন্ত্রের স্বার্থে। অপরদিকে সূক্ষ্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই পরিকল্পনাকে ধ্বংস করতে সবকিছুই করা হচ্ছে।

জাতীয় সংসদ কর্তৃক জাতীয় সরকার গঠনের পরিবর্তে জাতীয় সংসদের বিকল্প পথ ধরে এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং রাষ্ট্রশক্তিকে দুটি ধারায় বিভক্ত করা হচ্ছে পরিকল্পিত উপায়ে। দেশে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টির দ্বারা এমন এক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনার মধ্যে ঠেলে দেয়া হচ্ছিল যা দ্রুত বন্ধ করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এক প্রদেশের উপর ভিত্তি করে আওয়ামী লীগের জাতীয় পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা মেনে নিতে জনাব ভুট্টোর কষ্ট হচ্ছিল অথচ তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের চারটি প্রদেশের মাত্র দুটিতে মোটামুটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের সকল প্রদেশের পক্ষে কথা বলেন, যেখানে এক ইউনিটের অস্তিত্ব ছিল না। তার নিজের যুক্তিতেও জনাব ভুট্টো বেলুচিস্তানের কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না, যেখানে তার দল জাতীয় কিংবা প্রাদেশিক পরিষদে কোনো সদস্য লাভে ব্যর্থ হন।

"আমরা হুঁশিয়ার করে দিতে চাই যে, কেউ যদি কোনোভাবেই এক ইউনিট পদ্ধতি পুনঃপ্রবর্তন করতে চায় তাতে বিভিন্ন অঞ্চলের জনগণের মধ্যে তিক্ততা ও বিদ্বেষ বাড়বে এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি হুমকির মুখে পড়বে।

(মর্নিং নিউজ, করাচি ও ঢাকা, ২৫ মার্চ, ১৯৭১)

২৪ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় সংবাদ বিজ্ঞপ্তি
জনগণকে সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তাজউদ্দীন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমেদ জনবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে যে-কোনো আত্মত্যাগ করার জন্য জনগণকে প্রস্তুত থাকতে বলেন।

এখানে আজ রাতে এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে তিনি বলেন, "সৈয়দপুর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য স্থানে সেনাবাহিনীর হামলার যে খবর আসছে তা আমি গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি। রংপুরে সান্ধ্য আইন জারি করার মতো অসংখ্য দুর্ঘটনার খবর আসছে। মিরপুরে উত্তেজনা বিরাজ করছে। এসব কার্যকলাপ এক অস্বাভাবিক ও উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

এটা দুঃখজনক যে একদিকে আওয়ামী লীগকে ইয়াহিয়া খানের সাথে আলোচনা চালিয়ে যেতে বলা হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশ পরিস্থিতি কার্যকলাপের মাধ্যমে ঘোলাটে করা হচ্ছে।

আমরা পুনরায় জোর দিয়ে বলছি যে, একটা রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিতে যে-কোনো প্রচেষ্টা হবে হঠকারিতার শামিল। বাংলাদেশের জাগ্রত জনগণ তা মেনে নেবে না। আমরা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই যাতে একটা রাজনৈতিক সমাধানের পথে পরিস্থিতি কোনোভাবেই ঘোলাটে করা না হয়।

জনবিরোধী শক্তির ষড়যন্ত্রকে পরাস্ত করতে যে-কোনো আত্মত্যাগের জন্য জনগণকে সদা সতর্ক ও প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানাই।"

(ডন, করাচি, ২৫ মার্চ ১৯৭১)

২৪ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় জনসভার রিপোর্ট
সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে মুজিবের হুমকি

আজ আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান "বাংলাদেশ" জনগণের উপর একতরফা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেয়ার যে-কোনো প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী দেন এবং বলেন, "আমরা তা বরদাশত করব না।"

তিনি বলেন, "আমাদের দাবি স্পষ্ট এবং এ দাবি তাদের মানতে হবে"। তার বাসভবনের সামনে বিশাল সমাবেশে বক্তৃতাকালে শেখ মুজিব ঘোষণা দেন যে, জনতা জাগ্রত হয়েছে ও ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, "পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাদের দাবিয়ে রাখতে পারবে না।" তিনি বলেন, "যদি কেউ জনগণের ন্যায্য দাবি দাবিয়ে রাখতে চোখ রাঙায় আমরা তাদের বরদাশত করব না।" তিনি বলেন, আমরা শান্তিপূর্ণ সমাধান চাই কিন্তু কেউ যদি তা না চায় তারা আমাদের দাবিয়ে রাখতে সমর্থ হবে না। তিনি আরও বলেন যে আমি আশা করি আপনারা কেউ এই চেষ্ট, করবেন না। শেখ মুজিব বলেন, লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার হুমকি

যাঁই হোক, তিনি জনগণকে তাদের সংগ্রামের নিয়মনীতি মেনে চলতে বলেন। তিনি বলেন, কিছু লোক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে আন্দোলন বানচাল করার চেষ্টা করছে। তাদের হাতে অনেক কিছু করার আছে। এ ধরনের অপচেষ্টা সৈয়দপুরে করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

তিনি ঐ ধরনের লোকদের হুঁশিয়ার করে দেন যে, তাদের ঐ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে কারণ বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। তিনি বলেন, কোনো ধরনের ষড়যন্ত্র দ্বারা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। শেখ মুজিব বলেন, "শক্তির কাছে আমরা মাথা নত করব না। আমরা বাংলাদেশের মানুষকে মুক্ত করব"। তিনি ঘোষণা দেন যে আমাকে কেউ কিনতে পারবে না। তিনি বলেন, শহীদের রক্তের সাথে অন্য কেউ বেঈমানি করলেও আমি করব না, জনগণ শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেবে না।

তিনি জনগণকে আন্দোলন চালিয়ে যেতে বলেন এবং যে-কোনো পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন।

তিনি বলেন, "আমি জানি না সংগ্রাম আরও জোরদার করার জন্য হুকুম দিতে আমি বেঁচে থাকব কিনা। তোমরা তোমাদের অধিকার আদায় না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। "তিনি জনগণকে শক্তির নিকট মাথা নত না করতে বলেন এবং শক্তির মোকাবিলার আহ্বান জানান।

মুহুর্মুহু শ্লোগানের মধ্যে তিনি ঘোষণা করেন, তিনি বন্দুকের গুলির মুখোমুখি হতে সব সময় প্রস্তুত, কিন্তু কখনও সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে দাস হয়ে থাকতে দেবেন না। তিনি আবারও উল্লেখ করেন, বাঙালিরা আর অবিচার সহ্য করার জন্য প্রস্তুত নয়। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "হয় আমরা মানুষের মতো হয়ে বাচঁবো নয় তো আমাদের দাবির জন্য প্রাণ দিয়ে লড়ে যাব।"

তিনি আবেগপূর্ণ বক্তৃতায় জনসাধারণকে এক চরম সংগ্রামের জন্য তৈরি থাকতে বলেন। তিনি বলেন, "আমি যদি হুকুম দিতে না পারি তোমরা তোমাদের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাথে সংগ্রাম চালিয়ে সাড়ে সাত কোটি বাঙালিকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিও।"

(ডন, করাচি, ২৫ মার্চ ১৯৭১)।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায়
জনাব জেড এ ভুট্টোর সংবাদ সম্মেলন
পিপিপিআওয়ামী লীগ সরাসরি আলোচনা জরুরি

পাকিস্তান পিপিলস পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড এ ভুট্টো গোলাম মোস্তফা খানকে সাথে নিয়ে প্রেসিডেন্ট হাউসে ইয়াহিয়া খানের সাথে আজ সকালে দেখা করেন। প্রেসিডেন্টের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার লে. জে. এস. জি. এম. পীরজাদাও ঐ মিটিংয়ে ছিলেন। মিটিং প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা স্থায়ী হয়।

পরে জনাব ভুট্টো সাংবাদিকদের বলেন, তার দলের সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞরা আজ বিকেলে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে দেখা করবেন। গতকাল শেখ মুজিবুর রহমান ও প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাক্ষাতের পর নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে পিপিপির উপদেষ্টাদের সাথে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টামণ্ডলীর সাক্ষাৎসূচি বাতিল হয়ে যায়, যা সকালে হওয়ার কথা ছিল। তিনি বলেন, তার কাছে সর্বশেষ যে নতুন পরিস্থিতির খবর এসেছে, তাতে প্রেসিডেন্ট ও লে. জে. পীরজাদার সাথে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

আলোচনায় অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব ভুট্টো বলেন, 'না।' তিনি বলেন, আমরা কোনো অসুবিধা সৃষ্টি করছি না। পিপিপি প্রধান একজন সাংবাদিককে বলেন, তার দল একই সাথে কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর চাচ্ছে।

স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে জনাব ভুট্টো বলেন, আওয়ামী লীগ যে পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন চাচ্ছে তা স্বায়ত্তশাসন অপেক্ষা বেশি কিছু। এই স্বায়ত্তশাসনকে তিনি স্বাধীনতার সীমায় ছোঁয়া বলে উল্লেখ করেন।

জনাব ভুট্টো বলেন, বৈদেশিক সাহায্য ও বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত আমরা ছয় দফার কাছাকাছি আসতে প্রস্তুত। আমরা সম্পূর্ণরূপে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম যে, এক পাকিস্তানের কাঠামোয় হাজার মাইল ব্যবধানে বিভক্ত একটা অনুন্নত দেশ কীভাবে এসব পরিচালনা করবে। আমি আওয়ামী লীগের কাছে ব্যাখ্যা চেয়েছিলাম কিন্তু আওয়ামী লীগ ব্যাখ্যা দিতে অস্বীকার করে। আমরা আমাদের খোলা মন নিয়ে আলোচনা করছি।

•

এক ইউনিট

জনাব ভুট্টো পরিষ্কার করে বলেন, তার দল কোনো পরিস্থিতিতেই পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট পুনঃপ্রবর্তন কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

পিপিপি প্রধান বলেন, যদি কোনো সমঝোতা বা চুক্তি হওয়ার পরিস্থিতিতে পৌঁছায় তবে তা জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করে পাস করিয়ে সাংবিধানিক বৈধতা নেয়া যেতে পারে। তিনি আরোও বলেন জাতীয় সংসদ সমঝোতার আরোও উন্নতি সাধন করতে পারবে। ভুট্টো প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা ও শেখ মুজিবুর রহমানের গতকালের বিষয় উল্লেখ করে বলেন, পরিস্থিতির কিছু উন্নতি হওয়ায় তার সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও লে. জে. পীরজাদার আজ সাক্ষাৎ প্রয়োজন।

তিনি বলেন, তার দলের কিছু সদস্যকে আজ করাচি পাঠানো হয়েছে। কেননা সরাসরি আলোচনা হচ্ছে না। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাতের কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলেন, আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে।

আলোচনা ধীর ও ক্লান্তিকর কেন হচ্ছে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব ভুট্টো বলেন, তারা মাত্র প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে একবার সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি মনে করিয়ে দেন যে, এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। আমরা এ সংকট থেকে মুক্তি পেতে চাই। জনাব ভুট্টো একজন সংবাদদাতাকে বলেন, দেশের ভবিষ্যৎ সংবিধান অবশ্যই ফেডারেল কাঠামোর ওপর ভিত্তি করে হতে হবে, যেখানে সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনের ন্যায্য অংশ থাকবে।

তিনি উল্লেখ করেন, ছাত্রদের ১১ দফার ১ দফা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের এক আঞ্চলিক ফেডারেশনের জন্য। আওয়ামী লীগ কখনোই এটাকে পুনরায় সংশোধন করেনি।

অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব ভুট্টো বলেন যদি সবকিছু দুএকদিনে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তবে তিনি ঢাকায় অবস্থান করবেন। অন্যথায় তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যাবেন। কেননা সেখানে তার উপস্থিতি খুবই জরুরি।

জনাব ভুট্টো বলেন, উভয় পক্ষেরই সমান সুযোগ-সুবিধা পাওয়া উচিত। মীমাংসার ব্যাপারটা প্রায় জটিল হয়ে আসছে। কেননা প্রকৃতপক্ষে আলাপআলোচনা তেমন হচ্ছে না এবং দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হচ্ছে পরিস্থিতি অনিশ্চিত মনে হচ্ছে।

. **আওয়ামী লীগ ফর্মুলা**

পিপিপি চেয়ারম্যান বলেন, জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ব্যাপক বোঝাপড়ার ভিত্তিতে যে ফর্মুলা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে উপস্থাপন করেন তাতে তার কোনো আপত্তি নেই।

পিপিপি প্রধান প্রেসিডেন্ট হাউসে প্রেসিডেন্টের সাথে চতুর্থ দফা সাক্ষাতের পর ফিরে এসে সাংবাদিকদের বলেন, বর্তমান অচলাবস্থা নিরসনে আওয়ামী লীগ ও পিপলস্ পার্টির মধ্যে সরাসরি আলোচনা দরকার। আর এ কারণে তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন। তবে এরূপ অনুরোধ তেমন কোনো ফল বয়ে আনেনি। যাহোক, তিনি পুনরায় বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এমনকি এ অবস্থায়ও দেখা করতে ইচ্ছুক, যাতে কোনো আপসরফার মাধ্যমে দূরত্ব কমিয়ে আনা যায়।

একজন সংবাদদাতার এক প্রশ্নের জবাবে পিপিপি প্রধান বলেন, তিনি যখন শেখ মুজিবুর রহমানের চার দফা নীতিগতভাবে আগেই সমর্থন দিচ্ছেন সেখানে তার দল ছয় দফার কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, তার দল একটা মীমাংসায় পৌঁছাতে বাস্তবিকই আগ্রহী, কিন্তু অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা উভয়পক্ষেরই পাওয়া দরকার।

তিনি মনে করেন, যেহেতু আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্টের ও তার উপদেষ্টামণ্ডলীর সাথে আলোচনা শেষ করেছে পিপিপি অবশ্যই এখন তার আলোচনা শুরু করতে পারে। কাজেই এটা জরুরি নয় যে আলোচনা ঢাকাতেই হোক।

কিছুকিছু ব্যাপার যা দুটি দলের মধ্যে আলোচনাপর্যালোচনার প্রয়োজন ছিল, এ প্রসঙ্গে পিপিপি প্রধান উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সংবিধান রচনায় অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দেন কেন্দ্রে নয়, ক্ষমতা হস্তান্তর করুন প্রদেশসমূহে। তিনি উল্লেখ করেন, পিপিপি মনে করে ক্ষমতা একই সাথে উভয়স্থানেই হস্তান্তর হওয়া উচিত।

(দি পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ২৬ মার্চ ১৯৭১)।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে লাহোর কাউন্সিল
মুসলিম লীগ সভাপতি মিয়া মমতাজ খান দৌলতানার ঘোষণা
জাতীয় সংসদকে দুভাগে বিভক্তির বিরুদ্ধে কাউন্সিলে মুসলীগ লীগ

মিয়া মমতাজ খান দৌলতানা বৃহস্পতিবার লাহোরে বলেন, তিনি জাতীয় সংসদকে দুভাবে বিভক্ত করে এক অংশ পূর্ব পাকিস্তান ও অপর অংশ পশ্চিম পাকিস্তান করার তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করেন, জাতীয় সংসদ জাতীয় ঐক্য ও সংহতির প্রতীক এবং সামগ্রিকভাবে জাতীয় সার্বভৌমত্বের প্রতিচ্ছবি এবং অবিভাজ্য।

সরদার শওকত হায়াত খান ও পীর সৈয়দ সাইফুদ্দিনকে সাথে নিয়ে ঢাকা থেকে লাহোর ফিরে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন। জনাব দৌলতানা ও সরদার শওকত হায়াত খান উভয়েই আভাস দেন যে, জাতীয় সংসদকে বিভক্ত করার চিন্তাভাবনা ঢাকাতেই আলোচনা হয়েছে। তবে কোন পক্ষ বা কারা এ পক্ষে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানাতে অপারগতা প্রকাশ করে। জনাব দৌলতানা বলেন, যদি সকল দল এর পক্ষে মত দেয় তবুও কাউন্সিলে মুসলিম লীগ এর তীব্র বিরোধিতা করবে।

জাতীয় সংসদকে বিভক্ত করার পরামর্শ আওয়ামী লীগ না পিপলস্ পার্টির পক্ষ থেকে এসেছে এ প্রশ্নের জবাবে জনাব দৌলতানা বলেন, বিশেষ মহলে আলোচনা হয়েছে। তিনি বলেন, জাতীয় সংসদের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া উচিত।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকার

জনাব দৌলতানার মতে ছোট দলগুলো জাতীয় সংসদের অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন অপেক্ষা সংবিধান তৈরিতে বেশি আগ্রহী ছিল। তিনি বলেন, কাউন্সিল মুসলিম লীগ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে তারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দিতে মোটেই আগ্রহী নয়। তাদের মতে, ক্ষমতা যদি হস্তান্তর করতেই হয় তবে একই সাথে কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহে তা করা উচিত।

বর্তমান সংকটের সন্তোষজনক সমাধানের ব্যাপারে তিনি আশাবাদী কি না জানতে চাওয়া হলে জনাব দৌলতানা বলেন, তিনি দেশের ঐক্য সংহতির জন্য

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছেন। কিন্তু তিনি জানান, পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ এবং দেশের ঐক্য প্রকৃতপক্ষে অনিশ্চয়তার মাঝে রয়েছে। তিনি বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এবং ছোট দলগুলোর নেতাদের সাক্ষাৎ করলে শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট বলেন, তিনি পাকিস্তানকে ধরে রাখতে চান। তিনি উল্লেখ করেন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রকৃতপক্ষে আওয়ামী লীগের চরমপন্থিদের দ্বারা প্রচণ্ড চাপের মধ্যে আছেন এবং যার ফলে সামগ্রিক অবস্থা সম্পর্কে কিছুই বলা যাচ্ছে না। তার মতে, চরমপন্থি তারাই, যারা পাকিস্তান রাষ্ট্রে বিশ্বাস করে না বা তারা পাকিস্তানি ছিল না। অপর এক প্রশ্নের জবাবে জনাব দৌলতানা বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন এবং তাদের তার দলের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

(পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ২৬ মার্চ ১৯৭১)

২৪ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায়
জনাব তাজউদ্দীন আহমদের দেয়া বিবৃতি
পরিস্থিতি ঘোলাটে হচ্ছে

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ গত রাতে রংপুর, চট্টগ্রাম ও অন্যান্য জায়গায় সেনাবাহিনীর হামলায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

জনাব তাজউদ্দীন এক বিবৃতিতে বলেন, রংপুরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে এবং গুলিতে সেখানে অসংখ্য হতাহতের খবর পাওয়া গেছে। তিনি আরো উল্লেখ করেন, মিরপুরে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে এবং এসব কার্যকলাপ অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ক্ষোভের সাথে জনাব তাজউদ্দীন বলেন, যখন রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্টের সাথে আলোচনা চলছে ঠিক সেই মুহূর্তে দুঃখজনক ঘটনা দ্বারা পরিবেশপরিস্থিতি ঘোলাটে করা হচ্ছে।

(দি পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ২৬ মার্চ ১৯৭১)

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমানের দেয়া বিবৃতি

আওয়ামী লীগের দাবি মেনে নেয়াটাই এখন একমাত্র সমাধান

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান পুনরায় জোর দিয়ে বলেছেন পৃথিবীর কোনো শক্তিই পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ন্যায্য ও আইনসঙ্গত অধিকার দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আওয়ামী লীগ প্রধান তার ধানমণ্ডি বাসভবনে আগত অসংখ্য মিছিলের এক সমাবেশে বক্তৃতাদানকালে বলেন, আমার দাবি ন্যায্য ও স্পষ্ট এবং এ ন্যায্য দাবি গ্রহণ ছাড়া অন্য কিছুই নয়। তিনি পূর্ব পাকিস্তানের এই আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আগুন নিয়ে খেলবেন না, এতে দেশটির ভয়াবহ পরিণতি হতে পারে।

তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি মানুষের নজিরবিহীন ঐক্য তাদের আইনসম্মত অধিকারকে মেনে নিতে বাধ্য করবে। কোনো শক্তিই এ অধিকারকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। আমরা কারো চোখ রাঙানিকে সহ্য করব না।

শেখ মুজিব জোর দিয়ে বলেন, বাঙালি হয় স্বাধীন দেশের নাগরিক হয়ে বাঁচবে অথবা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, তবু অসত্যের কাছে মাথানত করবে না।

আজ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের কর্মচারীরা হোটেলের পতাকা উত্তোলনের প্রধান দণ্ডটির মাথায় আগের পতাকা সরিয়ে বড় আকৃতির জয় বাংলা পতাকা আনুষ্ঠানিকভাবে উত্তোলন করে। ১০০´´ X ৬০´´ আকৃতির নতুন পতাকাটি বিদেশী সাংবাদিকসহ অগণিত মানুষের উপস্থিতি এবং চট্টগ্রাম, সৈয়দপুর ও রংপুরের পরিস্থিতি নিয়ে তার দলের প্রথমসারির নেতাদের সঙ্গে একের পর এক বৈঠক করেন।

(মর্নিং নিউজ, করাচি ও ঢাকা, ২৬ মার্চ, ১৯৭১)।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় দেয়া শেখ মুজিবের বিবৃতি সেনা অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে মুজিবের ২৭ মার্চ হরতাল আহ্বান

মুজিব আজ সৈয়দপুর, রংপুর এবং জয়দেবপুরে সাধারণ মানুষের ওপর গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ ২৭ মার্চ সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী সাধারণ হরতালের ডাক দেন।

এক বিবৃতিতে তিনি ঘোষণা দেন, যে নিরস্ত্র জনসাধারণের ওপর এরূপ বর্বর হত্যাকাণ্ড বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেতে দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, সেনাবাহিনীর হামলায় আমি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছি। তিনি বলেন, এসব ঘটনা ঘটছে এমনই এক সময় যখন প্রেসিডেন্টকে আহ্বান জানাই। আমার আত্মবিশ্বাস আছে, বাংলাদেশের সাহসী জনগণ তাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে যেকোনো পরিণামের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত। তিনি আরো বলেন এভাবেই বাংলাদেশর জনগণ শৃঙ্খলমুক্ত হবে।

তবে হরতাল চলাকালীন নিম্নবর্ণিত বিভাগসমূহকে অব্যাহতি দেওয়া হলো

হাসপাতাল অ্যাম্বুলেন্স, ডাক্তারের গাড়ি, ওষুধের দোকান, সংবাদপত্র অফিস ও তার যানবাহন, পানি, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবারাহ। অপর এক সংবাদে বলা হয়, শেখ মুজিব আজ জনগণকে তাদের অধিকার আদায়ে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত থাকতে আহ্বান করেন। রায়েরবাজার থেকে আগত এক বিশাল মিছিলের উদ্দেশ্যে জনগণকে অধিকার আদায়ে শেষবারের মতো আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন্ এগিয়ে নিয়ে চলছে, তাতে যেন কোনোভাবেই শিথিলতা না আসে। তিনি বলেন, বাঙালিরা প্রত্যেক বছর বন্যা ও ঘূর্ণঝড়ে মরছে। তিনি বলেন, মনে হচ্ছে তারা এসব দুর্যোগে মরার জন্য জন্মেছে।

(দি পাকিস্তান টাইমস্, লাহোর, ২৬ মার্চ ১৯৭১)।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সালে ঢাকায় সংবাদপত্রে দেয়া বিবৃতি
বিলম্বে রাজনৈতিক সমাধানে মুজিবের দুঃখ প্রকাশ
বাঙালি ও মোহাজিরদের বিভক্ত করার
প্রচেষ্টাকে নিন্দা জানানো হয়

আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বর্তমান সংকটের রাজনৈতিক সমাধানে বিলম্ব হওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং এটাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, যদি প্রেসিডেন্ট ও তার উপদেষ্টারা একটা রাজনৈতিক সমাধানে ইচ্ছুক হন তবে তাদের উচিত আর সময়ক্ষেপণ না করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। আর দেরি হলে দেশ ও দেশের মঙ্গল হবে না।

গত রাতে সংবাদ মাধ্যমে দেয়া এক বিবৃতিতে আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, 'আমরা আমাদের কর্তব্য শেষ করেছি এবং রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়েছি। তিনি অনুধাবন করেন, কোনো কোনো মহল জনবিরোধী শক্তির মাধ্যমে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টিতে সাহায্য করছে, কিন্তু এ ধরনের কোনো ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তারা কৃতকার্য হতে পারবে না। সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও তাদের আত্মত্যাগের দৃঢ়তার সামনে কোনো শক্তিই কাজে আসবে না।

আওয়ামী লীগ প্রধান বলেন, প্রেসিডেন্টের ঢাকা আগমন ও পরবর্তীসময়ে তার আলাপ-আলোচনা থেকে জনগণ আশাবাদী হয় এবং এ কারণে আমি প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করি। কিছু মৌলিক নীতি যার ওপর ভিত্তি করে সমস্যার সমাধান হতে পারে তা প্রেসিডেন্টের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। পরবর্তী সময়ে আমার সহকর্মীরা প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাদের সাথে আমাদের দেয়া ঐ নীতিমালার ওপর কাজ করতে বসেন। আর এভাবে আমাদের কর্তব্য সম্পন্ন করি এবং রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করি। বিলম্ব হওয়ার কোনো কারণ বা যুক্তি দেখি না। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, রাজনৈতিক সংকট সমাধানে দুঃখজনকভাবে বিলম্ব করা হচ্ছে। সেনাবাহিনীর বর্বরোচিত কার্যকলাপে পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটেছে, যার খবর সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংবাদ মাধ্যমে আসছে।

অস্থানীয়দের নিয়ে বিতর্ক

যেটা সবচেয়ে বেশি নিন্দনীয় বা গর্হিত কাজ তা হচ্ছে কোনো মহলকে নিয়োজিত করে স্থানীয় ও অস্থানীয়দের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করা। আমি পুনরায় জোর দিয়ে, যারা বাংলাদেশে ব্যবসা করছে তাদের জন্মস্থান যেখানেই হোক না কেন তারা আমাদের লোক এবং তাদের উচিত সেরূপ নিজেদের বিবেচনা করা এবং বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সম্পূর্ণরূপে নিজেদের সম্পৃক্ত করা। তাদের জীবন, সম্পদ আর সম্মান আমাদের পবিত্র আমানত। কাজেই যারা এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টিতে প্ররোচিত করছে তারা রাজনৈতিক সমাধানের পথ বন্ধ করতে হীন পন্থাকে অবলম্বন করে নিরীহ জনগণের ওপর শক্তি প্রয়োগ করার অজুহাত তৈরি করছে।

আমাদের বীর জনগণকে আমি সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানাই। যা হোক আমাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড স্বাভাবিকভাবে চলতে থাকবে এবং মিল কলকারখানার প্রত্যেকে তার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করে সর্বোচ্চ উৎপাদন অর্জনে স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখতে তারা অবশ্যই সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

আমাদের আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে যাবে। আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার এ নির্দেশ ১৪ মার্চ ১৯৭১ দেয়া হয়েছে, যা কার্যকর হতে থাকবে এবং তার কার্যকারিতা বহাল রাখতে সময় সময় নির্দেশ দেয়া যাবে।

(ডন, করাচি, ২৬ মার্চ ১৯৭১)।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রেস রিপোর্ট

২৬ মার্চ ১৯৭১ সালে ইয়াহিয়ার দেয়া বেতার ভাষণের মূল অংশ :
নিম্নে জাতির উদ্দেশে দেয়া ইয়াহিয়া খানের বেতার ভাষণ :

প্রিয় দেশবাসী,

আস্‌সালামু আলাইকুম,

আমি এ মাসের ৬ তারিখে জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনের জন্য নতুন তারিখ হিসেবে ২৫ মার্চ ঘোষণা দিয়েছিলাম এই আশায় যে, নির্ধারিত দিনে অধিবেশন বসতে সঠিকভাবে পরিস্থিতি অনুকূলে থাকবে। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ ঐ আশাকে যুক্তিসঙ্গত করতে পারেনি। জাতি চরম সংকটের মোকাবিলা করতেই থাকে।

পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্য করার মতো নোংরা কার্যকলাপ শুরু হয় এবং পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর হয়ে ওঠে। ঘটনাপ্রবাহ খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে এবং যথাশিগগির সম্ভব পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে একের পর এক বৈঠক করি এবং পরবর্তী ১৫ মার্চ আমি ঢাকা গমন করি। আপনারা অবগত আছেন যে, আমি রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করতে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করেছি। পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে শলাপরামর্শ করার পর মতৈক্যে পৌঁছানোর বিভিন্ন দিকগুলোকে চিহ্নিত করতে ও একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাধানে পৌঁছাতে ওখানেও আমাকে একই রকম পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন ছিল।

শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আমার আলোচনার অগ্রগতি সময় সময় সংবাদপত্র ও অন্যান্য সংবাদ মাধ্যমে এসেছে। শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে আলোচনার এক বিশেষ পর্যায়ে আমি পশ্চিম পাকিস্তানি নেতাদের সাথে ঢাকায় আরেক দফা আলোচনা করার প্রয়োজন আছে বলে বিবেচনা করি। জনাব ভুট্টো এখানে ২১ মার্চ পৌঁছান এবং তার সাথে বেশ কয়েকবার সাক্ষাৎ করি।

আপনারা ভালোভাবে অবগত আছেন যে, আওয়ামী লীগ জাতীয় সংসদে বসার আগেই সামরিক আইন তুলে নিতে ও ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অনুরোধ জানায়। আমাদের আলোচনায় তিনি প্রস্তাব করেন যে, অন্তর্বর্তী সময় পরিচালিত হবে আমার একটি ঘোষণা দ্বারা, যা সামরিক আইনের স্থলাভিষিক্ত

হবে, প্রাদেশিক সরকার গঠিক হবে এবং জাতীয় পরিষদ দুটি কমিটি আকারে বৈঠকে বসবে—একটি পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে, আরেকটি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে।

একটি শর্ত :

বৈধতার দিক ও অন্যান্য দিক বিবেচনায় এ পরিকল্পনায় বেশকিছু মারাত্মক ক্রুটি থাকা সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের স্বার্থে আমি নীতিগতভাবে তার পরিকল্পনায় রাজি হতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু এক শর্তে, যা আমি শেখ মুজিবুর রহমানকে পরিষ্কার করে ব্যাখ্যা করেছিলাম, তা হচ্ছে আমি প্রথমে অবশ্যই সকল রাজনৈতিক নেতার সাথে এ পরিকল্পনায় স্পষ্ট করে সমঝোতায় পৌঁছাতে চাই। আমি অবিলম্বে এ প্রস্তাবটি নিয়ে অন্যান্য নেতার সাথে আলোচনা করি। তাদের সকলের অভিমত হচ্ছে প্রস্তাবিত ঘোষণা দেয়ার বৈধ ক্ষমতা আমার নেই। এরূপ কর্মকাণ্ড সামরিক আইনের আওতায়ও আসে না বা জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলনের ওপরও ভিত্তি করে না। এতে একটি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শূন্যতা বিরাজ করবে এবং বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তাদের বিবেচনায় ঘোষণার মাধ্যমে জাতীয় সংসদকে দুটি ভাগে বিভক্ত হলে দেশটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার মানসিকতাকে উৎসাহিত করা হবে। তারপর তারা মতামত দেন যে, যদি সামরিক আইন তুলে নেয়া হয় এবং অন্তর্বর্তীকালীন সময় ক্ষমতা হস্তান্তরে ইচ্ছা থাকে তবে জাতীয় সংসদ অধিবেশন ডেকে উপযুক্ত অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান বিল পাস করুক এবং আমাদের সম্মতির জন্য উপস্থাপন করুক। আমি তাদের মতামতকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে তাদের অনুরোধ করি এ ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করার জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে বলাতে। তারা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ করতে ও তাকে পরিস্থিতি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে রাজি হলেও, তারা ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপনায় তার সম্মতি আদায়ে চেষ্ট করলেন না।

প্রথম থেকেই জাতীয় সংসদকে দুটি ভাগে বিভক্ত করার শেখ মুজিবের চিন্তাভাবনায় রাজনৈতিক নেতারা অত্যন্ত শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। তারা অনুধাবন করেন যে, এ ধরনের পদক্ষেপ পাকিস্তানের অখণ্ডতার সম্পূর্ণ পরিপন্থি। পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির চেয়ারম্যান জনাব জেড এ ভুট্টো আমার, শেখ মুজিবুর রহমান ও তার মধ্যকার এক বৈঠকেও অনুরূপ মতামত পেশ করেন।

যে সকল রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে এ বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে যান তারা ২৩ মার্চ সন্ধ্যায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং জানান

যে, শেখ মুজিব তার পরিকল্পনায় যেকোনো প্রকার পরিবন আনতে সম্মত হননি। শেখ মুজিব প্রকৃতপক্ষে চাচ্ছিলেন যে, আমি ঘোষণা দিয়ে সামরিক আইন তুলে দিই এবং ক্ষমতা হস্তান্তর করি।

শেখ মুজিবুর রহমানের অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার প্রক্রিয়া রাষ্ট্রদ্রোহিতার শামিল। তিনি ও তার দল তিন সপ্তাহ ধরে আইনশৃঙ্খলা অমান্য করে চলেছেন। তারা পাকিস্তানের জাতীয় পতাকার অবমাননা করেছে এবং জাতির পিতার ছবি বিকৃতি করেছে। তারা দেশে একটি সমান্তরাল সরকার চালানোর চেষ্টা করছে। তারা সন্ত্রাস, বিক্ষোভ ও নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আন্দোলনের নামে অসংখ্য ব্যক্তিকে হত্যা করেছে। আমাদের লাখ লাখ বাঙালি ভাই ও যারা পূর্ব পাকিস্তানে স্থায়ীভাবে বাস করছে তারা আজ আতঙ্কের মাঝে দিন কাটাচ্ছে এবং অবগণিত লোক প্রাণের ভয়ে ঐ অঞ্চল ত্যাগ করছে।

পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী সদস্যদের নানাভাবে উত্ত্যক্ত ও অবমাননা করা হচ্ছে। প্ররোচনার মুখে চরম সংযম ধারণ করে সেনাসদস্যরা যে উদাহরণ সৃষ্টি করেছে, আমরা তার প্রশংসা করি। তারা যে নিয়মানুবর্তিতা প্রদর্শন করেছে তা প্রকৃতপক্ষে প্রশংসাযোগ্য। আমি তাদের জন্য গর্ববোধ করি।

যুক্তপূর্ণ সমাধান

শেখ মুজিব ও তার সহযোগীদের বিরুদ্ধে কয়েক সপ্তাহ আগে আমার পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত ছিল। কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে আমার পরিকল্পনা যাতে কোনোরূপ নস্যাৎ না হয় সেই লক্ষ্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আমি সর্বাত্মক চেষ্ট করেছি। আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদে তাদের একের পর এক অবৈধ কার্যকলাপ সহ্য করেছি এবং একই সাথে কিছু যুক্তিপূর্ণ সমাধানে পৌঁছানোর সম্ভাব্য সকল রাস্তা খুলে রেখেছি। আমি আগেই উল্লেখ করেছি আমার ও বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের প্রচেষ্টা ছিল কীভাবে শেখ মুজিবুর রহমানকে যুক্তিগুলো বোঝানো যায়। আমরা কোনো চেষ্টাই বাকি রাখিনি। কিন্তু শেখ মুজিব কোনো রকম গঠনমূলক পদ্ধতিতে সাড়া দেননি। অপরদিকে তিনি ও তার অনুসারীরা এমনকি ঢাকায় আমার উপস্থিতিতেও সরকারের কর্তৃত্বকে অবজ্ঞা করেছেন। তার প্রস্তাবিত ঘোষণাটি ছলনা ছাড়া কিছুই না। শেখ মুজিব দেশটির সংহতির অখণ্ডতার ওপর আঘাত হেনেছেন, এ অপরাধ বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দেয়া হবে না।

আমরা কিছু ক্ষমতালোভী দেশদ্রোহী লোককে এ দেশটি ধ্বংস করতে ও

১২ কোটি লোকের ভাগ্য নিয়ে খেলা করতে দেব না।

৬ মার্চ জাতির উদ্দেশে দেয়া আমার ভাষণে আপনাদের বলেছিলাম পাকিস্তানের অখণ্ডতার সংহতি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয়ার দায়িত্ব পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। আমি তাদের কর্তব্য পালনে হুকুম দিয়েছিলাম যাতে সরকারের কর্তৃত্ব বজায় থাকে।

আজ সারাদেশে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমি দেশে সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করেছি। রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমি সংবাদপত্রের ওপর সম্পূর্ণ Censorship আরোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এসব সিদ্ধান্ত অনুসরণ করতে খুব শিগগিরই সামরিক আইনের ব্যবস্থাপনার ঘোষণা দেয়া হবে।

একটাই উদ্দেশ্য

পরিশেষে আমি আপনাদের নিশ্চিত করতে চাই যে, আমার প্রধান লক্ষ্য একটাই, আর তা হচ্ছে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর। যত শিগগিরই পরিস্থিতি অনুমোদন করবে আমি এই লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করব। আমি আশাবাদী যে পূর্ব পাকিস্তানে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে আসবে এবং আমরা আবার আমাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সামনের দিকে এগিয়ে যাব।

আমি দেশবাসীকে পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুধাবন করার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি। আল্লাহতালা আপনাদের সাথে আছে। আল্লাহতালা আপনাদের মঙ্গল করবেন।

পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।

(ডন, করাচি, ২৭মার্চ ১৯৭১)।

গণহত্যার নির্দেশের সূচনা

(এই প্রবন্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির সাবেক অধ্যাপক এবং শেখ মুজিবুর রহমানের একজন উপদেষ্টা অধ্যাপক রেহমান সোবহান ইয়াহিয়া-মুজিব আলোচনার পটভূমি বর্ণনা করেছেন।)

একটি সংযুক্ত পাকিস্তানের শেষ আশা নিয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৫ মার্চ রাতে ঢাকা ছেড়ে উড়ে চলে যান। শেষ দুদিন তিনি ঢাকা সেনানিবাসে সেনানায়কদের সাথে ছিলেন। পাকিস্তান যাদের দ্বারা শাসিত হতো তারা ঢাকার অপারেশন জিনোসাইডের জন্য শেষ প্রস্তুতির খুঁটিনাটি দিকগুলো দেখাচ্ছিল।

আইউবের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদের সত্যিকার শক্তির আভাস সেনাবাহিনী যখন তার তখন থেকেই গত দু বছর ধরে আকস্মিক যুদ্ধের পরিকল্পনার ওপর ব্যাপক কাজ করা হয়। এই সময় সেনাবাহিনীর শক্তিকে এক হতে তিন ডিভিশনে ও একটি সাঁজোয়া ব্রিগেড স্থাপন করা হয়। এই পরিকল্পনাকে সক্রিয় করতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় সম্ভবত ১ মার্চ ও ৬ মার্চের মাঝে কোনো একসময় এবং এর প্রতীকস্বরূপ লে. জে. ইয়াকুব খানকে সরিয়ে ৭ মার্চ পাঞ্জাবি সেনানায়কদের মধ্যে সবচেয়ে ক্রুদ্ধ হিসেবে বিবেচিত জেনারেল টিক্কা খানকে বসানো হয়।

এ সময় তারা বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের পেছনে অভিভূত করার মতো যে জনসমর্থন আছে সেটা ভালোভাবেই অনুমান করতে পেরেছিল। এক সপ্তাহের কম সময়ে ইয়াহিয়া কর্তৃক সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার বিরুদ্ধে মুজিবের শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের ডাক কেবল দেশটির পূর্ব অঞ্চলে ইয়াহিয়ার কর্তৃত্বের ধ্বংস করেনি বরং সরকারি কর্মচারী, পুলিশ প্রশাসন মুজিবের নিকট আনুগত্যের অঙ্গীকার দেয়।

সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের অবজ্ঞা করা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করতে সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্তকে ভুট্টোর সাথে যৌথ ষড়যন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী লে. জে. ওমর জানান যে. পশ্চিম অঞ্চলের অন্য নেতারা ভুট্টোর সাথে যোগ দিয়ে সংসদ বর্জনের জন্য তাদের ওপর চাপ সৃষ্টি করে, যা এ ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

একইভাবে সংসদ অধিবেশনে স্থগিত করার সিদ্ধান্তকে ভুট্টোর অবস্থানকে

রক্ষা করার প্রচেষ্টা হিসেবে দেখা হয়, যখন এই কৌশল পশ্চিম অঞ্চলের সমর্থন আদায়ে ব্যর্থ হয়. তখন অনেক বাঙালিই এ অবস্থায় অনুধাবন করল যে, কেবল এক পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর বাইরেই বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার সম্ভব।

এরূপ মেজাজের মুখোমুখি অবস্থানে মুজিব তার রাজনৈতিক জীবনে প্রথম বাজি ধরেন ৩ মার্চের জনসভায়। তারপর ৭ মার্চের ১০ লাখ লোকের জনসভায় যখন তিনি স্বাধীনতার দাবিকে পাশ কাটিয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের আলোচনার দিকে এগিয়ে যান। ঐদিন অর্থাৎ ৭ মার্চ মুজিব স্বাধীনতা ঘোষণা দিতে পারে এরূপ চিন্তা মাথায় রেখে ঢাকার সেনাবাহিনী ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের জন্য প্রস্তুতি নেয়। সেনানিবাসের চারদিকে মেশিনগান স্থাপন করা হয় এবং ট্যাঙ্ক বাহিনী প্রস্তুত থাকে। বিমানবাহিনীকে সতর্ক অবস্থায় রাখা হয়েছিল।

মুজিব কর্তৃক খোলামেলা প্ররোচনার অস্বীকৃতি এবং পূর্ব অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের সম্পূর্ণ অবক্ষয়ের মুখে ইয়াহিয়াকে মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য আপসপূর্ণ মনোভাব অবলম্বন করতে দেখা গেল। তিনি ১৫ মার্চ এক ঝাঁক সেনানায়কসহ ঢাকায় উড়ে আসেন। সেনানায়কের কয়েকজন নিজেদের গোপন করে ঢাকা সেনানিবাসে বসে ২৫ মার্চের রাতে যুদ্ধ পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেন।

সেনাসদস্যরা প্রত্যহ সাদা পোশাকে পিআইএর বাণিজ্যিক ফ্লাইটে আসতেই থাকে এবং তা ২৫ মার্চ পর্যন্ত রসদ ও অস্ত্রসহ এক ডিভিশন উন্নীত হয়। ইতিপূর্বে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত সেনাবাহিনীর ক্ষমতা যদি অপর্যাপ্ত হয়ে থাকে সে দিকটা বিবেচনায় এনে একটি নৌবাহিনীর জাহাজে আরোও সেনাসদস্য ও ভারী সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর বন্দোবস্ত করা হয়। সেনা অভিযানকে সহজ ও গ্রহণযোগ্য করার পন্থা হিসাবে শহরে বিশেষ বিশেষ নির্ধারিত এলাকায় সাদা পোশাকে বিশেষ কমান্ডো ইউনিটের সদস্য দ্বারা গোলযোগ সৃষ্টি করা হতো। এরূপ কৃত্রিম প্ররোচনা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা আরো জরুরি হয়ে পড়েছিল যখন ইয়াহিয়া দেখল আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় নিজেদের নিয়ন্ত্রণ বেড়েছে। তখন চট্টগ্রামে ২ ও ৩ মার্চের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছাড়া সেনাবাহিনী দ্বারা আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত পূর্ব পাকিস্তানের আর কোনো জায়গায় কোনোরূপ গোলযোগ ছিল না।

পঞ্চম অধ্যায়

হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত

ইয়াহিয়ার অবশ্যই জানা উচিত ছিল যে, তিনি সংযুক্ত পাকিস্তানের শেষ আশাটুকু ধ্বংস করতে যাচ্ছেন। ২৫ মার্চ রাতে মুজিব একজন পশ্চিম পাকিস্তানি দর্শনার্থীকে বলেন, এক পাকিস্তান ধরে রাখতে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। কিন্তু ইয়াহিয়া সামরিক শক্তি দিয়ে সমাধান চাচ্ছেন এবং এতেই পাকিস্তান শেষ হয়ে যাবে। তিনি মনে করেন তিনি মৃত্যুবরণ করবেন, তবে একটি স্বাধীন বাংলাদেশ তার কবরের ওপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

(গার্ডিয়ান, ম্যানচেস্টার, ৫ জুন, ১৯৭১)

হামুদুর রহমান কমিশনের রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত :

৬৫। ২৩ মার্চ ১৯৭১ জেনারেল ইয়াহিয়া দশমবারের মতো ঢাকায় নেতৃবৃন্দের সম্মেলন ডাকলেন। আবারও মুজিব যোগদান করতে অস্বীকৃতি জানালেন এবং তারপর জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫ মার্চ সংসদ অধিবেশনের জন্য ধার্য করলেন। ১৫ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন কিন্তু তাঁর সকল সহযোগী তার সাথে এলেন না এবং সেদিনই তিনি মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠক করলেন। এটা একটা অদ্ভুত ধরনের আলাপ ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়ার উপস্থিতিতে বিভিন্ন দল বৈঠকে বসেনি। তবে তিনি আলাদা আলাদাভাবে তাঁদের সাক্ষাৎ নিয়েছিলেন। এটা ছিল যেন একদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া বিভিন্ন দলের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী, অন্যদিকে তিনি ক্ষমতাধর ব্যক্তি ছিলেন যেই ক্ষমতা চলছিল। তবে মাত্র একবার ব্যতীত কোনো সময়ই শেখ মুজিব এবং ভুট্টো একে অপরের সাথে কিংবা রাষ্ট্রপতির সাথে একসাথে বৈঠক করেননি। ১৯৭১ সালের ১৫ মার্চ যখন মুজিবুর রহমান জেনারেল ইয়াহিয়ার সাথে দেখা করেন তখন বৈঠকের প্রথম অধ্যায় শুরু হয়।

৬৬। ইতিমধ্যে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি কর্তৃপক্ষের আয়ত্তের সম্পূর্ণ বাইরে চলে যায় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ভেঙে পড়ে। ক্রমান্বয়ে সরকারের প্রকৃত ক্ষমতা শেখ মুজিবুর রহমান আয়ত্ত করছিলেন। এ সময় তিনি এক রাশি নির্দেশাবলী ঘোষণা করেন, যার প্রথমটি ছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চের ঘোষণা, যেটাকে শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলন বলে বর্ণনা করা হলো এবং এটা ১৯৭১ সালের

২ মার্চ থেকে শুরু হয়ে ততদিন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা হলো যতদিন না সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়। এই নির্দেশাবলি এখানে উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ :

১. কর দেয়া বন্ধ থাকবে
২. সচিবালয়, সরকারি এবং আধাসরকারি অফিস, হাইকোর্ট এবং বাংলাদেশের অন্যান্য আদালত হরতাল পালন করবে। সময় সময় প্রয়োজনীয় অব্যাহতি ঘোষণা করা হবে।
৩. রেলওয়ে এবং বন্দর কাজ করতে পারবে। তবে যদি জনগণের বিরুদ্ধে নিপীড়নের জন্য সৈন্যদের একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় তবে রেলশ্রমিক ও বন্দর শ্রমিকরা সহযোগিতা করবে না।
৪. রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্র আমাদের বিবৃতির পুরো অংশ প্রচার করবে এবং জনগণের আন্দোলনকে অবদমিত করবে না। নচেৎ ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের বাঙালি কর্মচারীরা সহযোগিতা করবে না।
৫. শুধুমাত্র স্থানীয় ও আন্তঃজেলা টেলিফোন যোগাযোগ ব্যবস্থা কাজ করবে।
৬. সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে।
৭. রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে কিংবা অন্যভাবে ব্যাংক পশ্চিমাঞ্চলে কোনো টাকা পাঠাবে না।
৮. প্রতিদিন সকল ভবনের ওপর কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে।
৯. অন্যান্য স্তর থেকে হরতাল প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে পরিস্থিতির ওপর নির্ভর করে পুরোপুরি হরতাল ঘোষণা করা হতে পারে।
১০. স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সকল ইউনিয়ন, মহল্লা, থানা, মহকুমা ও জেলায় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হবে।

এরপর সময় সময় ঘোষিত নির্দেশাবলি যা কার্যত প্রদেশের সরকারি অফিসসমূহসহ সকল কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করছিল। সাধারণভাবে আদালতসহ সকল সরকারি সংস্থার কার্যাবলি বন্ধ ছিল। শুধু অত্যাবশ্যক কার্যাবলির জন্য সীমিত আকারে কিছু ব্যবস্থা ছাড়া। ব্যাংক কার্যাবলি মারাত্মকভাবে সীমিত করা হয়। প্রদেশের সাথে বহির্বিশ্বের বিশেষ করে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে লেনদেন সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়। এমনকি ব্যক্তিগত হিসাবও আরতি সীমিত আকারে

পরিচালনার অনুমতি দেয়া হয়। প্রাদেশিক কর কেন্দ্রীয় কর হিসাবে আদায় করা হচ্ছিল কিন্তু তা কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হচ্ছিল না, এটা ;ইস্টার্ন মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিডেট' এবং 'ইর্স্টাণ ব্যাংকিং করপোরেশন লিঃ এর বিশেষ হিসাবে জমা করা হচ্ছিল।

৬৭। শেখ মুজিবের নির্দেশাবলি এভাবে মেনে চলা হচ্ছিল যে কার্যত সরকার পরিবর্তিত হয়েছে কিন্তু একটা নিয়মতান্ত্রিক সরকার যেখানে জনগণের জীবন, স্বাধীনতা ও সম্মান নিশ্চিত হয়েছে এমনটি নয়। বিক্ষোভ, হরতাল ইত্যাদি শান্তিপূর্ণভাবে পালনের পরিবর্তে হকারিতার সাথে পালন হচ্ছিল। সাধারণভাবে জনগণ বিশেষ করে দলীয় কর্মীরা নেশাগ্রস্তভাবে হত্যা ও সম্পদ ধ্বংস করছিল। অনেক প্রত্যক্ষদর্শী পূর্ব পাকিস্তানবাসী উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী অথবা অন্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি (সাক্ষী ১৫৯.৬৮) বর্ণনা করেছেন যে, প্রথম দিকে স্বল্প আকারে অস্ত্র চোরাকারবারি করে দেশে এনে সংগ্রহ করা হচ্ছিল এবং পরবর্তী সময়ে প্রকাশ্যে বড় আকারে তা করা হচ্ছিল।

হরতালের সমর্থনে যেসব লোক তাদের দোকানপাট বন্ধ রাখতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিল কিংবা অপারগ হচ্ছিল তাদের শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। এমনকি হত্যা পর্যন্ত করা হচ্ছিল। সাধারণভাবে যদিও শেখ মুজিব মোটের ওপর নেতৃত্বে ছিলেন, তবুও বিদ্রোহীরা ছিল এবং অনেক গণহত্যা হয়েছিল। বিশেষ করে অবাঙালি জনবসতির ওপর।

৬৮। রাষ্ট্রপতি এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে প্রথম দফা আলোচনায় শেখ মুজিবের প্রস্তাবগুলো বাহ্যত ছিল

১. অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।
২. জাতীয় সংসদকে শাসনতান্ত্রিক সংসদ ও বিধানসভা হিসাবে কাজ শুরু করতে হবে।
৩. ক্ষমতা অনতিবিলম্বে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করতে হবে।

আমরা বলবো বাহ্যত সরাসরি সাক্ষী হিসাবে জেনারেল ইয়াহিয়ার নিজের বিষয়সমূহ আছে এই বিষয়ে ঘটনাবলি হিসাবে যাঁর ব্যাখ্যা কিছুটা বিভ্রান্তিকর। যেভাবেই হোক না কেন ১৭ মার্চ প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণ ও আওয়ামী লীগের লোকদের মধ্যে বৈঠকে এগুলো ছিল নির্দেশাবলি। পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থন সাপেক্ষে, বিশেষ করে পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি, শুধু অনতিবিলম্বে সামরিক আইন প্রত্যাহার করে নেয়া ছাড়া, এ প্রস্তাবে জেনারেল ইয়াহিয়াকে সম্মত বলে মনে হয়েছিল। বাহ্যত এই পটভূমিকায় যে সামরিক

আইন প্রত্যাহারের ফলে আইনগত শূন্যতা দেখা দেবে কারণ, সে সময় ক্ষমতার উৎস ছিল একমাত্র সামরিক আইন। আমরা এই যুক্তি সরাসরি সমর্থন করতে পারিনি। জেনারেল ইয়াহিয়ার নিজের ঘোষিত ইচ্ছার বলে সামরিক আইন বলবৎ করা হয়েছিল। একই ব্যক্তি কর্তৃক ঘোষিত অধ্যাদেশ জাতীয় সংসদের দুটি বৃহত্তম অধিবেশনের জন্য উপযুক্ত ছিল এবং সেই বিশেষ সংসদ অনতিবিলম্বে কাজ শুরু করলে তার কমপক্ষে যথেষ্ট আইনগত ক্ষমতা থাকতো।

৬৯। ঘটনার বর্ণনা অব্যাহত রাখার জন্য উভয়পক্ষের উপদেষ্টাগণ ২০ মার্চ পর্যন্ত বৈঠক অব্যাহত রাখলেন। যখন প্রশ্নগুলো আলোচনা করা হচ্ছিল তখন তাঁরা তা জেনারেল ইয়াহিয়া ও শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে করেছিলেন। প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টাগণ এই প্রস্তাবগুলোর বাস্তবায়ন সামরিক অধ্যাদেশের মাধ্যমে চাচ্ছিলেন, চূড়ান্তভাবে একটি ঘোষণায় উপনীত হয়েছিলেন এবং ঘোষণার ভাষা কী হবে তা চূড়ান্ত করার আলোচনার জন্য উপদেষ্টারা সেখানে ছিলেন। এই সভায় এটাও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল যে, জাতীয় সংসদের দুটি কমিটি একটি পূর্ব পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে এবং অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তানের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে। ২১ মার্চ প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার জেনারেল পীরজাদা কর্নেল হুসেনকে বলেন যে, এখন মুজিব শুধু প্রাদেশিক সরকারসমূহের বাস্তবায়ন চান, কেন্দ্রে জেনারেল ইয়াহিয়া রাষ্ট্রপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাবেন। বাহ্যত সে সময় জেনারেল ইয়াহিয়া এবং তাঁর মধ্যে বৈঠক হয়েছিল। এ বিষয়ে এটা অনুমান করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ব্যাপারে কয়েক মাস পর সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে ইয়াহিয়া মুজিবের বৈঠকের প্রস্তাবগুলোর বর্ণনা দেয়া হয়।

১. অনতিবিলম্বে সামরিক আইন তুলে নিতে হবে।
২. পাঁচ প্রদেশে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে।
৩. সামরিকভাবে কেন্দ্রে কোনো ক্ষমতা হস্তান্তর হবে না।
৪. জাতীয় সংসদ দুটি কমিটিতে বিভক্ত হবে, প্রত্যেক অঞ্চলের জন্য একটি এবং
৫. এরপর জাতীয় সংসদ এককভাবে বৈঠকে বসবে এবং দুই কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবে। উল্লেখ্য, চূড়ান্তভাবে জাতীয় সংসদের বৈঠক না হওয়া পর্যন্ত ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্বাঞ্চলে স্বায়ত্তশাসন চলতে পারে এবং পশ্চিমাঞ্চল ১৯৬২ সালের সংবিধান মোতাবেক ক্ষমতার ভাগাভাগিতে চলবে।

৭০। এসব প্রস্তাবে জেনারেল ইয়াহিয়া পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির সম্মতিতে এবং যদি সম্ভব হয় পশ্চিমাঞ্চলের অন্যন্যর সম্মতি সাপেক্ষে রাজি ছিলেন। এই মর্মে ১৯ মার্চ মি. ভুট্টোর কাছে একটা বার্তা পাঠানো হয়েছিল যে, শেখ মুজিব তাঁর সাথে আলোচনায় রাজি এবং তিনি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ঢাকায় আসেন।

৭১। মি. ভুট্টো ২১ মার্চ সন্ধ্যায় ঢাকায় পৌঁছান এবং সেদিনই সন্ধ্যা ৭ টা ৩০ মিনিটে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করেন। পিপলস্ পার্টির মতে প্রস্তাবগুলো গ্রহণ করার ব্যাপারে অনেক দূরত্ব ছিল। প্রধানত দুই অঞ্চলে সংসদ বৈঠকের কারণে, বাস্তবে এর ফলাফল কোনো অবস্থায় নিয়ে যাবে এটা ছাড়াও, এমনকি নীতিগতভাবে এটা একটা 'কনফেডারেশনে'র ধারণায় পূর্ণ ছিল যদিও আলাদা আলাদা পৃথক দুটি দেশ নয়। পরবর্তী সময়ে সেই রাতে মি. ভুট্টো তাঁর দলের লোকজনের সাথে কিছু পরামর্শ করেন এবং পরের দিন সকালে রাষ্ট্রপতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে বৈঠকের জন্য রাষ্ট্রপতি ভবনে যান। নির্ধারিত সময়ের কিছুক্ষণ আগে মি. ভুট্টো উপস্থিত হন এবং যথাসময়ে শেখ মুজিবুর রহমান উপস্থিত হন। প্রেসিডেন্টের কাছে যাওয়ার আগে তাঁরা দু'জন নিজেদের মধ্যে সৌজন্যমূলক কথা বলার জন্য কিছু সময় পান। এই বৈঠকে উপস্থিত তিনজনের মধ্যে দু'জন, মি. ভুট্টো এবং জেনারেল ইয়াহিয়াকে সাক্ষী হিসাবে আমাদের কাছে বর্ণনা করা হয়েছিল এবং উভয়ই বলেছিলেন, সেই বৈঠকে বাস্তবে মি. ভুট্টো ও শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে কোনো আলোচনা হয়নি, যদিও আগের দিন ঢাকা বিমানবন্দরে অভ্যর্থনার সময় মি. ভুট্টোর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন আচরণের জন্য শেখ মুজিবুর রহমান দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে মি. ভুট্টোর নিরাপত্তার ব্যাপারে সব রকম ব্যবস্থা নেয়া সত্ত্বেও যেহেতু তিনি তাদের অতিথি ছিলেন।

শেখ মুজিবের এই দুঃখ প্রকাশকে মি. ভুট্টো এই বলে পাশ কাটিয়ে গেলেন যে, এটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। যা সত্যিকারের ব্যাপার তা হলো আশু এবং সম্মানজনক সমাধান। মি. মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির দিকে চেয়ে বললেন আওয়ামী লীগের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে কিনা, তখন রাষ্ট্রপতি বলেন এটার ব্যাপারে মি. ভুট্টোরও সম্মতির প্রয়োজন আছে এবং এজন্যই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মি. মুজিবুর রহমান এই অবস্থান নিলেন যে রাষ্ট্রপতিকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছে এবং এটা রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব মি. ভুট্টোকে সে ব্যাপারে রাজি করানো। ভুট্টোর কথা অনুযায়ী শেখ মুজিব উত্তেজিত থাকা

সত্ত্বেও আগাগোড়া তিনি সৌজন্যপরায়ণ ছিলেন, তবে তিনি অবিচল ছিলেন। মি. ভুট্টো এবং তার মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হবেন রাষ্ট্রপতি।

৭২। তারপর দুজন রাষ্ট্রপতির সাথে কক্ষ ত্যাগ করলেন। তবে মজার ব্যাপার যে বাইরে সামরিক সচিবের ঘরে যখন সেখানে উপস্থিতি ছিলেন সামরিক সচিব জেনারেল মুহাম্মদ ইসহাক, রাষ্ট্রপতির নৌবাহিনী সহায়ক এবং জেনারেল উমার, শেখ মুজিব সকলকে সেই ঘর ত্যাগ করতে বললেন। যেহেতু তিনি মি. ভুট্টোর সাথে একান্তে কথা বলতে চান। তিনি মি. ভুট্টোর কাছে মন্তব্য করলেন যে পরিস্থিতি মারাত্মক রূপধারণ করেছে এবং তা থেকে পরিত্রাণের জন্য তিনি মি. ভুট্টোর সাহায্য চান। এ আশঙ্কায় যে ঘরে কোনো গোপন মাইক্রোফোন থাকতে পারে তা ভেবে দুজন বারান্দায় বেরিয়ে এলেন এবং রাষ্ট্রপতির অভ্যর্থনা রুমের পেছনে বসলেন। জেনারেল ইয়াহিয়া তাঁদের দেখতে পাচ্ছিলেন, যিনি অনেকবার এই দু'জনের ওপর মন্তব্য করেন 'একে অপরের সাথে মধুচন্দ্রিমা হিসেবে।'

সেই সময় দুই নেতার আলাপের সারাংশ ছিল এই যে, মুজিবুর রহমান চাপ দিচ্ছিলেন যে দুটি কমিটি গঠন করা হোক এবং তা চালু করা হোক আর যেহেতু জাতীয় সংসদের একক সত্তা হিসাবে বৈঠক সম্ভব নয় সুতরাং তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হোক। মি. ভুট্টো বলেন যে, একটা পরিহাসের বিষয় যে তিনি নিজে সংসদের বাইরে সমঝোতার জন্য বলছেন এবং সংসদের স্থগিত চাইছেন। মি. ভুট্টো প্রস্তাবগুলো বিবেচনার জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু বললেন যে প্রস্তাবের চূড়ান্তরূপ যা-ই হোক না কেন তা অবশ্যই জাতীয় সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে এবং প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির ক্ষমতায়নের মধ্যে হতে হবে। তবে মুজিবুর রহমান অবিচল থাকলেন যে, সংসদের বৈঠক একেবারেই উচিত নয়। এমনকি সংক্ষিপ্ত আকারেও নয়। বাস্তবে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থা কী হবে এ বিষয় ছাড়াও শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে একটা অচলাবস্থা ছিল, যা প্রথম থেকেই প্রশ্ন ছিল যে জাতীয় সংসদে বৈঠক প্রথমেই বসা উচিত কিনা।

এটাই ছিল শেখ মুজিব-ভুট্টোর মধ্যে শেষ ও একমাত্র বৈঠক এবং এই বাস্তবতা বিবেচনা করে তাদের বৈঠকে কোনো ফলাফল বহন করে আনেনি। এটাকে কেউ আর একটু এগিয়ে বলতে পারে যে এটাই ছিল শেখ মুজিব ও ভুট্টোর মধ্যে একমাত্র বৈঠক।

৭৩। পরবর্তী তিন দিন রাষ্ট্রপতির সহকারীদের প্রধানত বিচারপতি A. R.

Cornelius, আইন উপদেষ্টা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা মি. এস এম আহমদ, জেনারেল পীরজাদা, Principal Staff Officir এডভোকেট জেনারেল বিভাগের কর্নেল হুসেন এবং পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি ও আওয়ামী লীগের সাথে আলাদাভাবে আলাপআলোচনায় ভরা ছিল। এসব বৈঠকের বিস্তৃত বিবৃতিতে যাওয়া অনাবশ্যক, সেগুলো কদাচিৎ ছিল কোনো সমঝোত এবং সাধারণত একটি পরিকল্পনার বাস্তবায়নের পদ্ধতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তারা যেকোনো আঙ্গিকে বিশেষভাবে অসন্তোষজনক ছিল। একাধিকবার এমনটি ঘটেছে যে প্রেসিডেন্ট তাঁর দলকে কোনো বিষয়ে আলোচনা শুরুর জন্য খুঁটিনাটি অবহিত করছেন তখন আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি বলবেন যে, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক শেখ মুজিবের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই ফয়সালা হয়েছে। যেহেতু জেনারেল ইয়াহিয়া এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনার কোনো লিখিত দলিল ছিল না, সেহেতু এটা কঠিন ছিল এবং ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছিল, এটা বিবেচনা করে বের করাকে সঠিক ছিল এটা শুধু এটাই তুলে ধরে যে, সমগ্র অসন্তোষজনক প্রক্রিয়ার এই আলোচনাসমূহ পরিচালিত হয়েছিল।

৭৪। এগুলো ছাড়াও প্রেসিডেন্ট এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য নেতার মধ্যে আলাপ হয়েছিল যেমন খান ওয়ালি খান, মিঞা মুমতাজ, মুহাম্মদ খান দৌলতানা, সরদার শওকত হায়াৎ খান, মাওলানা মুফতি মাহ্মুদ, মাওলানা শাহ্ আহমেদ নূরানি এবং তাদের সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা হয়েছিল। যখন এই নেতৃবৃন্দ সন্দেহাতীতভাবে মুজিবুর রহমানের সাথে বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন এবং কিছু পরিমাণে সম্ভবত তাঁর প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তবে কোনোই সন্দেহ নাই যে তারা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি যাতে কনফেডারেশন বা অন্য কোনো ধরনের শাসনতন্ত্র যা দেশকে বিভক্ত করতে পারে, তা গ্রহণ করা। সংশ্লিষ্ট সকলে যৌথ সভা না হওয়ার কারণে এটা পরিষ্কার নয় যে, কোন প্রস্তাবটি কার কাছ থেকে এসেছিল। যেমন—জেনারেল ইয়াহিয়া বলেন দুই কমিটির প্রস্তাব শেখ মুজিবের কাছ থেকে এসেছিল, কিন্তু ওয়ালি খান সাক্ষ্য দেন যে, শেখ মুজিবের সাথে আলাপের সময় মুজিব বলেন এই ধারণাটি স্বয়ং জেনারেল ইয়াহিয়ার নিজের কাছ থেকে এসেছে।

ওয়ালি খান বলেন, তিনি যখন এ ব্যাপারে মুজিবুর রহমারে সাথে কথা বলেন তখন তিনি তাঁকে জেনারেল ইয়াহিয়ার একটি চিঠি দেখাতে চান যেখানে জেনারেল তাঁকে একটা সমাধানের পন্থা দিতে চান, যা তাঁকে অনেক খুশি করবে। এমনকি ছয় দফার চাইতেও বেশি। ভাবতে অবাক লাগে যে এ ধরনের

সমাধান সম্পূর্ণ পৃথককরণ হতে পারে। জেনারেল ইয়াহিয়া এ ধরনের চিঠি পাঠানোর কথা অস্বীকার করেন এবং বাস্তবে আমরা এ ধরনের কোনো দলিল দেখিনি। জনাব খানের সেই বক্তব্যের ব্যাপারে আমাদের সন্দেহ থাকার কোনো কারণ নেই তবে মুজিবুর রহমানের প্রমাণ ছাড়া কিংবা সেই দলিল ব্যতীত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারি না যে এই ধরনের কোনো চিঠি আছে কিংবা জনাব খানকে দেখানো দলিল আসল ছিল কিনা।

৭৫। যা আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে উল্লেখ্য, শুধু এখন কোনো তদন্ত করার উপায় নেই যে তখন সঠিক ব্যাপার কী ছিল, সেই সময় ব্যাপারগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে তখনো কারো পক্ষে সেগুলো তদন্ত করে সত্যাসত্য নির্ণয় করা কঠিন ছিল। বলা যায় এ ব্যাপারে বা এ ধরনের বিষয়ে তখন ভুল বোঝাবুঝি ছিল যা সম্ভাব্য মন্তব্যে নিয়ে যেতে পারে। তবে আমাদের এ ধরনের একটা জোরালো ধারণা আছে যে, জেনারেল ইয়াহিয়া এ ধরনের খেলা খেলেছিল যেখানে কোনো পরিষ্কার সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যেত না।

৭৬। আওয়ামী লীগ নেতাদের এবং রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাদের মধ্যকার পরামর্শ ২৩ ও ২৪ মার্চ দীর্ঘ সময় ধরে চলে এবং সে সময় আওয়ামী লীগের অবস্থান আরো কঠিন হয়। তারা জাতীয় সংসদের শুধু দুটি পৃথক কমিটিই চায়নি বরং দুটি শাসনতান্ত্রিক প্রতিনিধি সভা, একটি পূর্বপাকিস্তান থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য এবং অন্যটি অনুরূপভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এবং সেই সময় প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে এ ধারণা 'পাকিস্তানের কনফেডারেশন' ব্যক্ত করেন। বলা যেতে পারে কেন্দ্রীয় সরকারের, কোনো ক্ষমতা বা নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব তাজউদ্দীন আহমদ সাংবাদিকদের কাছে বিবৃতি দেন যে, আওয়ামী লীগ তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে জানিযে দিয়েছেন এবং আলোচনার আর কিছু বাকি নেই। এই চূড়ান্ত প্রস্তাব আওয়ামী লীগের একটি খসড়া ঘোষণা।

৭৭। ইতিমধ্যে ২৩ মার্চ লাহোর প্রস্তাবের বার্ষিকী হিসাবে পাকিস্তানিদের কাছে প্রিয় দিন যা ১৯৪০ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির আহ্বান জানিয়েছিল। পাকিস্তানের গৌরবময় পতাকা উত্তোলনের পরিবর্তে বাংলাদেশের সরকারি অফিসসমূহে এবং ব্যক্তিগত বাড়িগুলোতে নতুন পতাকা দেখা গেল এবং শেখ মুজিবুর রহমান নিজে তাঁর বাসভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। ২৪ ও ২৫ তারিখ মি. ভুট্টো রাষ্ট্রপতির সাথে আওয়ামী লীগের প্রস্তাব নিয়ে

আলোচনার জন্য বৈঠক করেন। ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টাগণ আওয়ামী লীগের চূড়ান্ত প্রস্তাব পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির উপদেষ্টাদের অবহিত করেন। ২৫ ও ২৬ তারিখের মধ্যবর্তী মধ্যরাতে প্রচণ্ড গোলাগুলিতে ঢাকা প্রকম্পিত হলো। সেনা আক্রমণ যা আগে প্রচারিত হয়েছিল তা শুরু হলো। মজার ব্যাপার যা এখন সন্দেহাতীতভাবে সত্য বলে জানা যায়, জেনারেল ইয়াহিয়া খান ইতিমধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। সন্ধ্যায় জানানো হয় যে, রাষ্ট্রপতি পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের সাথে ভোজে অংশ নিতে গিয়েছেন এবং তাঁর সাথে যোগাযোগ করা যায়নি। বাস্তবে তিনি করাচির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছেন।

৭৮। খুবই স্বাভাবিক যে এ ধরনের একটা কাজ পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়া করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্বে কোনো গোপন তথ্য জানা যায়নি যে, একটা আকস্মিক পরিকল্পনা যা 'অপারেশন ব্লিৎস' নামে পরিচিত। অনেক আগে থেকে প্রস্তুত রাখা হয়েছিল এবং বলা হয় যে এই হিসাবে আলোচনা পরিচালিত হয়েছিল।

মধ্য মার্চ থেকে এ তারিখ পর্যন্ত একটির অধিক ছদ্মবেশে ছিল না, সেটা ছিল বরাবরই জেনারেল ইয়াহিয়া ও তাঁর উপদেষ্টাদের ইচ্ছা যে আওয়ামী লীগকে শক্ত হাতে দমন করা। বলা হয় যে জেনারেল ইয়াহিয়া খান কোনো সময়ই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে তাঁর দায়িত্বশীল ইচ্ছা প্রকাশ করেননি। বাস্তবে অনেক ঘটনা আছে যা এই অভিমত সমর্থন করে এবং এই রিপোর্টের শেষ আমরা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করব। কিন্তু একটিমাত্র ঘটনা থেকে একটা পরিকল্পনা প্রস্তুত ছিল যে আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে এরূপ একটি সম্ভাব্য ঘটনায়। আমরা চূড়ান্ত মতামত নিতে অসমর্থ হই। দুই সপ্তাহ ধরে যা ঘটেছে তা সবই একটি নিছক অভিনয় ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে পরিস্থিতি ছিল এই রকম যে, এই ধারণায় জেনারেল দায়িত্বশীলভাবে কাজ করছেন, আলোচনা শেষ পর্যন্ত যদি ব্যর্থ হয় তবে কমপক্ষে কোনো প্রস্তুতি না রাখা হবে বোকামি। ইতিমধ্যে ঢাকা এমন একটা শহর হলো যেখানে কোনো ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ করে কোনো পশ্চিম পাকিস্তানি এবং আর বিশেষ করে তারা যারা পাকিস্তান সরকারের সাথে জড়িত ছিলেন, তারা সেনা পাহারা ছাড়া চলাচল করতে পারতো না। প্রদেশ সাধারণভাবে শেখ মুজিবের নির্দেশ মেনে চলছিল। এমনকি যদিও তাঁর ইচ্ছা তেমন সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি, যার ফলে একজনকে বলতে সমর্থ করবে যে একটা সুশৃঙ্খল সরকার ছিল যেখানে সাধারণ নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে বসবাস

করতে পারে, যা স্বাভাবিক সত্য জীবনের একটি রূপ।

৭৯। অন্যদিকে আমাদের এটা বিশ্বাস করার কারণ আছে যে আওয়ামী লীগ নিজে ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ তিনটায় বদলা নিতে চেয়েছিল। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে জেনারেল ইয়াহিয়া ২৫ তারিখ সন্ধ্যাকে শেষ সময় হিসাবে বিবেচনা করে থাকতে পারে যার ফলে তিনটি সমাধান অবশ্যই হবে, যদি তার কোনো অর্থ থাকতো। এটাও সত্য যে সেই সময় সরকার গোয়েন্দা বিভাগের সাধারণ উৎসসমূহের কাছে জিম্মি হয়ে গিয়েছিল। তবে দক্ষ এসব সংস্থা সাধারণভাবে একটা প্রদেশে যা বিদ্রোহে বিক্ষুব্ধ সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ স্থানীয় প্রতিনিধি সংগ্রহ করা কঠিন যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এটা ছাড়াও ছিল ভাষা সমস্যা। বলা যায় যে পাকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রায় ২৫ বছর পর এখনো ভাষা একটা সমস্যা।

৮০। কেউ চিন্তা করে থাকতে পারে যে এ ধরনের কাজের বিরুদ্ধে প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত ছিল নাটের গুরুদের গ্রেফতার করা। কিন্তু যদিও সেই রাতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল, আশ্চর্যের বিষয় যে একমাত্র একজন যদিও সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জননেতাদের মধ্যে অর্থাৎ, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। পরিস্থিতি এরূপ মনে হয়েছিল যে, তিনি স্বেচ্ছায় গ্রেফতার হয়েছিলেন বরং পাকিস্তানি সৈন্যদের তাঁকে খুঁজে বের করার চাইতে। এটা অবশ্য সত্য যে ড. কামালও পরবর্তীতে গ্রেফতার হয়েছিলেন কিন্তু কমপক্ষে ঐ রাত্রিতে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছিলেন এবং অশনাক্ত অবস্থায় ছিলেন। বলা হয়েছে যে, এটার প্রধান কারণ ছিল নেতাদের গ্রেফতারের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিরা তাদের চেহারার সাথে পরিচিত ছিল না। আমরা মনে করি এটা খুব একটা দুর্বল যুক্তি। আমরা জানি যে সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় একটি পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছিল এবং এই পরিকল্পনায় একটা অংশ হিসাবে ঐ সব নেতাদের গ্রেফতার করার ব্যবস্থা থাকতে হতো। সুতরাং পরিস্থিতির কারণে বিশেষ ব্যক্তিদের দায়িত্ব দেয়া কঠিন হতো না, তাদের প্রত্যেককে গ্রেফতারের জন্য এবং ঐ সমস্ত লোকদের সহজেই নেতাদের চেহারার সাথে পরিচিত করা যেত কমপক্ষে ১০ বছর ক্রমাগতভাবে রাষ্ট্রপতির বাসায় আসতেন। বড় ব্যাখ্যা ছিল যে, এ সময় আওয়ামী লীগ নেতারা রাতের পর রাত তাদের বাসস্থান পরিবর্তন করতেন এবং ঐ রাতে তাঁরা কোথায় ছিলেন তা বের করা এত সহজ ছিল না। যাই হোক ঘটনা হলো যে কেবলমাত্র শেখ মুজিবুর রহমান এবং পরে ড. কামাল হোসেন বাস্তবে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

৯২। ২৫ তারিখ সন্ধ্যায় জেনারেল ইয়াহিয়া ঢাকা ত্যাগ করেন কিন্তু তিনি যে সেদিন চলে যাচ্ছেন তা ঘোষণা করা হয়নি। যদিও তাঁর কাছের সামরিক উপদেষ্টারা অবশ্যই তাঁর কর্মসূচির খবর জেনে থাকবেন। এমনকি তাঁর বেসামরিক সহযোগীরা তাঁর ইচ্ছায় ব্যাপারে অবহিত ছিলেন না এবং তাঁরা আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে বৈঠক করার জন্য তখনো পরিকল্পনা করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বিচারপতি কর্নেলিয়াস তাঁর লিখিত বক্তব্যে বলেন :

২৪ মার্চ অপরাহ্নে আওয়ামী লীগ দলের সাথে বৈঠক শেষ সারাংশে PSO আমাকে বললেন যে পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারা যাঁরা আলোচনার জন্য ঢাকা এসেছিলেন তাঁদের আগামীকাল ঢাকা ত্যাগ করা উচিত। পরের দিন আমি ড. কামাল হোসেনের সাথে বসার জন্য সভায় আমি সম্মত হই। সংসদের সহায়ক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনার জন্য। PSO বলেন, আমি চাইলে ড. কামাল হোসেনের সাথে দেখা করতে পারতাম, কিন্তু সেটা হতো আমার নিজ দায়িত্বে। পরের দিন অপরাহ্নে প্রস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়ার জন্য স্বল্প সময় থাকার কারণে প্রস্তাবিত বৈঠকের ব্যাপারে আমি কিছু না করার সিদ্ধান্ত নিলাম এবং পরের দিন ১ টা ৩০ মিনিটের বিমানের করাচির উদ্দেশে রওনা হই। আমার রওনা হওয়ার আগেই বিরতিতে PSO অথবা কর্নেল হুসাইনের সাথে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি এবং রাষ্ট্রপতিকেও দেখি নি। ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় লাহোর রেডিওতে রাষ্ট্রপতির ভাষণ থেকে জানতে পারলাম যে পূর্ব পাকিস্তানে কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বক্তৃতার ব্যাপারে কিংবা আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে আমার সাথে কোনো পরামর্শ করা হয়নি।

৯৩। ইতিমধ্যে অবশ্যই ২৫ তারিখ রাতে সেনা অভিযানের পরিকল্পা করা হয়। সম্ভাব্য বিপদ আশঙ্কার অনেক আগেই যে পরিকল্পনাটি ছিল তা অবশ্যই বোধগম্য। কিন্তু জেনারেল ইয়াহিয়ার মার্চে পরিদর্শনের সময় কোনোদিন তার বাস্তবায়নের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে কার্যে পরিণত করা হয়েছিল ঐ দিন যখন আলোচনা কমপক্ষে স্বাভাবিক নিয়মে ভেঙে যায়নি। শুধু এই সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, আলোচনাকে শুধু ঐদিন পর্যন্ত টেনে আনা হয়েছিল। আমরা যখন জেনারেল ইয়াহিয়াকে প্রশ্ন করেছিলাম ৭ মার্চের পর আইনশৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য জেনারেল টিক্কা খান উদ্যোগ নেননি, তিনি বলেন, জেনারেল টিক্কা খান তার (জেনারেল ইয়াহিয়া) ঢাকা পৌঁছানোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

৯৪। সারাংশে আমাদের কাছে এই মনে হয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত জেনারেল ইয়াহিয়া জড়িত আছেন বাস্তবে কোনো ইচ্ছা ছিল না যে, মার্চের আলোচনা কোনো সমাধান করতে পারবে। তিনি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন সামরিক ও রাজনৈতিক উভয়ই পরিস্থিতির ব্যাপারে এবং এটা অবশ্যই বোঝা যায় যে, তিনি বর্তমানে বা অন্য কোনো সময়ই ক্ষমতা হস্তান্তর না করার জন্য দৃঢ়স্থির ছিলেন।

৯৫। মজার ব্যাপার যে, ১৯৬৯ সালের গোলটেবিল বৈঠক এবং ১৯৭১ সালের ঢাকা সমঝোতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু সামঞ্জস্য আছে। উভয়ই ২৫ মার্চ সমাপ্ত হয়। আগেরটিকে যখন আপাতদৃষ্টিতে সফল হয়েছিল যদিও যাদের হাতে তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব ছিল সিদ্ধান্ত কোনোদিন চূড়ান্ত হয়নি, পরেরটা ভেঙে দিয়েছিল শুধু ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রশ্নে। উভয়েরই ভেঙে যাওয়ার কারণে ছিল মুজিবের ছয় দফা কর্মসূচি। উভয় ক্ষেত্রে সেটা ছিল শেখ মুজিবের সাথে জেনারেল ইয়াহিয়ার আলোচনা যা সমঝোতার প্রকৃত চাবিকাঠি দেয় যা ঘটেছিল তার। চূড়ান্তভাবে উভয়ই ছিল সেনা অভিযানের ভূমিকাস্বরূপ।

❒